ভাঙা দেউলের দেবতা

ভাঙা দেউলের দেবতা

শঙ্কু মহারাজ

কল্পলোক
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭০

প্রকাশক :
শ্রীহেমেন্দ্র কুমার শীল
পর্ণ কুটীর
৬, কামারপাড়া লেন
কলিকাতা-৩৬

মুদ্রাকর :
শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিণ্টিং হাউস
১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীগণেশ বসু

পরিবেশক :
কল্পলোক
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

ভাঙা দেউলের দেবতা

"তারপর ?"

"তারপর ? ··তারপরে আমার কথাটি ফুরলো।" জোর করে মুখে একটু হাসি ফোটাতে চায় বকুলবাঈ।

অতনু অপ্রস্তুত। সে এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিল বাঈজীর বিগত-জীবন-কথা। সে-কথা যে শেষ হয়ে গেছে।

তার পরের কথা অতনুর অজানা নয়। গত পাঁচ বছর ধরে ফুলগঞ্জের প্রমোদ-কাননে একটি ফুল হয়ে ফুটে আছে বকুলবাঈ।

অতনু নীরব। হোটেলের আনন্দ-মত্ততা অনেকখানি স্তিমিত। বারান্দায় বেয়ারা-বাবুর্চিদের ব্যস্ত পদধ্বনি আর কানে আসছে না।

ঘরে নীল আলো, বাইরে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। ঘরে ও বাইরে অস্পষ্টতার আমেজ।

বকুলবাঈ উঠে দাঁড়ায়। অতনু তার দিকে তাকায়। বকুলবাঈয়ের চোখে জল। সে চোখ মোছে। তারপর স্বাভাবিক স্বরে বলে, "বাবুজী! রাত একটা বাজে। আর তো আপনি মেসে ফিরতে পারবেন না। আজ যে আপনাকে বাঈজীর ঘরেই রাত কাটাতে হবে!"

অতনু চমকে ওঠে! ভাবে—নিয়তির কী বিচিত্র পরিহাস। লখ্‌নউয়ের জাবেদা খাতুন আজ ফুলগঞ্জের বকুলবাঈ! পূর্ববঙ্গের একটি দরিদ্র ছাত্র কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে বাঈজীর ঘরে রাত্রিবাস করছে!

"ভয় পাবেন না বাবুজী!" সহসা বাঈজী বলে ওঠে, "আমি আপনার চরিত্র নষ্ট করব না।"

"না, না, সে ভয় করছিনে।" তাড়াতাড়ি অতনু বলে, "কিছু বলে আসি নি, মেসের ম্যানেজার চিন্তা করবেন।"

"বাবুজী!" বকুলবাঈ বলে, "আপনি কলেজে পড়েন, আমি লেখা-পড়া শিখি নি। আপনাকে আমার উপদেশ দেওয়া সাজে না। তবু একটা কথা না বলে পারছিনে—কেউ কারও চরিত্র নষ্ট করতে পারে না, মানুষ নিজেই তার চরিত্রের রক্ষক।"

অতনু কোন কথা বলতে পারে না। তার আগেই বেয়ারা খাবার নিয়ে ঘরে ঢোকে। বাঈজী জিজ্ঞেস করে, "গরম আছে তো ?"

"জী মেমসাব্।"

"আচ্ছা, ঐ টেবিলের ওপর রেখে যাও।"

বেয়ারা খাবার রেখে চলে যায়।

বাঈজী বলে, “আমি একবার ভেতর থেকে আসছি।”

অতনু মাথা নাড়ে। বাঈজী চলে যায়। অতনু একা।

না, অতনু একা নয়। তাকে একা পেয়ে চারিদিক থেকে অজস্র ভাবনা এসে হাজির হয়। সে ভাবনার স্রোতে মন ভাসিয়ে দেয়।

ক'দিন আগেও তো সে জানত না যে এমন একটা মুহূর্ত আসতে পারে তার জীবনে। অতনু অবাক বিস্ময়ে সেদিনের কথাই ভেবে চলে।

সেদিন রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা সেরে অতনু যখন এই হোটেল থেকে বেরিয়ে যায়, তখন সে কল্পনাও করতে পারে নি যে আবার এখানে আসতে হবে। আসতে হবে প্রত্যাখ্যান করা চাকরির উমেদার হয়ে।

অতনুর মনে পড়ে সেদিনের সেই ফুটবল খেলার কথা। আজ কিন্তু তার মনে হচ্ছে সেদিনের সে খেলা শুধু ফুটবল খেলা ছিল না, সেদিন সে তার নিজের ভাগ্যকে নিয়েও খেলা শুরু করেছে। অতনু সেই খেলার কথাই ভাবতে থাকে—

খেলা শেষ হবার মিনিট তিনেক বাকি থাকতে গোলটা হয়ে গেল। আর তা হল অতনুর পা থেকেই। ফুলগঞ্জ চেষ্টা করল খুবই কিন্তু শোধ দিতে পারল না।

শেষ বাঁশি-বাজার সঙ্গে-সঙ্গে সবাই এসে জড়িয়ে ধরল অতনুকে। আজকের জয়লাভের প্রায় সবটুকু কৃতিত্বই তার।

পুরস্কার বিতরণ শেষ হলে অতনু একাকী বেরিয়ে আসে মাঠ থেকে। এগিয়ে চলে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে।

সহসা কাঁধে একটা স্পর্শ পেয়ে সে চমকে ওঠে। থমকে পেছন ফেরে। জনৈক অপরিচিত মধ্যবয়সী ভদ্রলোক মৃদু হাসছেন। নাদুস-নুদুস গোল-গাল চেহারা। ভদ্রলোক খুব জোরে-জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন। বোধহয় তাকে পাকড়াও করার জন্য ছুটে আসতে হয়েছে।

—নমস্কার। ভদ্রলোক হাতজোড় করেন।

অতনু প্রতিনমস্কার করে।

—রাজাবাহাদুর আপনাকে একবার ডাকছেন। ভদ্রলোক বিগলিত কণ্ঠে বলেন।

—রাজাবাহাদুর! অতনু বিস্মিত।

—রাজাবাহাদুর। আমাদের ফুলগঞ্জের রাজাবাহাদুর গো!

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় অতনুর কাছে। প্রস্তাবটা ভাল লাগে না তার। এঁরা না পারে এমন কোন কাজ নেই। কে জানে, খেলায় হেরে গিয়ে হয়তো খেলোয়াড় গুম করার মতলব ভেঁজেছে।

অতনু গম্ভীরস্বরে বলে—তিনি তো চেনেন না আমাকে।

—হেঃ হেঃ, এ আপনি কি বললেন অতনুবাবু, কলকাতার মাঠে কে না চেনে

আপনাকে ? তাছাড়া রাজাবাহাদুরের মতো একজন ক্রীড়ানুরাগী ··

—কিন্তু আমি এখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।

—তা তো হবেনই। ভদ্রলোকের মুখে অমায়িক হাসি।—আজ আপনি যে রকম খেটে খেলেছেন। তবু কষ্ট করে আপনাকে একবারটি যেতেই হবে। আমি রাজাবাহাদুরকে কথা দিয়েছি। আসুন, ঐ যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

—গাড়ি ! অতনু আবার বিস্মিত।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রাজাবাহাদুর হোটেলে ফিরে গিয়েছেন। আপনাকে সেখানেই যেতে হবে।

এবারে রেগে যায় অতনু। বলে—প্রয়োজনটা যখন আপনার রাজাবাহাদুরের তখন তাঁকে নিয়েই একদিন আসুন না আমার মেসে। অতনু এগিয়ে চলে।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তার একখানি হাত ধরে ফেলেন। বাধ্য হয়ে থামতে হয় অতনুকে।

—প্লিজ ভাই, আপনি রাজাবাহাদুরকে ভুল বুঝবেন না। এখানে তাঁর পক্ষে আপনার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব ছিল না। আজ আপনার জন্যই যে হার হয়েছে আমাদের।

এমন একজন অহঙ্কারী জমিদারের হঠাৎ তার মতো দরিদ্র ছাত্রের সঙ্গে কি দরকার থাকতে পারে ? অতনু কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

ভদ্রলোক উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই তিনি করুণকণ্ঠে বলে ওঠেন—আপনি না গেলে আমি রাজাবাহাদুরের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলেন—এ আমার একটা মস্ত অযোগ্যতার নজীর হবে। রাজাবাহাদুর অযোগ্য কর্মচারীকে কখনও ক্ষমা করেন না। শেষদিকে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে কান্না ঝরে পড়ে। তিনি চোখ মোছেন।

অতনু আর আপত্তি করতে পারে না। ভাবে একবার গিয়েই দেখা যাক্ না, কি হয় ?

অতিকায় ফোর্ড গাড়িটা চৌরঙ্গী পাড়ার একটি মাঝারী গোছের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। তখুনকার দিনে তো বটেই, এখনও কয়েকটি কারণে এ অঞ্চলের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। সন্ধ্যাসমাগমে এখানে কর্মজীবন শুরু। আঁধারই সে জীবনের অবলম্বন। শরীরে এক অঙ্গের হানি হলে, অন্য অঙ্গের শক্তি বাড়ে। রাতের অন্ধকারে এ-সব হোটেলের বাসিন্দারা যখন দর্শনেন্দ্রিয় হারিয়ে ফেলে, তখন তাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরা হয়ে ওঠে বড় বেশি সচেতন।

কোন ঘর থেকে ভেসে আসছে ঘুঙুরের রিনিঝিনির সঙ্গে সুরেলা তান, কোন ঘরে চলেছে পশ্চিমী বাজনার সঙ্গে নাচ-গান।

কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অতনু ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে—রাজাবাহাদুর কি কলকাতায় এলে এখানেই থাকেন ?

—হ্যাঁ। বাড়ি অবশ্য রয়েছে একখানা। তাহলেও এখানে অনেক সুবিধে।

—সুবিধে ?

—সুবিধে নয় ? হুকুম করতে দেরি আছে কিন্তু তামিল হতে দেরি হয় না। এই তো কিছুদিন আগে বীরেশ্বরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে রাজাবাহাদুর গিয়েছিলেন শ্যামপুরের রাজার বাগানবাড়িতে। সেখানে ম্যান্ডালের নর্তকী ফুবিনের নাচ দেখে বীরেশ্বরবাবুর আক্কেল গুড়ুম। রাজাবাহাদুরের কাছে বায়না ধরলেন ফু-বিনকে এক রাতের জন্য আনতেই হবে। খবর নিয়ে জানা গেল, সে আর চার দিন কলকাতায় থাকবে। চার দিনই এনগেজড্। এ্যাডভান্স নিয়ে বসে আছে। রাজাবাহাদুরের জিদ চেপে গেল। হুকুম করলেন এই হোটেলের ম্যানেজারকে—ব্যস বাজী মাত্।

—কি হল ? নর্তকী এল ?

—এল মানে? সুড়সুড় করে পরের দিন সন্ধ্যেবেলা এসে হাজির। একটানা নাচ চলল রাত দুটো পর্যন্ত। বহু নাচ জীবনে দেখেছি মশাই—কিন্তু অমনটি আর দেখলাম না। কি রং, কি স্বাস্থ্য আর কি ভঙ্গিমা! এক পলকেই বুঝতে পারলাম, কেন ওকে নিয়ে রাজা মহারাজাদের এতো কাড়াকাড়ি ? এদেশের বাঈজীদের বুকের পাটাই নেই যে ওই পোশাকে আসরে নামে।

ভদ্রলোক অতনুকে নিয়ে উজ্জ্বল আলোয় ঝলমলে একখানি প্রকাণ্ড ঘরে ঢোকেন। ঘরের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ফরাস বিছানো। একপাশে কতগুলো বাদ্যযন্ত্র। আরেক পাশে কয়েকজন লোক গ্লাস হাতে করে বসে আছে। কেউ কেউ অতনুর মুখ-চেনা, বিপক্ষ দলে খেলেছে। তাকে দেখে তারা সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু অধিকাংশেরই কাছে আসা দূরে থাক্, কথা বলার শক্তি পর্যন্ত নেই।

শেষ পর্যন্ত একজন সফল হলেন। লোকটি বয়সে প্রবীণ। চেহারাটি গোলগাল। অর্ধজড়িত কণ্ঠে বললেন—কি বাছাধন ? ঘাবড়ে গেলে ? গোল দেবার সময় তো ঘাবড়াও নি বাবা! তখন খেয়াল হয় নি, ফুলগঞ্জকে গোল দিলে বুকে কাঁটা ফুটবে ?

কোনমতে প্রবীণ লোকটির হাত থেকে অতনুকে মুক্ত করে, ভদ্রলোক তাকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন। আগের ঘরের চেয়ে অনেক ছোট। দু'দিকের দরজায় ভারী পর্দা। তিন-চারজন যুবতী ফরাসের ওপর বসে কথাবার্তা বলছিল। অতনুদের ঢুকতে দেখেই তারা মৃদু হেসে সেলাম জানায়। ওদের ঘাগরার স্বচ্ছতা, জামার হ্রস্বতা, চোখের সুরমা, ঠোঁটের লালিমা, চুলের পারিপাট্য, অলংকারের চাকচিক্য আর চটুল চাউনি দেখে অতনুর সারা শরীর শিউরে উঠল। সব চেয়ে বয়স্কা মেয়েটি ভদ্রলোককে বলে—তস্রীফ রাখিয়ে সুরেশবাবু।

—না হে, আজ আর আসর বসবে না। রাজাবাহাদুরের দিল ভাল নেই। সুরেশবাবু তাকে আর কথা বলার অবকাশ না দিয়ে অতনুকে নিয়ে তার পরের ঘরে প্রবেশ করলেন।

মাঝারী আকারের একখানি ঘর। আসবাব আছে, বাহুল্য নেই। সেন্টার টেবিলের ওপর জয়পুরী পেতলের ফুলদানীতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। তার প্রতিবিম্ব পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়। টেবিলের সামনে মখমলে ঢাকা একটি মোড়া। একদিকে আবলুস কাঠের একখানি খাট, পাশেই আলনা। আরেকদিকে ডেক-চেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় রাজাবাহাদুর। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় একখানি বই পড়ছিলেন—জিম্ করবেটের 'দি ম্যান ইটিং লেপার্ড অব্ রুদ্রপ্রয়াগ।'

অতনুদের পায়ের শব্দ পেয়ে তিনি উঠে বসলেন। চেয়ারের হাতলের ওপর বইখানা রাখলেন। অতনুর মনে হল সে ইতিহাসে পড়া, মানস-চোখে দেখা কোন গ্রীসীয় বীরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কাঁচা হলুদের মত গায়ের রং উন্নত নাসিকা, স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘকায় চেহারা। কালো কুচকুচে একমাথা চুল, আর দুটি অত্যুজ্জ্বল চোখ। বয়স যাই হোক, দেখে বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি মনে হয় না। পরে অতনু জেনেছে যে একযুগ আগেই তিনি ঐ বয়স পার হয়ে এসেছেন।

—মণিরাম, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর—একটা চেয়ার দিয়ে যা তো। তারপরে অতনুর দিকে ফিরে রাজাবাহাদুর বললেন—আমার ঘরে তো কেউ বড় একটা বসে না, তাই আমি বেশি চেয়ার রাখি না।

—চেয়ারের কি দরকার? অতনু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—ঐ তো মোড়া রয়েছে, আমি ওটাতেই বসছি।

রাজাবাহাদুর একটু হাসেন।

সুরেশবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসেন। অতনুর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেন—ওটা রাজাবাহাদুরের, অন্য কেউ বসতে পারে না।

অতনু লজ্জা পায়। সে চুপ করে থাকে।

মণিরাম চেয়ার নিয়ে আসে। রাজাবাহাদুর ইশারায় অতনুকে বসতে বলেন। তারপরে মণিরামকে হুকুম করেন—বামুনদিকে বল, এই বাবুকে জলখাবার দিতে।

মণিরাম চলে যায়। রাজাবাহাদুর সুরেশবাবুর দিকে তাকান। বলেন—তুমি তাহলে এখন এসো সুরেশ!

সুরেশবাবু ঘাড় চুলকোতে শুরু করেন।

—কিছু বলবে নাকি? রাজাবাহাদুর প্রশ্ন করেন।

চুলকোনোর গতি কমিয়ে, লজ্জাজড়িতকণ্ঠে সুরেশবাবু উত্তর দেন—আজ্ঞে, ম্যানেজারবাবু তখন বলেছিলেন, আমি যদি অতনুবাবুকে নিয়ে আসতে পারি তাহলে···। আমি বহুকষ্টে নিয়ে এসেছি হুজুর! আসতে কি চায়···! হেঁ, হেঁ ···।

—ও তোমার বকশিশ? মণিরাম!

মণিরাম ঘরে ঢোকে। রাজাবাহাদুর আদেশ করেন—সুরেশকে এক বোতল হোয়াইট লেবেল দে, আর · বকুলবাঈকে একবার পাঠিয়ে দে তো!

সুরেশবাবু মাথা নিচু করেন।

একটু বাদে একটি সুন্দরী যুবতী ঘরে ঢোকে। অতনু তাকে পাশের ঘরে দেখে এসেছে। সার্থকনামা বকুলবাঈ—'বিধুমুখ-শীধুসিক্ত' বকুলফুলের মতো। তবে অতনু ভাবে এই কুলত্যাগী বকুল দেখতে ফুলের মতো সুন্দর হলেও এর অন্তর সৌরভহীন।

বাঈজী মাথা নুইয়ে রাজাবাহাদুরকে আদাব করে। মধুক্ষরা কণ্ঠে বলে—ফরমাইয়ে।

—আজ ভেবেছিলাম তোমাদের ছুটি দেব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। সুরেশকে একটু খুশি করতে হবে যে?

—বেশ তো, উনি আমার সঙ্গে চলুন। বিশুদ্ধ বাংলায় বাঈজী উত্তর দেয়। তারপরে সে আবার আদাব করে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সুরেশবাবু তাকে অনুসরণ করেন।

অতনু যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। সে একটু নড়ে-চড়ে বসে। রাজাবাহাদুর চেয়ার ছেড়ে পায়চারি করতে শুরু করলেন। তাঁর পায়ে বাঘের চামড়ার চটি। জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ ঘরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে অতনুর বুকে হাতুড়ির ঘা মারতে থাকে। খানিকক্ষণ বাদে রাজাবাহাদুর হঠাৎ অতনুর কাছে এসে দাঁড়ান। অতর্কিতে প্রশ্ন করেন—চাকরি করবে?

বিস্মিত অতনু রাজাবাহাদুরের মুখের দিকে তাকায়।

পায়চারি বন্ধ করে রাজাবাহাদুর গিয়ে আবার চেয়ারে আশ্রয় নেন। তারপর বলতে থাকেন—পড়াশুনোর কোন ব্যাঘাত হবে না। সদরের কলেজেই ক্লাস করতে পারবে। শুধু কলকাতা ছেড়ে তোমাকে গিয়ে ফুলগঞ্জে থাকতে হবে। ফুটবল সিজনটা অবশ্য কলকাতাতেই কাটাতে পারবে।

—আমি খেলতে ভালবাসি। তা বলে খেলাই আমার পেশা হবে, এটা আমি চাই না।

—তার মানে আমার প্রস্তাবে তুমি রাজী নও? রাজাবাহাদুরের কণ্ঠে উষ্মা।

—আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার জীবনের উদ্দেশ্য অন্যরকম। অতনু অকম্পিত স্বরে জবাব দেয়।

—তোমার চেয়ে বয়স এবং অভিজ্ঞতা আমার অনেক বেশি। ছাত্র জীবনের রঙীন আশার সঙ্গে কর্মজীবনের কঠিন বাস্তবের কোন মিল নেই।

—কিন্তু মোসাহেবী তো সকলের ধাতে সয় না রাজাবাহাদুর!

রাজাবাহাদুর সোজা হয়ে বসলেন। অতনু রূঢ় উত্তরের প্রতীক্ষা করতে থাকে। অথচ রাজাবাহাদুর নিরুত্তর। তিনি আবার পায়চারি শুরু করলেন। আস্তে আস্তে তাঁর মুখের রক্তিমাভা কেটে গেল।

একজন বর্ষীয়সী বিধবা একখানি রূপোর রেকাবীতে কিছু ফল ও মিষ্টি এনে অতনুর সামনে রাখেন। রাজাবাহাদুরের বামুনদি। সাধারণ রাঁধুনী নয়, তাঁকে দেখে ভদ্রঘরের মহিলা বলেই মনে হল অতনুর।

হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখে, পায়চারি বন্ধ করে রাজাবাহাদুর আবার অতনুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন—কি ভাবছ? সবই মিষ্টি, খেলে নেমকহারামী হবে না। তাছাড়া হোটেলের রান্না নয়। আমি হোটেলের খাবার খাই না বলে ঐ ভদ্রমহিলা আমার জন্য তৈরি করেছেন। ভয় নেই। জাত যাবে না।

ক্ষুধার্ত অতনু রেকাবীর দিকে হাত বাড়ায়।

॥ দুই ॥

"যান, হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।"

বকুলবাঈয়ের কথায় অতনুর ভাবনা মিলিয়ে যায়। বাঈজী ঘরে ফিরে এসেছে।

অতনু উঠে দাঁড়ায়। বলে, "শুধু মুখ-হাত নয়, ভাবছি মাথায়ও একটু জল ঢেলে নেব।"

"মাথা গরম হয়ে গেছে বুঝি?" বকুলবাঈ হাসতে হাসতে বলে।

অতনুও হাসে। উত্তর দেয়, "না ঠিক তা নয়, তবে আমার রাতে স্নান করার অভ্যেস কিনা, মাথায় একটু জল দিলে ভালই লাগবে।"

"তা বেশ তো যান না, কিন্তু এত রাতে আবার বেশি পানি ঢালবেন না যেন, সর্দি লেগে যাবে।" একবার থামে বকুলবাঈ। তারপরে তাগিদ দেয়, "যান দেরি করবেন না, খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।" সে অতনুর দিকে একখানি তোয়ালে এগিয়ে দেয়।

তোয়ালেখানা হাতে নিয়ে অতনু বলে, "আমি কিন্তু এতরাতে আর কিছু খাব না।"

সহসা গম্ভীর হয়ে যায় বকুলবাঈ। বলে, "থাক্ জোর করব না। জানি জ্ঞানতঃ কেউ আমাদের ঘরে কিছু খায় না, বেহুঁশ না হলে কেউ আমাদের ছোঁয় না।"

"তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। আমার কাছে ব্রাহ্মণের চেয়ে মানুষের মূল্য বেশি, দেবাঞ্জলির চেয়ে জীবসেবা বড়।" একটু হাসে অতনু। তারপরে প্রশ্ন করে, "জীবনে এত আঘাত সয়েছ, অথচ অভিমানটাকে বিসর্জন দিতে পারো নি?"

"অভিমান যে নারীর সবচেয়ে বড় সম্পদ বাবুজী! বাঈজীরাও তো নারী!"

"বেশ, তুমি খাবার ঠিক করো। আমি আসছি।"

বাথরুম থেকে বেরিয়ে অতনু দেখে বকুলবাঈ দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে অভিযোগ করে, "বেশি পানি ঢালতে মানা করলাম, অথচ শুনলেন না তো! বিদেশে যাচ্ছেন, গিয়ে তবিয়ৎ খারাপ হয়ে পড়লে কে দেখবে?"

"কেন? তুমিই তো রয়েছ।"

"আমার বয়েই গেছে।"

"সেকি? নিয়ে যাচ্ছ তুমি, আর অসুখ হলে দেখবে না?"

এবারে হার মানে বকুলবাঈ। বলে. "বাজে কথা ছেড়ে খেতে বসুন তো। ফুলগঞ্জের আবহাওয়া চমৎকার। সেখানে গিয়ে অসুখ হবে কেন?"

কিন্তু অতনু এত সহজে ছাড়তে চায় না বকুলবাঈকে। সে আবার প্রশ্ন করে, "তা না হয় বুঝলাম. কিন্তু কোনদিন যদি অসুখ করে, তুমি আমাকে দেখবে তো?"

"সে তখন দেখা যাবে, এখন খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন। রাত যে ভোর হতে চলল?"

অতনু খেতে বসে। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তারপরে সে বাঈজীকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি তো জানতে চাইলে না. সেদিন রাজী না হয়েও, আজ কেন আবার সেই চাকরি নিতে এখানে এলাম?"

"এতে জিজ্ঞেস করার কি আছে? মানুষ পেটের দায়েই আত্মবিক্রয় করতে আসে। আমরা যে একই পথের পথিক বাবুজী!"

"ঠিকই বলেছ. কাল বরিসাল থেকে বাবার চিঠি পেয়েছি, তিনি অবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন। বেকার দাদা বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে শিকার আর থিয়েটার নিয়ে মেতে আছে। বাবার কাছ থেকে আমার টাকা নেওয়া দূরের কথা. এখন তাঁকে কিছু সাহায্য না করতে পারলে সংসার অচল হয়ে পড়বে।"

"রাজাবাহাদুরের কামরা বন্ধ দেখে দুঃখিত হয়েছিলেন, না?"

"সে দুঃখকে আর স্থায়ী হতে দিলে কোথায়?" হেসে উত্তর দেয় অতনু। "ফিরে যাবার মুখে গেটের কাছেই দেখা হল তোমার সঙ্গে। আর সমস্ত লজ্জা ও ঘৃণাকে তোমার এক পশলা হাসি দিয়ে ধুয়ে ফেলে আমাকে নিয়ে এলে এ ঘরে। এনে এমন একটা গল্প শোনালে যে ফুলগঞ্জকে দেখার লোভ সামলাতে পারছি না।"

"নসীব ভাল যে আমার তানপুরার বেসুরো আওয়াজ কাল রাতে রাজাবাহাদুরের কানে বিঁধেছিল। আজ সকালে তাই আমিও যখন সবার সঙ্গে ফুলগঞ্জ রওনা হচ্ছিলাম, রাজাবাহাদুর হুকুম করলেন তানপুরা না সারিয়ে আমার কলকাতা ছাড়া চলবে না। তাই তো মনের মতো তানপুরার সঙ্গে মনের মতো আদমীকেও নিয়ে যেতে পারছি।"

খাওয়া বন্ধ করে অতনু বকুলবাঈয়ের দিকে তাকায়। কিন্তু বলে না কিছু।

তাকে নির্বাক থাকতে দেখে বকুলবাঈ আবার শুরু করে, "রাজবাহাদুরকে আমি জোর চমকে দেবো। আপনাকে নিয়ে গেলে সত্যি তিনি খুব খুশি হবেন। সেদিন আপনি চলে যাবার পরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এখানকার হাল-চাল দেখে আপনি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। দুঃখ করে বললেন —এরা তো জানে না, সাজানো ঠাট না দেখালে লোকে আমাকে আর রাজাবাহাদুর বলবে না। আমার সমাজ আমাকে নির্বাসিত করবে।" বকুলবাঈয়ের কন্ঠে সমবেদনা।

"তোমার এ কৃতিত্বের জন্য বকশিশ চাইবে না?"

"জরুর।"

"কী চাইবে?"

"আপনাকে।"

অতনু চমকে ওঠে। তার চোখে চোখ রেখে বকুলবাঈ আবার বলে, "রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে আপনাকে চেয়ে নেবো আমি। বলব, গোলাপগঞ্জ প্রাসাদের সান্ধ্য-মজলিসে তিনি যেন কোনদিন আপনাকে না নিয়ে যান।"

খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে অতনু এসে খাটের ওপর বসে। বাকি খাবারটা নিয়ে বকুলবাঈ খেতে শুরু করে। শংকামিশ্রিত কণ্ঠে অতনু বলে, "আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে জাবেদা···"

মুখ তোলে বকুলবাঈ। ও নামে গত সাত বছর কেউ তাকে ডাকে নি।

অতনু হেসে বলে, "আমি তোমাকে ঐ নামেই ডাকব। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে, মোসাহেবী চাকরিটা বজায় রাখতে পারব কি না।"

"মোসাহেবী আপনাকে করতে হবে না বাবুজী! রাজাবাহাদুর মোসাহেবী পছন্দও করেন না। সেদিন যাঁদের দেখেছেন, তাঁরা ভাবেন, রাজাবাহাদুর ওঁদের ভাঁড়ামীতে খুশি হন। অথচ তিনি মনে মনে হাসেন। ওঁদের করুণা করেন। বিরক্ত হয়েও তাড়িয়ে দেন না। ওঁদের যে তাহলে দুর্গতির আর সীমা থাকবে না।" একটু থেমে বকুলবাঈ আবার বলে, "তাছাড়া তাড়িয়ে দিতে আরও একটু বাধা আছে বাবুজী!" -

"কী?"

"জমিদারী চাল বজায় রাখতে হলে মোসাহেব পুষতেই হবে।"

তিক্তকন্ঠে অতনু বলে, "ওদের খুশি করতে তো তাঁর উৎসাহের শেষ নেই। বকশিস দেবার জন্য তোমাদের রাখা হয়েছে।"

শুকনো হাসি হেসে বকুলবাঈ বলে, "বাবুজী, দুনিয়ায় যে যার পেশা মাফিক কাজ করে যাবে। আমাকে আমার কাজ করতে দেখে দুঃখিত হয়েছেন কেন? যেখানেই থাকতাম, এ আমাকে করতেই হত।"

অতনু কোন উত্তর দিতে পারে না। বকুলবাঈয়ের বিগত জীবন-কাহিনীর

রেশ এখনও তার মনে জড়িয়ে আছে।

খাওয়া শেষে বকুলবাঈ খাটের ওপর অতনুর বিছানা করে দেয়, মেঝেতে নিজের শয্যা পাতে। খাটে আশ্রয় নিয়ে অতনু জিজ্ঞেস করে, "তুমি রাজাবাহাদুরকে এতো শ্রদ্ধা কর কেন?"

"তিনি শ্রদ্ধেয় বলে।" একটু থেমে বকুলবাঈ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, "আপনি কেন এদের শ্রদ্ধা করতে পারছেন না জানেন?"

"কেন?"

"আপনি শুধু এঁদের পূর্বপুরুষদের দেশদ্রোহিতা আর দস্যুবৃত্তিকেই মনে করে রেখেছেন। দেখছেন, এঁদের বিলাসিতা, আর ভোগবাসনাকেই ভাবছেন সে বিলাসিতার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে। একবারও ভাবছেন না যে এই বিলাসিতা যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে ভারতের নৃত্যকলা ললিতকলা মার্গ-সঙ্গীত ভাস্কর্য আর স্থাপত্য শিল্পকে। এক কথায় এদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে। বিলাসী ও খেয়ালী সম্রাট কোটি কোটি মানুষের কলিজার খুন নিঙড়ানো রুপেয়া আর শ্রমের অপচয় করেছিলেন বলেই আগ্রা বিশ্বের বিস্ময়।" একবার থামে সে। তারপরে উত্তেজিত কণ্ঠে আবার বলে ওঠে, "রাজাবাহাদুর যদি খেয়ালী আর বিলাসী না হতেন, তাহলে সারাজীবন আমাকে কমলিবাঈয়ের দাসীবৃত্তি করতে হত। আমার মেয়েকে অনাথ আশ্রম ছাড়িয়ে দার্জিলিংয়ের কনভেন্টে পড়াতে পারতাম না।"

তাকে থামতে শুনে অতনু অনুভব করে এবারে তার কিছু বলা প্রয়োজন। অথচ তার কন্ঠ যে হারিয়ে ফেলেছে ভাষা।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা সারা ঘরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। খানিকক্ষণ কেটে যায়, তারপর বকুলবাঈ সে নীরবতার অবসান ঘটায়, "বাবুজী, গত সাত বছরের জীবনে প্রায় প্রতি রাতেই আমার ঘরে লেগে আছে মহ্‌ফিল, কিন্তু মেহমানের খতিরদারী আজই প্রথম। আপনিই আমার জীবনের পহেলা মেহমান।"

অতনু আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। বাঁধ ভাঙা জল নেমে আসে তার দু'চোখ ছাপিয়ে। কন্ঠস্বর পাছে সেই অপকীর্তির বার্তা নিয়ে বকুলবাঈয়ের কাছে হাজির হয়, তাই সে নীরব থাকে। ভাবতে থাকে বকুলবাঈয়ের কথা, ভাবতে থাকে জাবেদা খাতুনের বেদনাময় জীবনের ইতিহাস।

বকুলবাঈও চুপ করে আছে। সে কি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করছে? কিন্তু তার চোখের পাতায় যে আজ নেই ঘুমের পরশ, তা অতনুর অজানা নয়।

আর জানে আকাশের ঐ কলঙ্কময়ী চাঁদ—যে সমাজের সকল অনুশাসনকে উপেক্ষা করে, তার কয়েক ঝলক হাসিভরা জ্যোৎস্নাকে জানালার পথে এই ঘরে পাঠিয়েছে। তারা চুপি চুপি এসে বকুলবাঈয়ের সারা মুখে মায়ার প্রলেপ

দিয়েছে বুলিয়ে। সাত বছরে কাঁচ-কোমল মুখখানির কমনীয়তা কমে গেলেও স্নেহের ছোঁয়া যায় নি মুছে।

রাত চিরস্থায়ী নয়। সে এগিয়ে চলেছে দিনের দিকে। বারান্দার বড় ঘড়িটা অনন্তকালকে সাক্ষী রেখে অক্লান্ত কর্মীর মতো সে অগ্রগতির হিসেব রাখছে।

কালো মেঘ চাঁদকে ঢেকে ফেলে, মেটে জ্যোৎস্না যায় মিলিয়ে। বকুলবাঈয়ের সারা মুখে নেমে আসে আঁধার··

সাত বছর আগে। লখ্‌নউয়ের এক খানদানী মুসলমান পরিবারে, পিতা-মাতার স্নেহ ও শাসনে একটি অনাঘ্রাত কুসুমের মতো বিকশিত হচ্ছিল জাবেদা। বাড়িতে ওস্তাদ রেখে বাবা গান শেখাতেন। দশম শ্রেণীর ছাত্রী সে। ওদের পর্দানশীন পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়ার চলন না থাকায় বয়সের তুলনায় শ্রেণীটা ছিল কম, কিন্তু রূপটা ছিল বেশি। রূপ আল্লার এনায়েৎ, কিন্তু শয়তানের হাতিয়ার।

যৌবনের সেই আগমনী দিনগুলোর কথা মনে হলে জাবেদার চোখ আজও জলে ভরে ওঠে। স্বপ্নের মতো কাটছিল দিনগুলো। দেহে যৌবনের বান এলে মেয়েদের যেমন সর্বত্র আদর বাড়ে, জাবেদার বেলাও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বরং রূপের দৌলতে আদরের ভাগটা একটু বেশিই জুটছিল।

এমনি এক রঙীন দিনে আবদুলের সঙ্গে পরিচয়। পাঠানের মত বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ের রংটা ময়লা হলেও চোখমুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি। কথা-বার্তায় পাণ্ডিত্যের ছড়াছড়ি। জাবেদার মতো তরুণীর মনে জোয়ার আনার সকল কৌশলই তার জানা ছিল।

প্রথম আলাপের পরেই আবদুল তার কুমারী জীবনের সঙ্গহীন-আঁধার-রাতের প্রলাপ হয়ে দেখা দিল। স্কুলের পথে দুজনের চোখাচোখি হয়। কথা হয় রেসিডেন্সীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। কাহিনীর সূত্রপাত হয় ইমামবাড়ার আঁধার-নির্জন সোপানে।

কিন্তু জাবেদাদের সমাজে এরকম কাহিনীকে অবলম্বন করে জীবন রচনায় বাধা আছে। তার বাবা আবদুলকে বরদাস্ত করতে পারলেন না। স্কুল থেকে জাবেদার নাম কাটালেন। তাকে বাড়ির বাইরে বেরুতে নিষেধ করে দিলেন।

ভবিষ্যত চিন্তা না করে, পিতামাতার স্নেহের মায়াজাল ছিঁড়ে জাবেদা এক আঁধার রাতে ঘর ছাড়ল। পেছনের দরজা দিয়ে, আঁস্তাকুড়ের পাশে এসে আবদুলের পাণিগ্রহণ করল। তারই সঙ্গে দিল্লীগামী রেলগাড়িতে চেপে বসল।

চৌড়ীবাজারের সাঁপল এক অন্ধ-গলির শেষপ্রান্তে, জরাজীর্ণ একটি বাড়ির নিচের তলার স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে তাদের নতুন জীবন শুরু হল। দিওয়ানা আবদুল সারাদিন নোকরীর চেষ্টায় ঘুরে বেড়াবার ভান করে। ঘরে ফিরে এলে জাবেদা মুষড়েপড়া আবদুলকে সাহস দেয়, সেবা করে, সোহাগ জানায়। তাকে

সুখী করতে গায়ের গয়নাগুলো খুলে খুলে দিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে।

নিজের শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আবদুল তাকে যা বলেছে, তা যে সবই ঝুটা, একথা জাবেদা যেদিন বুঝতে পারল, সেদিন আর তার করার কিছুই ছিল না। বাড়ির দরজা চিররুদ্ধ, দেহে মাতৃত্বের ডাক, মনে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে, আবদুল নেই। সে আর ফিরে আসে নি। যে দু'গাছা চুড়ি ও দুলজোড়া নিয়ে আগের রাতে আবদুলের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছিল, সেগুলো বিক্রি করে বাড়ি ভাড়া মিটিয়ে, সামান্য কয়েকটি টাকা হাতে জাবেদা পথে এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু মহানগরীর মসৃণ পথ তো সকলের কাছে সুগম নয়। ক্লেদাক্ত সমাজের পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা সেখানে প্রতি পদক্ষেপে।

নিজের ভুলের জন্য নিজেকে দায়ী করে জাবেদা শুধু সৎভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু মানুষের সমাজ তাকে সে অধিকার দেয়নি। দিল্লীর পথে পথে, দুয়ারে দুয়ারে, দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছে। চাকরি পায়নি, ভিক্ষে পেয়েছে। চাকরানির কাজ জোটে নি কিন্তু পাটরাণী হবার সুযোগ এসেছে। গভীর রাতে ফুটপাতের গাড়ি বারান্দার নিচে মাংসলোভী বড়লোকের কবল থেকে বাঁচতে গিয়ে পুলিসের হাতে পড়েছে। তারা আবদুলকে খুঁজে দেয়নি, অথচ অজানা অপরাধে তাকে হাজতে রেখে নির্যাতন করেছে। মসজিদের চত্বরে পাতানো মাসি শেষ পুঁজি নিয়ে উধাও হয়েছে।

এমনি সময় ত্রাণকর্তার মতো রতনের আবির্ভাব। চাকরির আশায় রতনের সঙ্গে আজমীঢ়ী গেট পেরিয়ে সেদিন জাবেদা যে পথে পা দিয়েছে, সে পথ আজও তার জীবন-নায়ের কাণ্ডারী হয়ে আছে। দিল্লীর জি. বি. রোড—কলকাতার চিৎপুরের চেয়ে প্রশস্ত হলেও পার্থক্যহীন।

বিশাল বাড়িটার তিনতলার একটা বন্ধ ঘরের সামনে এসে রতন কড়া নাড়ে। একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক দরজা খুলে বাইরে আসে। রতন তাকে ফিসফিস করে কি যেন বলতে সে আবার ভেতরে চলে যায়। একটুবাদে বেরিয়ে এসে রতনের হাতে কতগুলো নোট গুঁজে দেয়। রতন সেগুলো পকেটে পুরে হাসতে হাসতে জাবেদার কাছে আসে। বলে—এখানেই তোমাকে চাকরি করতে হবে। খাওয়া-পরা আর হাতখরচ পাবে। বাবুদের বকশিশের অর্ধেক তোমার।

তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই রতন চলে যায়।

সেদিন সন্ধে হতেই জাবেদা বুঝতে পেরেছে সব। তারপর সে লজ্জায় ও ঘৃণায় কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। বহুবার পালাতে চেয়েছে। কিন্তু কিছুই পারেনি। ধরা পড়ে কমলিবাঈয়ের হাতে মার খেয়েছে। অনাহারে বন্দী থাকতে হয়েছে সারাদিন। ভয় দেখিয়েছে দালালের দল। কমলিবাঈ

অবশ্য তাকে নাচগান শিখিয়েছে। জাবেদা থেকে বকুলবাঈ নামকরণ করেছে। মেয়ে হবার সময় তিনমাসের ছুটি দিয়েছে। মেয়েটাকে অনাথ আশ্রমে দেবার ব্যবস্থা করেছে। ভালো খদ্দের এলে একটু-আধটু মদও খেতে দিয়েছে। কিন্তু বকশিশের অর্ধেক দূরের কথা, এক আনাও দেয়নি।

তবু জাবেদা কাজে কোনদিন গাফিলতি করে নি। রাতের পর রাত খদ্দেরদের আনন্দ দিয়েছে—নেচেছে, গেয়েছে। এমনকি বিবস্ত্র হয়ে তাদের ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছে।

ঝগড়া হত শুধু মেয়েকে জামাকাপড় আর জিনিসপত্র পাঠানো নিয়ে। এই কারণেই একদিন কমলিবাঈয়ের সঙ্গে হাতাহাতির সময়, তার এক দালাল মদের বোতল দিয়ে জাবেদার মাথায় আঘাত করে।

আর ঘটনাচক্রে খেমটানাচের বাঈজী জোগাড় করতে রাজাবাহাদুর ঠিক তখুনি সেখানে উপস্থিত হন। তিনি সেই দালালটাকে দু-চার ঘা লাগিয়ে, সঙ্গের এক কর্মচারীকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপরে কমলিবাঈকে জানালেন যে তিনি জাবেদাকে চিরদিনের মতো সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

কমলিবাঈ দু'হাজার টাকা দাবি করল।

রাজাবাহাদুর বললেন—কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও দু'হাজার টাকা আমি তোমাকে দেব। তবে অন্যায়ভাবে এই মেয়েটিকে মারধোর করার জন্য জরিমানা বাবদ তার থেকে এক হাজার টাকা কেটে নিয়ে মেয়েটিকে দিয়ে দেব।

তারপরে তিনি বীরেশ্বরবাবুকে আদেশ করেন—এক হাজার টাকা ওকে দিয়ে দু'হাজার টাকার রসিদ নাও। লিখিয়ে নাও যে এই মুহূর্ত থেকে এ মেয়েটির ওপর ওর আর কোন অধিকার রইল না।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর, সেই নরককুণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে রাজাবাহাদুরের গাড়িতে উঠল জাবেদা। লখনউ থেকে উত্তর-বাংলায়। খানদানী পিতার স্নেহনীড় থেকে রাজাবাহাদুরের খেমটার আসরে।...

॥ তিন ॥

নীল আকাশ, সবুজ মাটি আর স্বচ্ছ জল। আকাশে তারার আলপনা, মাটিতে ফুলের সমারোহ আর রানীদিঘির পাহাড়ের মতো উঁচু পাড়ে আছাড় খাওয়া ঢেউয়ের অবিরাম কলরব। রাজবাড়িতে বিরামহীন কোলাহল, বাগানে জানা-অজানা পাখীদের কাকলি।

গোধূলিতে দক্ষিণ দেউড়ী সচকিত হয় অশ্ব-খুর-ধ্বনিতে। মন-মাতানো আতরের গন্ধে মাতাল হয় ফুলগঞ্জের বাতাস। রাজাবাহাদুর পারিষদদের নিয়ে

গোলাপগঞ্জে যান টগবগিয়ে। সেখানে ঝিঁঝিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজে বাঈজীদের নূপুর, কোকিলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তারা গান গায়।

অশ্ব-খুর-ধ্বনির সঙ্গে তাল রেখে উত্তর দেউড়ীতে বেজে ওঠে কাঁসর ও ঘণ্টা —সন্ধ্যারতির শাঁখ। চন্দন-চর্চিত ফুলের গন্ধে রাধা-গোবিন্দ মন্দির বিভোর হয়। কিশোরী রাজকুমারী বরুণাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন রানীমা। অর্ধনিমীলিত চোখে তাকিয়ে থাকেন ফুলগঞ্জের গৃহদেবতার দিকে।

আর অতনু? হাস্নাহানার আকুল আকর্ষণে বিহ্বল হয়ে সে বেরিয়ে আসে বাগানে। জুঁই বেল রজনীগন্ধা হাওয়ায় দুলছে। লজ্জামধুর সে দোলায় অতনুর মনও দুলে ওঠে। ভুলে যায় অশান্ত রাজবাড়ির জীবনের ক্লান্তিকে।

দেশের বাড়ি ছেড়ে তিন বছর আগে কলকাতায় এসেছিল অতনু। এই তিন বছর আকাশ মাটি আর জলের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ চলছিল। ফুলগঞ্জে এসে বিচ্ছেদের অবসান হয়েছে।

সুতরাং ফুলগঞ্জকে তার খারাপ লাগছে না। তবে এই রাজপ্রাসাদকে তার একটি ভাঙা দেউল বলেই মনে হচ্ছে। আর যে রাজাবাহাদুরকে সেদিন প্রথম দর্শনে গ্রীসীয়-বীর বলে মনে হয়েছিল, এখন অতনুর তাঁকে দেবতা বলে মনে হয় —ভাঙা দেউলের দেবতা।

এখানে অতনুর প্রচুর অবসর। কলেজ আর বাড়ি। বাড়ি মানে রাজ-বাড়ির উত্তরদিকের একখানি ঘর। রাজসূয় কোলাহল এদিকটায় বড় একটা পেঁছয় না। জানালার পাশেই বাগান। খুব বড় না হলেও কৌলিন্যে বিখ্যাত। বিলেত ও কলকাতার নামকরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত নানা জাতের ফুলের বীজ আসে। সব গাছ বাঁচে না। যা বাঁচে তাতেও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ফুল ফোটে না! মালীদের কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি নেই। তবু তাদের জরিমানা হয়, এমনকি চাকরি যায়। তাই বলে তাদের রাজবাড়ি থেকে বিদায় নিতে হয় না, মাসান্তে মাইনের অঙ্কও কমে না। শুধু হাত জোড় করে রাজাবাহাদুরের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কাঁপতে হয়।

সখীচরণ বাগানের প্রবীণতম মালী। সে যখন এ বাড়িতে আসে তখন রাজাবাহাদুরের বয়স বড়জোর বিশ বছর। তারপর তিরিশটা শীত সখীচরণের জীবনে আঘাত হেনে গেছে। সেদিনকার সেই বলিষ্ঠ যুবক আজ বার্ধক্যে উপনীত। যাকে সঙ্গে নিয়ে সখীচরণ প্রথম এ বাড়িতে প্রবেশ করেছিল, সেই কানাইয়ের মাকে চার বছর আগে করতোয়ার তীরে পঞ্চভূতে মিশিয়ে দিয়ে এসেছে। সিঁথিতে সিঁদুরের উজ্জ্বল চিহ্ন নিয়ে সে চলে গেছে সবাইকে ছেড়ে।

এই বাড়িতেই সুশীলা ও কানাইয়ের জন্ম হয়েছে। সুশীলার জন্মের সময় ওর মায়ের জীবনের আশা খুবই কম ছিল। রানীমার হুকুমে রাজবাড়ির বড় ডাক্তার নিজে চিকিৎসা করেছিলেন। রানীমাও রোজ একবার করে দেখে যেতেন তাকে।

কথায় কথায় সখীচরণ অতনুকে সুশীলার বিয়ের গল্প বলে। পাত্র একটু গোলমাল করাতে রাজাবাহাদুর তাকে জমি ও টাকা দিয়ে খুশি করেছিলেন। নইলে সুশীলা হয়তো শান্তিতে স্বামীর ঘর করতে পারত না। এই গোলমালের ইতিহাস অতনু শুনেছে, এ বাড়ির প্রবীণতমা পরিচারিকা মানদার কাছ থেকে।

সুশীলা মালীকন্যা হলেও ঠিক তেমনভাবে মানুষ হয় নি। ছোটবেলা থেকেই তার ওপর রাণীমার স্নেহদৃষ্টি পড়েছিল। রাজবাড়ির খাওয়া আর রাণীমার দেওয়া জামাকাপড়ের দৌলতে তাকে মালীর মেয়ে বলে মনে হত না। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে, কথাবার্তায় দু'-একটি ইংরেজী শব্দের ব্যবহার ও বাংলায় চলনসই চিঠি লিখতে পারত সে। তাই ম্যানেজার বীরেশ্বরবাবুর বেকার ও মাতাল সম্বন্ধীর প্রেমপত্রের যথাযথ উত্তর দিয়েছিল সুশীলা। সন্ধ্যাসমাগমে রাজবাড়ির সবাই যখন অন্য কাজে ব্যস্ত, বাগানটা তখন রমণীয় হলেও নির্জন—ষোড়শী মালীকন্যার অভিসারের আদর্শ লীলাভূমি।

মায়ের চোখেই ধরা পড়ে প্রথম। ভয়ে ভয়ে কথাটা সে রানীমাকে জানায়। রাণীমা ঘটক লাগিয়ে দশ দিনের ভেতরে সুশীলার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন। পাত্রটি সদর-পোস্টাপিসের পিওন।

পাত্রের বৃদ্ধ পিতা কনে দেখবার সময় কিছুই টের পায় নি। কিন্তু বাসরঘরে বরের দৃষ্টি এড়ায় না। সে বেরিয়ে এসে গোলমাল শুরু করে। খবর পেয়ে রাজাবাহাদুর তাকে ডেকে পাঠান। বন্ধ ঘরে দু'জনের কি সব কথাবার্তা হয়। তারপর শান্ত ছেলেটির মতো বর আবার গিয়ে বাসরঘরে ঢোকে। অনেকে বলে, রাজাবাহাদুর নাকি তাকে পঁচিশ বিঘে জমি আর পাঁচশো টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। নগদ টাকাটা তার হাতে দিলেও, রাজাবাহাদুর জমিটা সুশীলার নামে লিখে দিয়েছিলেন। ফলে সুশীলার অবৈধ সন্তানকে তার স্বামী স্বীকার করে নিয়েছে।

সখীচরণ চেয়েছিল কানাই তারই মতো রাজবাড়ির মালী হবে। কিন্তু যে ছেলে রাজবাড়িতে মানুষ, তার কি মালী হওয়া সাজে? ছেলের চালচলন সখীচরণের কোনদিন পছন্দ হয় নি। অথচ স্ত্রীর জন্য কিছু বলতেও পারতনা তাকে।

সেদিন বিকেলে সখীচরণ বাগানের জল দেওয়া শেষ করে, দাওয়ায় বসে তামাক টানছে। কানাইয়ের মা উত্তর-দেউড়ীর ইঁদারা থেকে জল আনতে গেছে। ঘরের ভেতর একটা চলাফেরার আওয়াজ পায় সখীচরণ। হুঁকোটা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে ঘরে ঢোকে সে। বাঁশের মাচার কাছে দাঁড়িয়ে কানাই যেন কি খুঁজছে। সখীচরণ চীৎকার করে ওঠে,—"আবার তুই পয়সা চুরি করছিস?"

কানাই একখানা হাত পেছনে রেখে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। সখীচরণ তার হাতখানা ধরে ফেলে। কিন্তু সবল হাতের শক্ত মুঠো খোলা তার সাধ্যে কুলোয় না। ক্রুদ্ধ পিতা আদেশ করে,—"খোল্ বলছি। আমার এতো কষ্টের পয়সা তুই জুয়ো খেলে ওড়াবি?"

কানাই ঝট্‌কা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। টাল সামলাতে না পেরে সখীচরণ মাটিতে পড়ে যায়।

—"কী এতবড় সাহস? তুই আমার গায়ে হাত দিলি?" বেড়ার মধ্যে গুঁজে রাখা দা-খানা অতর্কিতে হাতে তুলে নেয় সে। কানাই কিছু বোঝার আগেই সেখানা বসিয়ে দেয় তার পিঠে।

আঘাতটা গুরুতর হলেও দৌড়ে পালাতে পেরেছিল কানাই। সরকারী ডাক্তারখানা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল সে। সেরে উঠে আর ফিরে আসে নি ঘরে। একদিন রাতে হাসপাতাল থেকেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ মালী কান্না জড়ানো কণ্ঠে অতনুকে বলে, "হায় ভগবান। কি পাপ আমি করেছি! কানাইয়ের মা তার সোনার নথ রুপোর মল রেখে গেছে ছেলের বৌয়ের জন্য। আমি এখন সেগুলো কাকে দিই বল্‌বাবু?"

সখীচরণ অতনুকে 'বল্‌বাবু' বলেই ডাকে। এ বাড়ির অনেকের কাছেই তার পরিচয় সে ফুটবল খেলোয়াড়। সমবেদনার ভাষা খুঁজে না পেয়ে অতনু নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সখীচরণ আবার শুরু করে, "রানীমার কাছে আমার আঠারো কুড়ি দশ টাকা জমেছে। আমার কানাইয়ের ছেলেকে দেব বলে কত কষ্ট করে জমিয়েছি। আপনাকে বলে যাই বল্‌বাবু, আমার মরার খবর পেলে সে নিশ্চয়ই আসবে। তখন রাণীমাকে বলে টাকা তাকে দিয়ে দেবেন।"

কোনদিন কিন্তু সখীচরণ একেবারে অন্য মূর্তিতে দেখা দেয়। সেদিন সে অতনুকে নিয়ে সারা বাগান ঘুরে বেড়ায়। কমলালেবুর যে গাছটার পেছনে বহু টাকা খরচ হয়েছে অথচ ফল ধরে নি, তার ইতিহাস বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ে সে। রাজাবাহাদুর নাকি রোজই একবার করে গাছটি দেখে যান।

বাগানের দক্ষিণদিকে কয়েকটি গোলাপ গাছ দেখিয়ে বৃদ্ধ মালী বলে, "এই চারাগুলো বসরা থেকে আনা হয়েছে। সঙ্গে চার বস্তা মাটিও এসেছে। গত বছর চারটে গাছে সাতাশটি ফুল ফুটেছিল। কিন্তু রাজাবাহাদুর বলেছেন আরও নাকি বড় ফুল হওয়া উচিত ছিল। কেন হয়নি বল্‌বাবু? বসরার মালীরা কি আরও বেশি যত্ন-আত্তি করে?"

"এসব নির্ভর করে স্থানীয় জল-হাওয়ার ওপর। ওদেশের জলবায়ুটাই গোলাপের উপযোগী। শুধু মাটি আর চারা হলেই তো হবে না।"

"জল হাওয়া তো আমাদের দেশেও খারাপ না বল্‌বাবু!" সখীচরণের কণ্ঠে প্রতিবাদ, "পাতাবাহারের পাতাগুলোর দিকে নজর দিন। ঐ জবা ও

শিউলী গাছ দু'টোয় কি রকম ফুল ফুটেছে দেখুন। তাছাড়া, টিপকলের জলে গাছ খারাপ হতে পারে বলে রাণীদীঘি থেকে নল দিয়ে বাগানে জল নিয়ে আসা হয়েছে। রাজাবাহাদুর কয়েক বছর আগে বরকন্দাজদের ঘরটা ভেঙে ফেলেছেন। ঐ ঘরটার জন্য বাগানে আলো হাওয়া আসতে পারতো না কিনা! এখানে জলবায়ুর অভাব। কি বলছেন বলুবাবু?"

অতনু বুঝতে পারে যুক্তি দিয়ে এই বৃদ্ধমালীকে বোঝানো সম্ভব নয়। অগত্যা সে চুপ করে থাকে।

বৃদ্ধমালী বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে থাকে। বোতামহীন ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে গলায় ঝোলানো তাবিজটা স্পষ্ট দেখা যায়। বলিষ্ঠ চেহারায় ভাঙন ধরেছে। আর আগের মতো পরিশ্রম করতে পারে না। গায়ের কালো রঙে তৈলাক্ত ভাবটাও গেছে কমে। চামড়ার বাঁধন হয়েছে ঢিলে। হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে পরা ধুতিখানার নক্‌শা পাড়টা চেহারার সঙ্গে বড় বেশি বেমানান।

অতনু অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

॥ চার ॥

সামনের দিকের দাঁত আর একটিও অবশিষ্ট নেই। মাথার পাকা চুলগুলো পালোয়ানদের মতো ছোট-ছোট করে ছাঁটা। মিলের কাপড়ের ঘষায় নাকি তার গায়ে জ্বালা ধরে। রাণীমা তাই ঢালাও হুকুম দিয়েছেন, বছরে তাকে চারখানি করে লালপেড়ে গরদের শাড়ী দিতে হবে।

গরদের শাড়ী পরে, দোক্তা সহযোগে বাটা-পান মুখে পুরে, পরনিন্দা করে বেড়ানোই মানদার প্রধান কাজ। তাহলেও মানদা অতনুর মনযোগ আকর্ষণ করেছে। তার মাঝে অতনু একটা বৈচিত্র্যের ছোঁয়া পেয়েছে। সুযোগ পেলেই আবদার করে রাজবাড়ির বিগত দিনের কথা বলতে।

মানদা তাকে নিরাশ করে না। সময়ের তার অভাব নেই, কিন্তু সুযোগ সব সময় হয় না। অনেককেই সে এ-সব কাহিনী শুনিয়েছে। সবাইকে দিয়েই কবুল করিয়ে নিয়েছে—আর কাউকে এ-সব কথা বলতে পারবে না। তারা যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি, তা অতনুর অজানা নয়। কিন্তু সে নিজে মানদার জীবদ্দশায় এ-সব কথা কাউকে বলেনি।

সত্তর বছরের বেশি হল মানদা এই পরিবারে আছে। রাজাবাহাদুরের পিতামহ মহারাজা সত্যনারায়ণের আমলে সে যখন প্রথম কাজে আসে, তখন সিপাহী বিদ্রোহের রেশ কাটে নি। গোরা ফৌজ প্রায়ই এসে গোলাপগঞ্জ প্রাসাদ তল্লাসী করে যেতো। ওরা খবর পেয়েছিল মহারাজা বিদ্রোহীদের সাহায্য

করেছিলেন। কিন্তু কোনদিন হাতেনাতে ধরতে পারে নি।

—"তিনি ছিলেন সত্যিকারের রাজা। রাজপুতে রক্ত বইতো তাঁর শিরায় শিরায়। বন্দুক কাঁধে তিনি যখন আরবী ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠতেন, তখন মনে হত হাঁ, রাজা বটে।" মানদা বলে চলে—

রাজাবাহাদুরের বাবা তখন নাবালক। কয়েকদিন থেকেই প্রাসাদের আবহাওয়াটা থমথমে। যখন তখন মহারাজা বেরিয়ে যাচ্ছেন। কোনদিন বা রাতে ফিরছেন না। তাঁর চোখমুখে একটা উদ্বেগের ছাপ। মহারাজার এমন মূর্তি মানদা আর কোনদিন দেখে নি।

সেদিন রাতের কথা মানদার আজও পরিষ্কার মনে আছে—টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। প্রাসাদ গভীর সুপ্তিতে নিমগ্ন। হঠাৎ মানদার ঘুম ভেঙে যায়। কাদের কথাবার্তা ও চলাফেরার শব্দ তার কানে আসে। চারদিক অন্ধকার। গোলাপগঞ্জ প্রাসাদে তো তখন এখনকার মতো বিজলী বাতি ছিল না।

বিছানার ওপর উঠে বসে মানদা। চাপা একটা কথাবার্তার শব্দ তার কানে আসে। শব্দটা বৃষ্টির টিপ-টিপ শব্দকে ছাপিয়ে, প্রাসাদের নিস্তব্ধতাকে ব্যঙ্গ করছে।

অবিন্যস্ত শাড়ীটাকে গায়ে জড়াতে জড়াতে খাট থেকে নিচে নামে মানদা। একবার ভাবে কুপীটা জ্বালাবে। তারপর কি জানি কি ভেবে আর জ্বালায় না। সে দরজা খুলে বারান্দায় আসে। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

ওপরের সিঁড়ি থেকেই দরবারকক্ষটা পুরোপুরি দেখা যায় গোলাপগঞ্জ প্রাসাদে। মানদা দেখে দরবারের ঝাড় লন্ঠনগুলো সবই নেভানো, শুধু দুটো মশাল জ্বলছে। তার আভায় আঁধার কাটে নি। আলো আর আঁধারের খেলা চলেছে দরবারকক্ষে। সেই অস্পষ্ট আলোতে রহিম শেখ, মদন মাঝি আর সিরাজের সঙ্গে মহারাজাকে দেখতে পায় মানদা। সাহেবী পোষাক পরা একজন লম্বা লোককে, প্রকান্ড একটা পিপের মধ্যে ঢুকিয়ে মুখটাকে খুব ভালো করে বেঁধে ফেলল ওরা। মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন—চিঠিটা পকেটেই পেয়েছিলি ?

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এই রোজনামচাখানাও পকেটেই ছিল। মদন মাঝি উত্তর দেয়।"

—"কটা কোপ দিয়েছিলি ?"

হাত কচলাতে কচলাতে রহিম শেখ জবাব দেয়,—"হুজুরের দোয়ায় একটার বেশি লাগে নি।"

—"সাব্বাস।" তারপর পিপেটার দিকে চেয়ে মহারাজা বললেন—বিদায় ব্যারন সাহেব, চিরবিদায়। চিঠিটা হাতে পেয়ে ভেবেছিলে প্রমাণ করতে পারবে, আমি বন্দুক গুলি ও রসদ দিয়ে সিপাইদের সাহায্য করেছিলাম। এক লাখ টাকা দিতে চেয়েছিলাম। তবু চিঠিটা ফেরত দিলে না। বলেছিলে, ইংরেজ নিজের জাতির সঙ্গে বেইমানী করে না। দরকারও নেই। কবরে শুয়ে তুমি

এখন তোমার জাতীয়তাবোধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করো। আর তোমার রূপসী স্ত্রী তার দ্বিতীয় স্বামীর সন্ধান শুরু করুক।

সেদিন সত্যনারায়ণের কথায় সুপ্ত গোলাপগঞ্জ বোধহয় চমকে উঠেছিল।

ছাদের ওপর থেকে মশালের আলোয় মানদা দেখেছে, খিড়কির পুকুর পাড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের কাছে পিপেটাকে পুঁতে ফেলা হল। কোদালের শব্দ শান্ত জলে প্রতিধ্বনিত হয়ে, ঝিমিয়ে পড়া পাখিদের চঞ্চল করে তুলেছিল! নিঝুম নিশীথে স্বপ্নভাঙা-কৃষ্ণচূড়ার রক্ত-চোখের ক্লান্তিঝরা-দৃষ্টিকে সম্বল করে, দেশের মাটি থেকে বহুদূরে শহীদ হলেন এক দেশপ্রেমিক ইংরেজ। কর্তব্যপরায়ণ জেলা কালেক্টার, জর্জ ব্যারনের নশ্বর দেহ মানদাকে সাক্ষী রেখে তার সকল প্রিয়জনের অলক্ষ্যে উত্তর-বাংলার এক নিভৃত পল্লীর অন্তঃস্থলে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

অনেক কথাই মানদা ভুলে গেছে। যা মনে আছে তাও হয়তো নির্ভুল নয়। অতনু আশ্বাস দেয়—হোক না একটু-আধটু ভুল। ঘটনাটা তো জানা যাবে। আর ভুল হল কি শুদ্ধ হল, আমি বুঝব কেমন করে? আমি তো আর সেদিন ছিলাম না।

—"তুমি?" হেসে ফেলে মানদা। দন্তহীন কালো মাড়ীগুলো বেরিয়ে আসে পুরু ঠোঁটের বেড়া ডিঙিয়ে,—"তুমি থাকবে কোত্থেকে? তোমার বাবারও বোধহয় তখন জন্ম হয় নি।"

—"তা তো বটেই।" উৎসাহ দেয় অতনু।

বৃদ্ধা বলে চলে—মহারাজ সত্যনারায়ণ ছিলেন বীর ও কর্মঠ। নিজের ইজ্জত রাখতে তিনি বহুবার মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। ইংরেজের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেতে তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু কৌশলে তিনি ইংরেজদের আঘাত করেছিলেন বহুবার। একবার মানদার ওপর আদেশ হল পাটনা থেকে এক বাঈজী এসেছে। তার সঙ্গে মানদাকে রহমতপুর কুঠিতে যেতে হবে।

মহারাজা মানদাকে তাঁর ঘরে তলব করে বুঝিয়ে দিলেন, কি করতে হবে। সব শুনে মানদার বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু হুকুম তামিল করতেই হবে।

আকাশে সপ্তমীর চাঁদ। সময়টা ভাদ্রের শেষ। প্রচণ্ড গরম। সারাদিন গোরুর গাড়ির ঝাঁকুনিতে গা-হাত-পা ব্যথায় টনটন করছে। সন্ধ্যের পরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে এল। কিন্তু আরামের অবকাশ নেই। কাজটা রাত্তেই সারতে হবে। বাঈজী কিন্তু ওরই মধ্যে একটু গড়িয়ে নিয়েছে। ওরা এ-সব কাজে অভ্যস্ত। সে নির্ভাবনায় ছিল। কিন্তু মানদার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

রাত প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে। গাড়ি রহমতপুরে পৌঁছল। গোলাপগঞ্জ থেকে রহমতপুর গোরুর গাড়িতে একদিনের পথ। যাতায়াতের পথে তখন সবাই রহমতপুর কুঠিতে রাত কাটাতো।

মানদারা দেখতে পেল, কুঠির সামনে দু'খানা গোরুর গাড়ি পড়ে আছে।

বুঝতে পারল, ডেপুটি-কালেক্টর সাহেব গোলাপগঞ্জ থেকে লাটের খাজনা নিয়ে অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছেন।

মানদাদের গাড়ি দেখে কুঠির সামনে পাহারারত দু'জন সঙ্গীনধারী সেপাই ছুটে এল। বাঈজী গলা বাড়াতেই তারা উদ্যত সঙ্গীন নামিয়ে নেয়।

মানদারা রাতখানা কুঠিতে কাটাতে চায় শুনে তারা জানায়, কুঠিতে একটি মাত্র ঘর। সাহেব ও তাঁর তহশিলদার সেই ঘরে খিল এঁটে ঘুমোচ্ছেন। এমন কি বারান্দায়ও জায়গা নেই। তাদের দলের বাকি চারজন সেপাই সেখানে শুয়ে আছে।

—এ কুঠি পথচারীদের আশ্রয়। তোমাদের সাহেবের বাগানবাড়ি নয়। বাঈজী গর্জে ওঠে।

সেপাইরা ইতস্তত করতে থাকে। সুযোগ বুঝে বাঈজী ও মানদা গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। সেপাইদের পাশ কাটিয়ে তারা সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করে।

বারান্দায় সেপাইরা বন্দুক হাতে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু মেয়েছেলে, বিশেষ করে বাঈজীকে দেখে কি করবে ভাবতে থাকে।

ঘরের ভেতরে শব্দ হয়। দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন ছ'ফুট লম্বা এক ফিরিঙ্গি। তাঁর হাতে বন্দুক। পেছনে একজন রোগা কালো ও বেঁটে লোক। ওদের দেখে ফিরিঙ্গি যেমন নিশ্চিন্ত হন, তেমনি আবার বিস্মিত না হয়েও পারেন না। বন্দুক নামিয়ে পাশে সরে দাঁড়ান। এই ফাঁকে বাঈজীর দেখাদেখি মানদাও ঘরে ঢুকে ফিরিঙ্গির বিছানার ওপর বসে পড়ে।

বিস্মিত ফিরিঙ্গি তহশিলদারকে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। ওদের সামনে এসে দাঁড়ান। তহশিলদার জিজ্ঞেস করে,—তোমরা কে?

—আমরা পথিক। পাটনা থেকে আসছি। গোলাপগঞ্জে যাব। বাঈজী উত্তর দেয়।

—কিন্তু আমরা সরকারী লোক, সদরে চলেছি। এখানে তো তোমাদের থাকা চলবে না।

—চলবে না মানে? মানদা ধমকে ওঠে,—এই কুঠি মহারাজা তৈরি করেছেন, আর আমরা থাকতে পারব না?

তহশিলদার বেগতিক বুঝে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফিরিঙ্গির সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলে। তারপর মানদাকে জানায়,—সাহেব তোমাদের থাকতে দিতে রাজী আছেন। তবে—তহশিলদার ঢোক গেলে—তবে সাহেবকে বাঈজীদেবীর একখানা গান শোনাতে হবে।

—গান কেন, নাচও দেখাতে পারি। কিন্তু তোমার সাহেব আমাকে বকশিশ দেবেন তো? বাঈজী নিজেই জবাব দেয়।

তহশিলদারের কাছ থেকে কথাটা শুনেই ফিরিঙ্গি উত্তেজিতভাবে তাকে যেন কি সব বললেন।

তহশিলদার মানদাকে জিজ্ঞেস করে,—সাহেবকে কত টাকা দিতে হবে ?

—টাকা নয়।

—তবে ?

—সাহেবের হাতের ঐ আংটিটা। মানদা একবার থামে,—তোমার সাহেবকে আমার বাঈজীর বড় ভালো লেগেছে—প্রাণে ধরেছে। টাকা তিনি জীবনে অনেক রোজগার করেছেন, কিন্তু কোন খাঁটি সাহেবকে কোনদিন গান শোনাতে কিংবা নাচ দেখাতে পারেন নি। তাই এই চাঁদনী রাতকে চিরদিন মনে রাখার জন্য তিনি একটা স্মৃতিচিহ্ন রেখে দিতে চান।

আনন্দে তহশিলদারের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সব শুনে ফিরিঙ্গির লাল-মুখখানা আরও লাল হয়ে যায়। বিহ্বল হয়ে তিনি হাতের আংটিটা ছুঁড়ে দেন। বাঈজী সেটি লুফে নেয়।

মানদা গাড়ি থেকে মদের বোতল নিয়ে আসে। সে নিজেই পরিবেশন করে।

বাঈজী নাচগান শুরু করতেই ফিরিঙ্গি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। তাঁর চোখের নীল মণিদুটো তখন কামনার আগুনে লাল হয়ে উঠেছে।

মদ ও সোডার বোতলের স্তূপ জমে যায়। এক ফাঁকে মানদা বাইরে গিয়ে সেপাইদেরও কয়েকটা বোতল দিয়ে আসে। বারান্দায় বসে তারা সেগুলো খালি করে, নেশার ঘোরে ভেতরে ঢুকে পড়ে। ফিরিঙ্গির সামনেই নেচে নেচে বাঈজীর নাচের সঙ্গে তাল দিতে থাকে। প্রভু ভৃত্যের পার্থক্য আর থাকে না। বন্দুকগুলো তখন বাইরে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

ভেতরে যখন হুল্লোড় চরমে উঠেছে, বাইরে তখন ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল মানদা। মুখোশধারী চোদ্দ-পনেরো জন লোক উন্মুক্ত তরোয়াল আর সেপাইদের ফেলে রাখা বন্দুকগুলো নিয়ে ভেতরে ঢোকে। পানোন্মত্ত ফিরিঙ্গি তার নিজের বন্দুকটার দিকে হাত বাড়াতে চান। একটা গুলির শব্দ হয়। চিৎকার করে লুটিয়ে পড়েন তিনি। কাঁপতে কাঁপতে তহশিলদার বলে—প্রাণে মেরো না। এই চাবি নাও। সিন্দুকেই সব আছে।

ডাকাতরা সকলের হাত ও মুখ বেঁধে ফেলে। সিন্দুক থেকে টাকা পয়সা বের করা হয়। পাছে তহশিলদার কিছু সন্দেহ করে, তাই মানদারাও নিজেদের গয়না খুলে মুখোশধারীদের হাতে দেয়। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে দু'জন মুখোশ-ধারী টানতে টানতে ওদের বাইরে নিয়ে আসে। চিৎকার করে ভয় পাবার ভান করে ওরা। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অভিনয় শেষ হয়ে গেছে।

"সেকি এতো ডাকাতি !" অতনু অবাক হয়ে মানদাকে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। সত্যনারায়ণ এমন অনেক ডাকাতি করেছেন। কিন্তু প্রায় সব-সময়েই দেখা গেছে তাতে ইংরেজের ক্ষতি আর গোলাপগঞ্জের লাভ হয়েছে।"

"লাভ !" মানদার কথা শুনে হাসি পায় অতনুর। রাজভাণ্ডার বোঝাই হবার সঙ্গে যে রাজ্যের সত্যিকারের লাভ-লোকসানের কোন সম্পর্ক নেই, তা সে এ ক'দিনেই টের পেয়েছে। সত্যনারায়ণের সঞ্চিত অর্থ তার বংশধরদের বিলাসিতার ইন্ধন যোগাচ্ছে।

তবু সে কথা না তুলে অতনু জিজ্ঞেস করে, "এজন্য বাঈজীকে কত দিতে হল ?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মানদা উত্তর দেয়, "এক কড়িও নয়। বরং বাঈজীকে জরিমানা দিতে হয়েছে।"

"জরিমানা ? সে কি ?" কোন পুরস্কার পায় নি সে ?

"পেয়েছে।"

"কী ?"

"মৃত্যুদণ্ড।" মানদা একবার থামে, তারপর বলে, "পরদিন সকালে রহমতপুর কুঠি থেকে ক্রোশখানেক দূরে কালীতলায় বাঈজীর মৃতদেহ পাওয়া যায়।"

॥ পাঁচ ॥

আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজাবাহাদুর। প্রধান সহিস মহম্মদ তার সহকারীদের নির্দেশ দিচ্ছিল। ঘোড়াদের দলাই-মলাই চলেছে। রাজাবাহাদুর মাঝে মাঝে নিজেই এ কাজটি তদারক করেন। তাঁর মতে মানুষের বেলায় অনিয়ম হতে পারে, কিন্তু পশুদের বেলায় নয়। একদিন সময়মতো না খেলে বা স্নান না করলে, মানুষের যতখানি শরীর খারাপ হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি হয় পশুদের। তাই প্রত্যেক ঘোড়ার নামে চার্ট ঝোলানো আছে আস্তাবলের দেয়ালে। লেখা আছে—কখন খাওয়াতে হবে, স্নান করাতে হবে, বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। চার্ট অনুযায়ী পরিচর্যা না করার জন্য মহম্মদকে বহুবার চাবুক খেতে হয়েছে।

অতনু এসে রাজাবাহাদুরকে নমস্কার করে। রাজাবাহাদুর জিজ্ঞেস করেন, "তুমি ঘোড়ায় চড়তে পার ?"

"আজ্ঞে, না।" অতনু ভয়ে ভয়ে জবাব দেয়।

"তাজ্জব ব্যাপার। ফুটবল খেলতে পার আর ঘোড়ায় চড়তে পার না ?"

অতনু চুপ করে থাকে।

রাজাবাহাদুর মহম্মদকে আদেশ করেন, "বাবুকে সাতদিনে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দিবি।"

মহম্মদ সেলাম করে।

অতনুর দিকে ফিরে রাজাবাহাদুর বলেন, "তোমার পক্ষে সাত দিনই যথেষ্ট। তারপর পরীক্ষা নেব।"

চাকরির দায়ে অতনুকে অশ্বারোহণ শিক্ষা শুরু করতে হয়। মহম্মদ বেছে একটা শান্ত ঘোড়া দিয়েছিল, তাই যা রক্ষে। সাতদিনে মোটামুটি আয়ত্তও হল খানিকটা। রাজাবাহাদুর অতনুকে এ সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। অতনুর আশা হয়েছিল হয়তো বা তিনি ভুলে গেছেন কথাটা। কিন্তু অষ্টম দিন সকালেই রাজাবাহাদুর তাকে তলব করলেন।

সন্ত্রস্ত অতনু শঙ্কিতবক্ষে রাজাবাহাদুরের কক্ষে এসে হাজির হয়। খবরের কাগজখানা পাশে রেখে রাজাবাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন, "ঘোড়ায় চড়ে সদরে যেতে পারবে?"

অতনুর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রাজাবাহাদুর বিরক্ত হন। বলেন, "বাঁ পায়ে অমন জোরালো শট করতে পার আর সা··ত দিনে ঘোড়ায় চড়া শিখতে পারলে·"

রাজাবাহাদুরকে শেষ করতে না দিয়ে, মরিয়া হয়ে অতনু বলে উঠল, "পারব।"

"এই তো চাই। বেশ, তাহলে বেরিয়ে পড়।"

ধীরে ধীরেই চলেছে অতনু। একটু আগে দেউড়ি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে। একখানি পর্দা ঢাকা পালকি চলেছে রাজবাড়িতে। অতনুর ঘোড়ার মন্থর পদধ্বনিতে কৌতূহলী হয়েই আরোহিণী বোধ করি পালকির পর্দা ফাঁক করে। বকুলবাঈ!

ফুলগঞ্জে আসার পর থেকে, গত আটমাসে, বকুলবাঈয়ের সঙ্গে অতনুর বারকয়েক দেখা হয়েছে। কিন্তু কোনবারেই ভাল করে কথা বলার সুযোগ পায়নি। আজ তাই সে তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। বেয়ারারাও পালকি নামায়। অতনু বকুলবাঈয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়!

স্নিগ্ধ হেসে বাঈজী জিজ্ঞেস করে, "কোথায় চললেন, এই ভর দুপুরে?"

"সদরে। ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দিচ্ছি।"

"পাশ করা চাই কিন্তু।"

"চেষ্টা করব।" অতনু সভয়ে উত্তর দেয়।

"ফেরার পথে আমার গরীবখানায় চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো। এসে অবধি একবারও তো পায়ের-ধুলো দিলেন না!"

"তোমার ওখানে, মানে গোলাপগঞ্জে?"

"হ্যাঁ, রাজপুরুষদের আনন্দ-ভবনে। পুব-দেউড়ী দিয়ে ভেতরে ঢুকে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেই আমার ঘর দেখিয়ে দেবে।"

"কিন্তু তুমি যে কলকাতায় বসে বলেছিলে, আমি যেন সেখানে না যাই?"

"ও! তাই বুঝি এতদিন যাওয়া হয়নি ?"

"হ্যাঁ।" অতনু উত্তর দেয়।

বকুলবাঈ বলে, "কিন্তু আমি তো দিনে যেতে নিষেধ করিনি! বলেছিলাম, কখনও সেখানকার সান্ধ্য-মজলিশে যোগ দেবেন না।"

"আমি সত্যি দুঃখিত জাবেদা, কথাটা ঠিক বুঝতে পারি নি।"

"পারলে, যেতেন ?"

"নিশ্চয়ই।"

"আজ যাচ্ছেন তাহলে ?"

"হ্যাঁ।"

সদর থেকে ফেরার পথে অতনু যখন গোলাপগঞ্জ প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন দিবাকর পশ্চিমাচলের পথে যাত্রা শুরু করেছে।

অতনু প্রাচীন প্রাসাদের দিকে তাকায়। সিপাহী-বিদ্রোহের ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজপ্রাসাদ। এখন নিথর নিস্পন্দ ও প্রাণহীন। শুধু অতীতের অসংখ্য স্মৃতি বুকে নিয়ে অথর্বের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বর্তমানের ক্লান্তি ও গ্লানি, অবসাদ আর অপবাদকে নিঃশব্দে সয়ে চলেছে।

এই সেই প্রাসাদ—অতনু ভাবে—যুগে যুগে যার ঘরে ঘরে ঝরেছে কত অশ্রু, পড়েছে কত রক্ত!

গোলাপগঞ্জ ফুলগঞ্জ থেকে সদরের পথে মাইল দু'য়েক। ফুলগঞ্জের মতো এখানেও এককালে প্রাসাদের পাশ দিয়ে করতোয়া বয়ে যেত। কিছুকাল আগে নদী তার গতিপথ পালটেছে। সে সরে গেছে অনেকটা দূরে। তার প্রাচীন পলিময় বুকে এখন বনস্পতির বৈঠক বসেছে।

রাজাবাহাদুরের বাবার আমলে ফুলগঞ্জে নতুন প্রাসাদ তৈরি হল। করতোয়ার অনাদর ও রাজপরিবারের অবহেলায় গোলাপগঞ্জ প্রায় জনহীন হয়ে পড়েছে। আর তাই বোধহয় গোলাপগঞ্জ প্রাসাদ এখন ফুলগঞ্জের আনন্দভবন। নির্জনতা উদ্দাম-আনন্দের সহায়ক।

আনন্দ-ভবনের সারাগায়ে কিন্তু নিরানন্দ মূর্ত হয়ে উঠেছে। চারিদিকে ঘন জঙ্গলের ভেতর প্রাসাদটি দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তার বাইরের দিকে বহু জায়গায় আস্তর খসে পড়েছে। শ্যাওলা আগাছা জন্মেছে।

"কি দেখছেন অমন করে? নামুন ঘোড়া থেকে!"

অতনুর চমক ভাঙে। দেখে তার অলক্ষ্যে কখন যেন বকুলবাঈ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। সে বোধহয় অতনুর পথ চেয়ে দোতলায় দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখতে পেয়েই নেমে এসেছে সদর দরজায়। অন্যমনস্ক ছিল বলে অতনু তার আগমন টের পায় নি।

সে তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। বকুলবাঈয়ের নির্দেশ মতো ঘোড়ার লাগামটা দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ানের হাতে দেয়। তারপর প্রাচীন প্রাসাদে প্রবেশ করে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বারান্দা। পাঁচটি স্তম্ভযুক্ত খোলা বারান্দা। বারান্দার দু'পাশে দু'খানি করে পাশাপাশি ঘর। বাড়ির এই অংশটি দোতলা। তবে ওপরে সবটা জুড়েই বড় বড় ঘর! আটখানি শয়ন-কক্ষ—এখন বাঈজীদের বাসগৃহ।

বারান্দা ও সিঁড়িতে রঙীন টালি। কিন্তু মাঝে মাঝে দু-একখানি ভেঙে গেছে। ফলে গর্ত হয়ে গেছে। হোঁচট খাবার সম্ভাবনা।

আজ বোধহয় কোন বিশেষ আসর বসছে। তাই নরম কাশ্মীরী গালিচা বিছানো হচ্ছে সিঁড়ি ও বারান্দায়। ফুলগঞ্জের দৈন্যদশাকে চাপা দেবার বৃথা চেষ্টা চলেছে।

বারান্দার পরেই প্রকাণ্ড হলঘর—মহারাজা সত্যনারায়ণের দরবার-কক্ষ। দোতলার সমান উঁচু ছাদ। ছাদের ঠিক কেন্দ্রস্থলটি গম্বুজাকৃতি। তার চারপাশে রঙিন কাচের স্কাইলাইট। সূর্যালোক নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সেই গম্বুজ থেকেই প্রকাণ্ড একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। সেকালে মোমবাতি থাকতো এর থোপে থোপে, একালে ইলেকট্রিক বাল্‌ব বসানো হয়েছে। ঘরের চার কোণেও রয়েছে চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ঝাড়লণ্ঠন। তারা স্কাইলাইটের রামধনু রঙে রঞ্জিত হয়ে হাওয়ায় দুলছে—টুং টাং শব্দ হচ্ছে, যেন জলতরঙ্গ বাজছে।

হলঘরের দেয়ালে কয়েকখানি রঙিন তৈলচিত্র। কেবল পূর্বপুরুষদের ছবি নয়। সেই সঙ্গে য়ুরোপ থেকে আমদানী করা কয়েকখানি নিরাভরণা নারীচিত্রও রয়েছে। হয়তো এগুলির শিল্পমূল্য অসাধারণ। অতনু শিল্পী নয়। তার মনে হয়—আর্টের নামে বিকৃত রুচির প্রচার।

হলঘরের শেষ প্রান্তে একটি বেদী। রাজা সত্যনারায়ণের সিংহাসন থাকত ওখানে। এখন প্রধান বাঈজী মালতীবাঈয়ের আসন।

হলঘরের মেঝেতেও গালিচা পাতা হয়েছে। তাকিয়া আলবোলা ও ফুলদানী দিয়ে দুগ্ধফেননিভ ফরাস সাজানো হচ্ছে। ফরাসের এককোণে তানপুরা, দিলরুবা, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ, বাঁয়া-তবলা ও হারমোনিয়াম।

বেদীর দুই প্রান্ত থেকে দু সারি সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। সেকালে ওপরতলায় ছিল রাজবাড়ির অন্দরমহল, একালে বাঈজীমহল।

বকুলবাঈয়ের সঙ্গে অতনু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসে। ওপরের ধাপে এসে একবার থমকে দাঁড়ায়। এখান থেকেই মানদা জর্জ ব্যারনের মৃত-দেহ দেখেছিল। সেদিনের দরবারকক্ষ আজ নাচের আসরে রূপান্তরিত।

বকুলবাঈ ঘরে ঢুকে অতনুকে খাটের ওপরে বসতে বলে। তারপর ডাক

দেয়, "শীলা।"

একজন প্রৌঢ়া ঘরে ঢোকে। অতনুকে দেখিয়ে বকুলবাঈ বলে, "জুতো খুলে দাও, রাজবাহাদুর পাঠিয়েছেন। নয়া বাবু।"

ফুলগঞ্জের স্থায়ী বাঈজী বকুলবাঈ। রাজাবাহাদুরের নির্বাচিত লোক ছাড়া অন্য কাউকে ঘরে বসাবার অধিকার নেই তার। পাছে শীলার মনে আবার কোন সন্দেহ দেখা দেয়, তাই বোধহয় সে এই মিথ্যেটুকুর আশ্রয় নিল।

শীলা জুতো খুলবার জন্য অতনুর পায়ের কাছে বসে পড়ে। অতনু বাধা দিতে চায়। কিন্তু বকুলবাঈয়ের চোখের আদেশে হাত সরিয়ে নেয়।

তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে ঘরখানিকে ভাল করে দেখছিল অতনু। এক কাপ চা এনে বকুলবাঈ তার সামনে রাখে। পাশে বসে জিজ্ঞেস করে, "ঘোড়ায় চড়ে শ্রান্ত হয়েছেন তো?"

"চাকরি নিয়েছি। মালিকের আদেশ মানতেই হবে। শ্রান্ত হলে চলবে কেন?" চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, "রোজই রাতে আসর বসে এখানে?"

বাঈজী মাথা নাড়ে।

"আচ্ছা, তোমাদের ক্লান্তি আসে না?"

"বাবুজী! আমারও যে একই উত্তর। ক্লান্ত হলে নোকরী থাকবে না যে!"

একথালা খাবার এনে অতনুর সামনে রেখে শীলা আবার বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

"জুড়িয়ে যাবার আগে খেয়ে নিন। আপনার ভুখ লেগেছে।"

"যারা তোমার ঘরে আসে, তাদের সবারই জুতো খুলে দিতে হয়?"

"জী।"

"এমনি চা ও জল-খাবার খাওয়াতে হয়?"

"না।" একটু থেমে বকুলবাঈ বলে, "আমি তো মুসলমান। আমার দেয়া খানা খেলে ওদের জাত যাবে যে! তবে শরাবে দোষ নেই। তাই পেয়ালায় শরাব ভরে দিতে হয়।"

অতনুর খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বকুলবাঈ ধমক লাগায়, "হাত গুটিয়ে নিলেন কেন? খেয়ে নিন তাড়াতাড়ি। একখানা লুচি পড়ে থাকলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

অবাক বিস্ময়ে অতনু ভাবে—জনপদবধূ না গৃহস্থবধূ?

বাইরে রোদ পড়ে এসেছে। বেলা যায়। চারদিকের গাছপালার ছায়া পুরনো রাজপ্রাসাদকে আঁধারে ডুবিয়ে দিতে চাইছে। অন্যান্য বাঈজীদের ঘরে সাজ-সাজ রব। ক্ষীণকন্ঠে বকুল বলে, "বাবুজী, এখন তো আপনাকে উঠতে হয়। দিন শেষ হয়ে এল, এবারে যে আমার নোকরি শুরু হবে। আজ বিশেষ আসর বসছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসছেন। তাঁকে খুশি না করতে পারলে জমিদারী লাটে উঠবে।"

"লাটে ? মানে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এ ?"

"জী ! কিন্তু সে কথা এখন থাক্। আজ আপনি আসুন।"

রওনা হবার সময় অতনু ভাবতে পারে নি যে এত দেরী হবে। গায়ে গরম জামা না থাকায় হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় একটু শীত-শীত করছে। জোরে ঘোড়া ছোটালে শরীরটা গরম হতো ! কিন্তু তার মন চাইছিল না যে পথটুকু তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাক্। বকুলবাঈয়ের কথা ভাবতে ভাল লাগছিল তার। রাজবাড়ির আবহাওয়ায় সে যে তাকে হারিয়ে ফেলে।

বাঁক ফিরতেই শব্দটার কারণ বুঝতে পারে অতনু। আট দশজন লোক ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে আসছেন। আবছা চন্দ্রালোকেও দূর থেকেই অতনু রাজাবাহাদুরকে চিনতে পারে। পাশের ইংরেজ ভদ্রলোক বোধহয় জেলাশাসক। পেছনে পারিষদবর্গ। ম্যানেজার বীরেশ্বরবাবুও দলে আছেন।

সে কাছে আসতেই রাজাবাহাদুর ঘোড়া থামালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "এত দেরী করলে কেন ? সারা বিকেল কোথায় ছিলে ? আমি তো একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলাম।"

কি জবাব দেবে, অতনু ভেবে উঠতে পারে না।

বীরেশ্বরবাবু ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি রাজাবাহাদুরকে বলেন, "অতনুও আমাদের সঙ্গে চলুক না।"

"আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যাবে কি ? ওর তো তোমাদের মতো ওসব চলে না।"

"চলে না বলেই যে চলবে না, তার কি মানে আছে ? আর না চলে, না চলবে। গান শুনতে তো কারও আপত্তি হওয়া উচিত নয়।" একবার থামেন বীরেশ্বর। তারপরে অতনুকে বলেন, "চলো, জীবনে যা কোনদিন শোন নি, আজ শুনবে। যা কোনদিন দেখনি, তাই দেখে আসবে। চলো।"

বকুলবাঈয়ের মুখখানি অতনুর মানসচোখে ভেসে ওঠে। তাকে নবরূপে দেখবার ও নবসুরে শোনার লোভ সামলাতে পারে না। সে লাগামে টান দেয়।

॥ ছয় ॥

শত শিখায় জ্বলে উঠেছে ঝাড়লণ্ঠন। নানা রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে সেকালের দরবারকক্ষ। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে একালের খেমটার আসর।

ফরাসের ঠিক মাঝখানে, মখমলের ওপরে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে নিয়ে আসন গ্রহণ করলেন রাজাবাহাদুর। পারিষদরাও সুবিধে মতো জায়গায় বসে পড়লেন। বীরেশ্বরবাবু হাত ধরে অতনুকে পাশে বসালেন।

মোটা জরির আচকান পরে বেয়ারারা আতর ও মিঠে পান পরিবেশন করছে। কয়েকটি রুপোর আলবোলায় খাম্বাখানা তামাক পুড়ছে। তামাক, জর্দা ও আতরের সুগন্ধে আমোদিত আসর।

চারজন পরিচারিকা গ্লাস ও বোতল বয়ে আনে। দু'জন বেয়ারা মদ ও সোডার বোতল খুলতে শুরু করে। আতরের সুবাসটি ধীরে ধীরে যায় হারিয়ে।

ওপর থেকে ঘুঙুরের শব্দ ভেসে আসে। বাবুরা নড়ে-চড়ে বসেন। কৌতূহলী জেলা-শাসক বিমুগ্ধ বিস্ময়ে ওপর দিকে তাকিয়ে থাকেন। চারিদিকে একটা চাপা গুঞ্জন। কেবল রাজাবাহাদুর বাক্যহীন। শুধু নির্বাক নন, নির্বিকারও বটে।

মালতীবাঈয়ের পেছনে বাঈজীরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। তারা সারি বেঁধে আসরে দাঁড়ায়। আনত হয়ে অভ্যাগতদের কুর্নিশ করে।

বাবুরা আবার নড়ে-চড়ে বসেন। কেউ হাতের সযত্ন স্পর্শে কেশবিন্যাস পরীক্ষা করে নেন। কেউ বুকে আঁটা রক্ত গোলাপটির দিকে কিংবা বুক পকেটে রাখা রঙিন রেশমী রুমালখানির দিকে আড়চোখে নজর বুলিয়ে নিলেন।

আর অতনু? অতনু অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে বকুলবাঈয়ের দিকে।

বকুলবাঈও অতনুকে দেখতে পায়। সে বিস্মিত হয়। কিন্তু একবার চমকে উঠেই স্থির হয়ে যায়। সামলে নেয় নিজেকে। তাহলেও ব্যাপারটা বোধহয় একজনের নজর এড়ায় না। তিনি ফুলগঞ্জের রাজাবাহাদুর—এই অনুষ্ঠানের প্রযোজক।

বাঈজীরা বাবুদের সামনে হাঁটুভেঙে বসে। মালতীবাঈ জুতো খুলে দেয়। অতনু আপত্তি করে না। এটাই এ আসরের রীতি।

রাজাবাহাদুর ও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জুতো খুলে দিয়ে বকুলবাঈ গিয়ে তার নির্দিষ্ট আসনে বসে। সারেঙ্গী ও তবলায় সুর বাঁধা শুরু হয়।

অন্যান্য বাঈজীরা বাবুদের গ্লাসে মদ ঢেলে দেয়। একজন বাঈজী অতনুকে গ্লাস হাতে নিতে অনুরোধ করে। সে আপত্তি জানায়।

বকুলবাঈ দূর থেকে তাকিয়ে আছে অতনুর দিকে। দু'জনে একবার চোখাচোখি হয়। বকুলবাঈ একটু হেসে মাথা নত করে।

একজন শুধু এই না-বলা কথার নীরব সাক্ষী হয়ে থাকেন। রাজাবাহাদুরের মুখেও একটু মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তিনি যে অতনুর মতই খালি হাতে বসে আছেন। যিনি এই উন্মাদনার রসদ যুগিয়ে যাচ্ছেন, তিনি নিজে উন্মাদ নন। আশ্চর্য বিলাসিতা!

মালতীবাঈয়ের গানের তালে তালে বাঈজীরা নাচতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে তারা নাচ থামিয়ে বাবুদের শূন্য গ্লাস পূর্ণ করে দিচ্ছে।

বাবুরা ধীরে ধীরে বে-সামাল হয়ে পড়ছেন। তাঁরা মালতীবাঈকে বাহবা দিচ্ছেন। কেউবা হাত বাড়িয়ে নৃত্যরতা বাঈজীদের ধরতে চাইছেন। বাঈজীরা

ধরা দিচ্ছে না। তবু ওরই মধ্যে যে বাবু কোন বাঈজীকে একটু স্পর্শ করতে পারছেন, তাঁর আনন্দ একেবারে উথলে উঠছে। তিনি সেই পরশধন্য হাত-খানিকে বারবার গালে বোলাচ্ছেন, সশব্দে চুম্বন করছেন।

এই অস্থিরতার মাঝে স্থির হয়ে বসে আছেন রাজাবাহাদুর—পঙ্ক-মাঝে পঙ্কজের মতো।

অতনুর দিকে নজর পড়তেই বীরেশ্বরবাবু বিরক্ত বোধ করেন। জড়িয়ে আসা স্বরে বলে উঠেন, "তুমি তো বাবা বড্ড বেরসিক! আমরা কখন পরলোকে পৌঁছে গেছি, আর তুমি এখনও দিব্যি ইহলোকে বসে আছো? রাজাবাহাদুর হবার মতলব? এই বাঈজী ইধর আও", একবার হেঁচকী তুললেন তিনি। তারপরে আবার বললেন, "এই বাঈজী, জলদি আও। বাবুকো শরাব পিলাও।" আবার হেঁচকী।

একজন বাঈজী এগিয়ে আসতে চায়। বকুলবাঈ নাচের ভঙ্গিতে বাধা দেয় তাকে। তারপরে নিজেই নাচতে-নাচতে এগিয়ে আসে অতনুর সামনে। সে হাঁটু ভেঙে বসে। গ্লাসে মদ ঢালে।

উগ্র গন্ধে অতনুর বমি আসতে চায়। সে দম বন্ধ করে থাকে।

বকুলবাঈ গ্লাসটা এগিয়ে ধরে অতনুর দিকে।

বীরেশ্বর হেঁকে ওঠেন, "নাও বলছি, নইলে ভাল হবে না কিন্তু!"

কি করবে বুঝতে পারে না অতনু।

এবারে বকুলবাঈ কথা বলে, "লিজীয়ে বাবুজী! শরাব, মেহমানকা অমৃত।"

অগত্যা অতনু হাত বাড়ায়। কিন্তু সে গ্লাসটি স্পর্শ করতে পারার আগেই বকুলবাঈ সেটি হাত থেকে ছেড়ে দেয়। সমস্ত মদটুকু ফরাসের ওপর ঢেলে পড়ে।

"মাফ কিজিয়ে বাবুজী! আমার জন্যই গ্লাসটা পড়ে গেল।" ম্লান মুখে উঠে দাঁড়ায় বকুলবাঈ। সে নতমস্তকে নিষ্ক্রান্ত হয় সেখান থেকে।

"ওয়ার্থলেস। আমি জানি এই মেয়েটা ওয়ার্থলেস। দিলে তো তোমার এমন সুন্দর রাতটা মাটি করে! এর ওষুধ কি জানো?"

"কি?" মনের আনন্দ গোপন করে অতনু প্রশ্ন করে।

"চাবুক।" বীরেশ্বর উত্তর দেন, "শঙ্কর-মাছের লেজের চাবুক দিয়ে এদের চাবকাতে হয়। কিন্তু রাজাবাহাদুরকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। তিনি কিছুতেই তা করতে দেবেন না……"

আরও অনেক কথা বলে যান বীরেশ্বর। কিন্তু একবারও অতনুকে মদ খেতে বলেন না। কারণ এ আসরে প্রথম গ্লাস হাত ফসকে পড়ে গেলে যে সেদিন তার-আর মদ স্পর্শ করতে নেই, একথাটা তিনি নেশার ঘোরেও ভুলে যাননি।

অতনুর হঠাৎ নজর পড়ে রাজাবাহাদুরের দিকে। তিনি তেমনি নিঃশব্দে

হাসছেন। তাহলে কি বকুলবাঈয়ের চাতুরিটুকু ধরা পড়েছে রাজাবাহাদুরের কাছে ?

মালতীবাঈ গান থামিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে আসে। তাঁর গা ঘেঁষে বসে। নিজের একখানি হাত সাহেবের কাঁধে রাখে। সাহেব মজা পেয়ে মালতীর আরেকটু ঘনিষ্ঠ হন। মালতী তাঁর হাত থেকে মদের গ্লাসটা নিজের হাতে নেয়। তারপরে সেটি সাহেবের মুখের সামনে এগিয়ে ধরে। মালতী তাঁকে অবিরাম মদ জুগিয়ে যেতে থাকে।

সারেঙ্গী আর তবলায় জোর লহরা চলেছে। তারই সঙ্গে তাল রেখে বাঈজীরা নেচে চলেছে। তাদের ঘুঙুরের শব্দ মৃতপ্রায় প্রাসাদপুরীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে চলেছে। এ চেষ্টা সফল হবে কি ?

সাহেবের মাথাটা ঢলে পড়ল মালতীবাঈয়ের কোমল কাঁধে। এবারে গ্লাসটা রেখে দেয় মালতী। তারপরে সে বুকের ভেতর থেকে একখানি কাগজ বের করে সাহেবের সামনে মেলে ধরে। বার বার কি যেন বলে সাহেবকে।

সাহেব মাথা তোলেন। মালতী তাঁর হাতে একটা কলম দেয়। সাহেব সেই কাগজখানির ওপরে কিছু লিখে দিলেন। মালতী আবার তাঁর মাথাটিকে নিজের কাঁধের ওপর টেনে নেয়।

বাঈজীদের হাতে হাতে কাগজখানি গিয়ে পেঁছিল রাজাবাহাদুরের হাতে। অতনু বুঝতে পারে ঐ কাগজখানি ফুলগঞ্জের রক্ষা-কবজ। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইন্‌সপেক্‌শনে এসেছেন। তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হল, তিনি রাজাবাহা-দুরের রাজত্ব দেখে খুশি হয়েছেন। কিন্তু···অতনু ভাবে —মদ ও মেয়েমানুষ দিয়ে আর কতদিন এ জমিদারীকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে ?

কাগজখানি পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালেন রাজাবাহাদুর। অতনুকে জিজ্ঞেস করলেন, "যাবে নাকি ? আমি ফুলগঞ্জে ফিরে যাচ্ছি।"

অতনু কিছু বলতে পারার আগেই বীরেশ্বরবাবু তার একখানি হাত চেপে ধরেন। করুণ কণ্ঠে রাজাবাহাদুরকে অনুরোধ করেন, "ওকে দয়া করে রেখে যান। বেচারা মদ খেতে পারলে না, এর পরেরটুকু যদি না পায় ···"

অতনু কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। সে শুধু অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রাজাবাহাদুরের দিকে।

রাজাবাহাদুর বেরিয়ে যান দরবার-কক্ষ থেকে।

সেই মদের গ্লাস ফেলে দেবার পর থেকে বকুলবাঈ দূরে দূরে থাকছিল। রাজাবাহাদুর বেরিয়ে যেতেই হঠাৎ সে এগিয়ে আসে অতনুর কাছে। কিন্তু কোন কথা বলে না। নীরবে নাচতে থাকে।

বীরেশ্বরবাবু বল্লেন, "আমরা তো এমনি চোখে অন্ধকার দেখছি। আলো নিভলে কিছুই দেখতে পাব না। তুমি কিন্তু বাবা, বাছাই করে নিও।"

কথাটা বুঝতে পারার আগেই অকস্মাৎ একসঙ্গে সব আলো নিভে যায়।

নারী ও পুরুষের মিলিত কণ্ঠের চেঁচামেচি আরম্ভ হয়। সেই সঙ্গে হুটো-পুটির শব্দ।

বিমূঢ় অতনু উঠে দাঁড়ায়। কেউ তার একখানি হাত ধরে! কোমল স্পর্শ।

অতনু বাক্যহীন, অতনু বিভ্রান্ত।

আগন্তুক অতনুকে আকর্ষণ করে। অতনু এগিয়ে যায় তার কাছে। সে কানে কানে বলে, "আর রোশনী জ্বলবে না। কোন কথা না বলে আমার সঙ্গে চলুন।"

বকুলবাঈয়ের হাত ধরে অতনু অন্ধকারে এগিয়ে চলে। কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? কিছুই জানে না সে।

কতকগুলো মাংসপিণ্ড ডিঙিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠে আসে ওপরে। একটা ঘরে এসে ঢোকে। অতনু বুঝতে পারে সে আবার বকুলবাঈয়ের ঘরে এসেছে।

এবারে অতনুর হাত ছেড়ে দেয় বাঈজী। অন্ধকারেই সে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। তারপরে আলো জ্বালায়!

অতনু খাটে উঠে বসে। বকুলবাঈ এগিয়ে আসে তার কাছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "তুমি কেন এসময় এখানে এলে?"

চোখ তুলে তাকায় অতনু। জাবেদার চোখে জল। সে হাত ধরে তাকে পাশে বসায়। তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে চায়। জাবেদা ভেঙে পড়ে। অতনুর কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "কেন এলে তুমি ওদের সঙ্গে? কিসের বিনিময়ে আমি বেঁচে আছি, তা তো তোমার অজানা নয়। তবু কেন দেখতে এলে নিজের চোখে? তুমি আমাকে ছোট ভাবলে আমি যে ব্যথা পাই, তা কি তুমি এখনও বোঝ নি?"

নিচে সমানে হুল্লোড় চলছে। জাবেদা শুধু অতনুকে নিয়ে এসেছে ওপরে। এখানে হুল্লোড় নেই। এখানে কেবল লখনউয়ের এক হতভাগিনী নিজের দুর্ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিচ্ছে।

বকুলবাঈয়ের মাথায় হাত রাখে অতনু। দরদী স্বরে বলে, "শান্ত হও। তোমাকে চিনতে আমার যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু আজ শোধ হয়ে গেল।"

নীরব কিছুক্ষণ। নীরব অতনু, নীরব জাবেদা। সে কেবল তার কোমল হাত দু'খানি দিয়ে অতনুকে জড়িয়ে ধরে পরম প্রত্যাশায়। যেন নিমজ্জমান মানুষ অতলে তলিয়ে যাবার প্রাক্কালে কোন অপ্রত্যাশিত আশ্রয় পেয়েছে খুঁজে। তার অশ্রুধারায় অতনুর শরীর যাচ্ছে ভিজে।

জাবেদার উত্তপ্ত আঁখিজল অতনুর মনে আগুন জ্বালায়। যৌবনের সাড়া জাগে তার সারা অঙ্গে। জাবেদা এত কাছে, তবু তাকে সে পেতে চায় আরও কাছে। ফুলগঞ্জের বাঈজীকে নয়, তার প্রাণের প্রিয়তমাকে। স্নিগ্ধ আলোর আভায় উভয়ে উভয়কে দেখে। এ দেখা অ-দেখা ছিল। এ দেখার শেষ নেই।

কিন্তু এ দেখার নেশা আছে। এতক্ষণে অতনু মাতাল হয়। মাতাল মানুষ ব্যাকুল হয়···

তারপর?

না। সহসা জাবেদার বাহুডোর শিথিল হয়ে যায়। সে ছেড়ে দেয় অতনুকে। ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। সরে আসে দূরে। চোখ মোছে। বেশবাস ঠিক করে নিয়ে ঠিক হয়ে দাঁড়ায় জাবেদা। তারপর বলে, "জীবনে আমি কখনও দান গ্রহণ করি নি। দেহের বিনিময়ে জীবন ধারণ করছি। দেহই আমার একমাত্র সম্বল। কিন্তু সেই দেহ নিয়ে গত আট বছর মাংস-লোলুপদের কাড়াকাড়ি চলেছে। তা তোমার কোন কাজে আসবে না। তোমাকে দেবার মতো কিছুই নেই আমার। তবু জীবনে একমাত্র তোমাকেই পেলাম, যার কাছে হাত পাতা যায়। জবাব দাও, তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে না।"

"বেশ। বল কি তুমি চাও?"

"আমি যদি অসময়ে মুছে যাই এ দুনিয়া থেকে, তবে আমার মেয়েকে তোমায় মানুষ করতে হবে।"

"এ ভয় কেন?"

"তুমি জানো না, আমাদের জীবনের মেয়াদ যে কোন সময়েই খতম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে সব কথা আজ থাক্। আজ শুধু বল, তুমি আমার জবান রাখবে।"

"বেশ। যদি সত্যিই সে রকম কিছু হয়, তাহলে তোমার মেয়েকে আমি নিজের মেয়ে বলেই মনে করব জাবেদা!"

॥ সাত ॥

ছাদে পায়চারি করছিল অতনু। রাজবাড়ির ছাদ। আয়তনে বিরাট। শুধু বিরাট নয়, বিস্ময়কর। সে আমলে রাজপরিবারের মেয়েরা পর্দানসীন ছিলেন। ছাদে বসেই তাঁরা গায়ে যা একটু আলো বাতাস লাগাতেন।

ছাদের ঠিক মাঝখানে দেয়ালহীন একখানি গম্বুজাকৃতি ঘর। কালো পাথরে তৈরি চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত শ্বেত গম্বুজটি। মেঝেতে নক্শা করা টালি। ছাদের চারিদিকে লাল পাথরের রেলিং!

বেলা পড়ে এল। কাঁঠাল গাছটার ওপর থেকে রোদের শেষ ফালিটুকু পালিয়ে যেতে চাইছে। খানিকবাদেই কাঁঠালের কালো পাতাগুলো কালো আঁধারে যাবে মিশে।

প্রবের সিঁড়িতে পদধ্বনি হয়। উঠে দাঁড়ায় অতনু।

রুপোর পানের বাটা আর কাশ্মীরী গালিচার আসন হাতে ওপরে আসে কালীতারা, রাণীমার পার্শ্বচরী। পেছনে রাণীমা। উত্তরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় অতনু। কিন্তু থামতে হয় কালীতারার কথায়, "রাণীমা আপনাকে ডাকছেন বলবাবু!"

নতমস্তকে রাণীমার সামনে এসে দাঁড়ায় অতনু।

"এক বছর হয়েছে এখানে এসেছ। কিন্তু একদিনও তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে না?"

অতনু মুখ তোলে। কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারে না।

প্রতিমার মতো টানা টানা চোখদুটি মেলে রাণীমা চেয়ে আছেন তার দিকে। কালো কোঁকড়ানো প্রায় হাঁটুস্পর্শ করা একমাথা চুল। রাজবাহাদুরের চেয়ে কালো হলেও রং বেশ ফর্সা। বাঙালী মেয়েদের তুলনায় একটু বেশী লম্বা। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সৌম্যকান্তি ও সুষমাময়ী। এ রূপে জ্বালা নেই, অথচ স্মরণীয়। শ্রদ্ধেয় অথচ রমণীয়—দর্শনীয় ও পূজনীয়।

অতনু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাণীমা আবার বলেন, "বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমি কিন্তু তুমি বলেই ডাকব।"

"নিশ্চয়ই।" অতনু তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়।

রাণীমা বলেন, "ভেবেছিলে রাণীমা না জানি কেমন মানুষ! তাই কোনদিন আমার কাছে আসো নি আর আজও আমাকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছিলে?"

অতনু প্রতিবাদ করতে চায়।

রাণীমা বাধা দেন, "যাকগে, সেজন্যে আমি মনে কিছু করি নি। এ বাড়ির কোন কিছুর ওপরই আমার অধিকার নেই।" হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি।

অতনু তাঁর দিকে তাকায়। বুঝতে পারে অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলা কথাগুলো নিয়ে তিনি আর নাড়াচাড়া করবেন না।

অতনু চুপ করে থাকে।

একটু বাদে রাণীমা আবার কথা বলেন। অতনুর বাড়ির কথা, মায়ের কথা ও পড়াশুনার কথা জানতে চান। জিজ্ঞেস করেন, "তোমার খাওয়া-দাওয়ার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?"

"না না। অসুবিধে হবে কেন?"

"পরীক্ষার বছর। দুধ মাখন সব ঠিক মতো পাচ্ছ তো?"

অতনু নীরব থাকে।

রাণীমা হেসে ফেলেন, "মিথ্যে কথা এখনও ঠিক মুখে আসতে চায় না। রাজবাড়ির জলহাওয়া গায়ে বসে নি আর কি।" একবার থামেন তিনি। তারপরে ডাক দেন, "কালীতারা!"

"মা !"

"ঠাকুর-চাকরদের বলে দিস্ যেন ওর খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু নজর দেয়। আর তুই রোজ এক সের করে দুধ, আধপোয়া করে মাখন ও কিছু ফল আমার ওখান থেকে নিয়ে ওকে দিয়ে আসবি।"

"এতো পাঠাবেন না। আমি খেতে পারব না।" অতনু আপত্তি জানায়।

রাণীমা ধমক লাগান, "খেতে পারবে না মানে? বয়সের ছেলে। বলতে লজ্জা করে না? দুধ, মাখন না খেলে মাথা হবে কেমন করে? এ বাড়ির সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক নেই। পরীক্ষা দিয়ে কেউ পাশ করে না। তোমাকে এই নিয়ম ভাঙতে হবে।"

অতনু কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারে না। পনেরো-ষোল বছরের একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে রাণীমার সামনে দাঁড়ায়। বলে, "মা, ম্যানেজার জ্যাঠা মল্লিকাপুর যাচ্ছেন। বাবা বলছে, সঙ্গে যেতে হবে।"

রাণীমা গম্ভীর হয়ে যান। অকস্মাৎ একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে তাঁর সারা মুখে।

মল্লিকাপুর কতদূর অতনু জানে না। তবে শুনেছে খুব দূরে নয়। সেখানকার জমিদার অসিতপ্রসাদ নাকি কয়েক বছর বিলেতে ছিলেন। বিলেতের তুলনায় এ দেশটাকে তিনি নরকের চেয়েও খারাপ মনে করেন। দোষারোপ করেন অদৃষ্টকে, তাঁকে নরকবাস করতে হচ্ছে বলে। বিলেতের উৎসবগুলো তিনি পালন করেন যথাশক্তি দিয়ে। গত বছর বড়দিনের সময় রাজাবাহাদুরকে নিয়ে গিয়েছিলেন মল্লিকাপুর। এ বছর কালীপুজোয় তাই রাজাবাহাদুর তাঁকে পাল্টা নেমন্তন্ন করতে বীরেশ্বরবাবুকে পাঠাচ্ছেন। নিজে যেতে না পারার জন্যে দুঃখ করে চিঠি দিয়েছেন। বীরেশ্বর বোধহয় রাজাবাহাদুরকে বুঝিয়েছেন, রাজকুমারীকে সঙ্গে নিলে ভাল হয়। সায় দিয়েছেন মোসাহেবরা। রাজাবাহাদুর অনুমতি দিয়েছেন।

অতনু শুনেছে বীরেশ্বরবাবুর আসল উদ্দেশ্যটা অন্যরকম। রাজকুমারী বরুণার সঙ্গে অসিতপ্রসাদের একমাত্র ছেলে অমরের তিনি বিয়ে দিতে চান। তাই তিনি মেয়ে দেখানোটাও সেরে নিতে চান এই সুযোগে। পাত্র হিসেবে অমরপ্রসাদ নাকি রত্ন।

মেয়েকে চট করে কিছু বলতে পারেন না রাণীমা। বরুণা নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ বাদে কথা বলেন রাণীমা। মনে হয় যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে তাঁর কণ্ঠস্বর। তিনি বলছেন, "আমি আর কি বলব? ম্যানেজারজ্যাঠার কথা যে শুনতেই হবে মা! সাবধানে যেও। হিসেব করে কথা বল। তুমি এখন বড় হয়েছ।"

মাকে প্রণাম করে বরুণা চলে যায়।

রাণীমা শব্দহীন। কি যেন ভেবে চলেছেন তিনি। সহসা নিজের অলক্ষ্যেই

তাঁর বুক চিরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

অস্বস্তিকর পরিবেশ। অতনুর ভাল লাগছে না। তাই সে নিচে যাবার অনুমতি চায়।

"যাবে বই কি। একটু বসো।" আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন রাণীমা। বলেন, "আমি চাই না যে আমার মেয়ে কোন জমিদার ঘরে বৌ হয়ে যায়, আমারই মতো তিলে তিলে দগ্ধ হয়।"

রসিদ শেখের হুঁশিয়ারী শোনা গেল। হাতীশালের ফটক খুলছে। রাজকুমারী তার ভাবী শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে।

"ম্যানেজার না ছাই, আসলে ওটা একটা সাক্ষাৎ শয়তান।" কালীতারার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। খাবার দিতে এসে কথায় কথায় সে অতনুকে বলে চলেছে, "রাজাবাহাদুর ওর হাতের পুতুল। তাঁকে ঐ শয়তানটা এমনভাবে আটকে ফেলেছে যে, ওর কথা না শুনলেই জমিদারী লাটে উঠিয়ে ছাড়বে। আর যেমন মা তেমনি ছেলে হবে তো।" জোরে একটা নিঃশ্বাস নেয় কালীতারা। আঁচলে বেঁধে রাখা পানটাকে মুখে পুরে দিয়ে একটু পরে আবার শুরু করে, "ওর চাবিকাঠি কোথায় জানেন? সেই উইল।"

"কোন্ উইল?" অতনু অবাক হয়।

"বাঃ! রাজাবাহাদুরের বাবা যে উইল করে গেছেন।" কালীতারা অতনুর অজ্ঞতায় বিস্মিত।

পুরো ইতিহাস অতনু শুনেছে কিছুদিন পরে। তখন সে নিয়মিতভাবে সেরেস্তায় বসছে। পরীক্ষা হয়ে গেছে। হাতে অঢেল সময়। সারাদিন বসে থাকতে ভাল লাগত না। রাজাবাহাদুরের কাছে একদিন কথাটা পাড়তেই তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন।

সেরেস্তায় ঢুকে প্রথম দিনেই নায়েব গোপালবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। নাদুস-নুদুস গোলগাল চেহারা। রংটাও বেশ কালো। রেগে গেলেই ভুঁড়ি দুলতে থাকে। রাজাবাহাদুরের বাবা বজ্রনারায়ণের আমলের আমলা। অথচ রাজাবাহাদুরের সামনে হাতজোড় করে গোবেচারার মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। বীরেশ্বরবাবুর কাছে আরও সুবোধ বলে নিজেকে প্রমাণিত করেন। কিন্তু তাঁরা চলে গেলেই, দাপটে অধস্তন কর্মচারীরা অস্থির হয়, আর রাজাবাহাদুরের চতুর্দশ পুরুষ স্বর্গে থেকে বিব্রত বোধ করতে থাকেন।

তবু গোপালবাবুকে অতনুর ভাল লাগে। রাজাবাহাদুরকে তিনি কোনদিন খারাপ বলেন না। বরং প্রশংসাই করেন মাঝে মাঝে। এমনি একদিন রাজাবাহাদুরের গুণগান করতে গিয়ে তিনি কানে কানে কাহিনীটি বলে ফেললেন অতনুকে।

রাজাবাহাদুর মদ ছোন না। বাঈজীদের ওপর তাঁর কোন লোভ নেই। একবারের বেশি বিয়েও করলেন না। মদ আর বাঈজীর পেছনে তিনি খরচ করছেন শুধু ঠাট বজায় রাখতে। কিন্তু তাঁর বাবা বজ্রনারায়ণ ছিলেন ঠিক তার উল্টো। মদ আর মেয়েমানুষ না হলে তাঁর একটা রাতও চলত না। বাঈজীতে যখন তাঁর অরুচি আসত, তখন তিনি দলবল নিয়ে জমিদারী পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়তেন।

তেমনি একবার হাতেমপুর মহল পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। মেয়েরা স্নান করছে নদীর ঘাটে। তাদেরই একজন তাঁর প্রাণে জ্বালা ধরিয়ে দিল। মহারাজার আদেশে দেওয়ানজী মেয়েটিকে অনুসরণ করলেন। গিয়ে হাজির হলেন তার পিতার পর্ণকুটিরে।

দরিদ্র পিতা শশব্যস্ত হয়ে উঠল। দেওয়ানজী প্রস্তাব করতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে সে! শেষ রক্ষা করার আশায় বলল—"আজ আমার কি সৌভাগ্য। মহারাজা আমার মেয়ের সেবা চেয়ে পাঠিয়েছেন। কাছারীতে সেবিকার অভাব। তবে বাসন্তী আমার যা আহ্লাদী মেয়ে, কাজকর্ম কিছুই শেখে নি। তাই বলে আমি মহারাজার কোন অসুবিধে হতে দেব না। আপনি আসুন। কাল সকালে আমি নিজেই কাজ করতে কাছারীতে যাব।"

মনের ভাব গোপন রেখে, হাসিমুখে বিদায় নিলেন দেওয়ানজী।

কিন্তু রাতদুপুরে সেই পর্ণকুটিরে আগুন লাগল। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই কে যেন বাসন্তীর মুখ চেপে ধরল। আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না সে।

স্বল্পালোকিত বন্ধ ঘরে বজ্রনারায়ণ নিজ হাতে তার বন্ধন খুলে দিলেন। সুরাপানে জড়িয়ে আসা স্বরে জানালেন—চিৎকার করে কোন লাভ নেই।

বিনা প্রতিবাদে বাসন্তী আত্মসমর্পণ করল। নিঃশব্দে সাতদিন অহোরাত্র সর্বপ্রকার নির্যাতন সহ্য করল। তারপরে মহারাজার জ্বালা কমল—নেশা টুটে গেল।

এই সব হতভাগিনীদের গুম করে ফেলাই ছিল নিয়ম। বাসন্তী কিন্তু সে সুযোগ দিল না। অষ্টম দিন ভোররাত্রে সুবিধা বুঝে সে পালিয়ে গেল। বহু খোঁজাখুঁজি হল। না পেয়ে বিরক্ত মনে বজ্রনারায়ণ ফিরে এলেন ফুলগঞ্জে।

দিন কাটে, মাস যায়, বছর অতিবাহিত হয়। এমনি করে পঁচিশটা বছর গড়িয়ে গেল। বজ্রনারায়ণ তখন প্রৌঢ়। রক্তের জোর স্তিমিত। সারাজীবন ভোগবিলাসের ফলে জরাজীর্ণ শরীর, ভীতিপ্রবণ মন।

রাজাবাহাদুর তখনও কিশোর। বজ্রনারায়ণ দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছেন। আরও অন্ততঃ বছর দশেক তাঁকে বেঁচে থাকতে হবে। নইলে বারো ভূতে লুটে খাবে সব। বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, অথচ শরীর ভেঙে পড়েছে।

একদিন বিকেলে দোতলার বারান্দায় বসে গড়গড়া টানছেন তিনি। দু'জন

দাসী তাঁর পা টিপে দিচ্ছে। এমন সময় মাথায় ঘোমটা দেওয়া একজন মহিলা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। কোন প্রজার স্ত্রী বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে মনে করে, তিনি দাসীদের ভেতর যেতে আদেশ করলেন। হঠাৎ মহিলাটি তার ঘোমটা সরিয়ে ফেলল। মহারাজার চোখের ওপর চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, "চিনতে পারেন ?"

"না।"

"চেহারা ভুলে যেতে পারেন! কিন্তু বাসন্তী নামটাও কি ভুলে গেছেন ? যাকে রাত দুপুরে হাতেমপুর কাছারীতে নিয়ে আসার জন্য তার বাবাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলেন ?"

"কে ? বাসন্তী ! শয়তানী, তোকে আমি গুম করে ফেলব !"

"ভয় দেখাচ্ছেন ? কিন্তু মহারাজ, ভয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে সেদিন রাতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাকে গুম করলে বীরেশ্বরকে কি কৈফিয়ত দেবেন ?"

"কে বীরেশ্বর ?"

"আপনার ছেলে।"

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতে চান মহারাজা। কিন্তু পরমুহূর্তে যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠেন। কাত হয়ে পড়ে যান চেয়ারের ওপর। খেয়াল ছিল না যে পক্ষাঘাতে তাঁর শরীরের বাঁদিকটা অসাড় হয়ে গেছে।

বাসন্তী এগিয়ে এসে মহারাজাকে ঠিক করে বসিয়ে দেয়। দাসীরা ছুটে আসে। বাসন্তী তাদের ইশারায় চলে যেতে বলে। মহারাজা নির্বাক।

অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বাসন্তী বলে, "আমি প্রতিশোধ নিতে আসি নি মহারাজ। আমার নিজের কোনও দাবি নেই। আমি এসেছি বীরেশ্বরের জন্য। তাকে রাজা করার বাসনা নিয়ে নয়। তাকে আপনার ছেলে বলে ঘোষণা করারও কোন প্রয়োজন নেই। সে শুধু আপনার আশ্রিত হয়ে থাকতে চায়। তাকে আশ্রয় দিলেই আমি যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।" বাসন্তী আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

অগণিত নারী-দেহ নিয়ে যিনি একদিন ছিনিমিনি খেলেছেন, খেয়াল চরিতার্থ করতে যিনি আপন-পর নির্বিশেষে মানুষকে হত্যা করেছেন, একজন অনাথিনীর কয়েক ফোঁটা চোখের জল তাঁকে যেন বড় বেশি দুর্বল করে ফেলল। অপলক নয়নে বজ্রনারায়ণ কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। দিন শেষ হয়ে এসেছে। পাখীরা কুলায় ফিরে চলেছে। ঘনায়মান আঁধারের বুক চিরে সন্ধ্যাতারাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"পঁচিশ বছর পরে ভগবানই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন বাসন্তী ! আমি বড় রাণীকে মেরে ফেলেছি। ছোটরাণীকেও রাখতে পারলাম না ধরে। কুমারকে আমার হাতে তুলে দিয়ে সেও ছুটি নিল। বীরেশ্বর জমিদারী পাবে

না। তবে আমার অবর্তমানে সেই হবে নাবালক কুমারের অভিভাবক ও এস্টেটের ম্যানেজার। উইলে আমি এই কথাই লিখে যাবো।”

॥ আট ॥

সারারাত লোকটাকে উঠতে দেওয়া হয় নি। আশ্বিনের শেষ। খালি গায়ে গলা-জলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। কি অমানুষিক শাস্তি!

কিন্তু তার অভিজ্ঞ সহকর্মীরা হাসছেন। তাঁরাই তাকে কারণটা বলেন। অথচ অতনু অনেক ভেবেও লোকটির অপরাধ উপলব্ধি করতে পারে নি।

প্রতিবারের মতো এবারেও বীরেশ্বরবাবু গিয়েছিলেন রূপানগরের মেলায়—দুর্গাপুজোর মোষ কিনতে। এ জেলায় চিরকাল ফুলগঞ্জে সবচেয়ে বড় মোষ বলি দেওয়া হয়। এবারে কিন্তু পদ্মবাগানের সাহারা টাকার জোরে সবচেয়ে বড় মোষটা কিনে ফেলেছেন। দরাদরিতে হেরে গিয়ে মোষের মালিককে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলেন বীরেশ্বর। লোকটা নাকি তাঁকে অপমান করেছে—অর্থাৎ ভয় না পেয়ে মোষটা বিক্রি করেছে পদ্মবাগানের সাহাদের কাছে। প্রতিশোধ নিয়েছেন বীরেশ্বর। কৌশলে লোকটাকে পাকড়াও করেছেন। হাতমুখ বেঁধে পালকিতে পুরে গতকাল সন্ধ্যায় ফুলগঞ্জে নিয়ে এসেছেন।

তারপর তাকে রাণীদীঘির জলে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। বরকন্দাজরা পাহারা দিয়েছে। লোকটা পাড়ে ওঠার চেষ্টা করলেই তারা লাঠি চালিয়েছে।

একটু আগে তাকে প্রায়-সংজ্ঞাহীন অবস্থায় জল থেকে টেনে তোলা হয়েছে! ভিজে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে তাকে শান্তিপুরী ধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবি পরানো হয়েছে। কিছুক্ষণ রোদে রাখার পরে যেই তার কাঁপুনি কমেছে, অমনি ধরাধরি করে রাজাবাহাদুরের সামনে নিয়ে এসেছে।

রাজাবাহাদুরকে দেখেই লোকটি আবার কাঁপতে শুরু করল। কিছুক্ষণ ধরে রাজাবাহাদুর তাকে দেখলেন। তারপরে ক্রুদ্ধকণ্ঠে পারিষদদের প্রশ্ন করলেন, “জুতো দাও নি কেন?”

পারিষদরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

রাজাবাহাদুর দু'বার শূন্যে লাথি মারলেন। বাঘের চামড়ার চটিজোড়া তাঁর পা থেকে খুলে লোকটির গায়ে গিয়ে লাগল। ভয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল। তার কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল।

এবারে রাজাবাহাদুর নিজের গায়ের কাশ্মীরী শালখানা তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, “একে চা আর জিলিপি খাওয়াও। তাতেও কাঁপুনি না থামলে ব্র্যাণ্ডি দাও। কাল সকালে দশ টাকা হাতে দিয়ে লোকটিকে বাড়ি

পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে ?”

অতনু আর সেখানে দাঁড়ায় না। এই বিচিত্র শাস্তির কথা ভাবতে ভাবতে সেরেস্তার দিকে পা বাড়ায়। সেরেস্তায় তখন বাবুরা এসে গেছেন। গোপালবাবু তার জায়গায় বসে সামনের হাতবাক্সটির ওপর কনুই রেখে গুনগুন করে রামপ্রসাদী ভাঁজছিলেন,

'আমায় দাও মা তবিলদারী
আমি নিমকহারাম নয় শঙ্করী।'···

অতনুকে দেখে গান থামালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, “কি ভায়া ?··· লোকটা বাঁচবে ?”

অতনু চুপ করে থাকে। গোপালবাবু আবার বলেন, “এতেই ভড়কে গেলে ? আরও কত দেখবে। দিনকাল অবশ্যি পালটে গেছে। আগের মহারাজার আমলে যেমনটি দেখেছি, তেমনটি আর দেখতে হবে না। মসলাও ফুরিয়ে এসেছে কি না।” একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলেন, “আরে ভাই যে মোষ মোষ করে এতো হুলুস্থুল কাণ্ড, সেই মোষবলির ইতিহাস শুনবে ?”

“বলুন।” অতনু গোপালবাবুর পাশে এসে বসে।

“একবার দুর্গোপুজোর সময় একটা প্রকাণ্ড মোষ আনা হলো। নবমী পুজোর দিন চারপায়ে দড়ি বেঁধে চড়ক ঘুরিয়ে শ'খানেক লোকে টানা-হ্যাঁচড়া করে কোনরকমে তাকে হাড়িকাঠে ফেলা গেল। গলাটা তবু যা হোক করে চেপে-চুপে কাঠগড়ার মধ্যে ঢোকান হল। কিন্তু বলি তো আর দেয়া যায় না।”

“খুব দাপাদাপি শুরু করল বুঝি ?” অতনু প্রশ্ন করে।

গোপালবাবু উত্তর দেন, “আরে বাপু দাপাদাপি তো যতদূর করানো যায়, করিয়ে নেওয়া হয়েছে। কানে সর্ষে ঢুকিয়ে নাচানো হয়েছে, ঢাক পিটিয়ে-চটানো হয়েছে, লাল কাপড় দেখিয়ে খ্যাপানো হয়েছে। কাঠগড়ায় ফেলার পর আর দাপাদাপি করবে কি ? মোষের প্রাণবায়ুটুকু তখন প্রায় খাঁচাছাড়া। বলিটা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। যাক্‌গে, সেবারে ঐ মোষটাকে বলি দেওয়া যাচ্ছিল না তার শিংয়ের জন্য। মোষটার শিং দু'টো তার গর্দান ছাড়িয়ে এসেছে। রামদা চালানো যাচ্ছিল না। চড়ক ঘুরিয়ে গর্দানটাকে যতোটা সম্ভব লম্বা করা হলো। কিন্তু বলি দেওয়ার মতো জায়গা মিলল না। নিরুপায় হয়ে রাজাবাহাদুর গিয়ে মা দুর্গার সামনে ধর্না দিলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন অতবড় মোষ আর তিনি এ বাড়িতে আনবেন না। কিন্তু আজ তিনি সে কথা ভুলে গেছেন। সবচেয়ে বড় মোষটা না কিনতে পারার জন্য এই লোকটি এত শাস্তি পেল।”

“সেবার বুঝি আর বলি হলো না ?”

“তোমার আর বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না দেখছি। এ রকম প্রশ্ন আর মুখে আনবে না। বলি হবে না কেন ? বলি না হলে কুলগুরুর অকল্যাণ হবে যে। তাই

শশী শাঁখারীকে ডেকে আনা হলো। সে ঐ অবস্থাতেই মোষের শিংদুটো কেটে দিল। ব্যস, তার পরেই বলি।"

"রাজাবাহাদুরের বাবার আমলেও বুঝি এমন হতো?"

"তাঁর আমলে যা হতো, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। এ তো শুধু হুজুগ। আর তাঁর আমলে কি না হতো?"

"শুনেছি মহারাজা বজ্রনারায়ণের একবার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। শেষ ইচ্ছে হিসেবে তিনি নাকি চিটেগুড় খেতে চেয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ চিটেগুড় যোগাড় করতে পারেন নি। ফাঁসির সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। ফলে মহারাজার মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়ে যায়।"

হেসে ফেলেন গোপালবাবু, "ও রকম একটা গল্প চলে আসছে বটে। গল্পে আরও আছে—মহারাজা সদরের সব দোকানের চিটেগুড় সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ভেতরের কথা সবাই জানে না।"

অতনু তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। গোপালবাবু তাকিয়াটা টেনে নিয়ে বলতে থাকেন, "রাজা বজ্রনারায়ণ তখন যুবক। কলকাতা থেকে মিশনারী কলেজের দু'জন ইংরেজ ছাত্রী এক অধ্যাপকের সঙ্গে ফুলগঞ্জে বেড়াতে আসে। অধ্যাপকের চিঠি পেয়ে মহারাজা লালকুঠিতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেদিন হাতিতে চড়িয়ে তাদের সারা সকাল ঘোরানো হল। বিকেলে তারা এল রাজবাড়িতে, মহারাজের নেমন্তন্ন রাখতে। মেয়ে দু'টির মধ্যে ক্যাথারিন ছিল সত্যই সুন্দরী। তার শরবতের গ্লাসে ঘুমের আরক মিশিয়ে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ মহারাজার সঙ্গে গল্প করার পর অধ্যাপক বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু ক্যাথারিন তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বিনীত কণ্ঠে মহারাজা জানালেন—ওর নিশ্চয়ই শরীরটা ভাল নেই। তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাতটা না হয় থেকেই গেল রাজপ্রাসাদে। জায়গার তো আর অভাব নেই। কাল সকালে আমি ক্যাথারিনকে লালকুঠিতে পাঠিয়ে দেব।

"পরদিন সকালে ক্যাথারিনের হাতে লেখা চিঠি পেলেন অধ্যাপক—সে চলে গেছে মহাস্থানগড়। সেখান থেকে সোজা কলকাতায় ফিরবে। মহারাজার ব্যবহারে ও অভিজাত্যে বিমুগ্ধ অধ্যাপক ফিরে গেলেন কলকাতায়।

"কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না মহারাজা। যথারীতি সাতদিন ভোগ করার পরে ক্যাথারিনকে হত্যা করা হলো। গোল বাধলো মৃতদেহ পাচার করতে গিয়ে। হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন তিনি। ক্যাথারিনের পিতা ছদ্মবেশী পুলিস নিয়ে যে রাজবাড়ি ঘিরে রেখেছেন এ কথাটা টের পান নি মহারাজা।

"বিচার শুরু হলো। সকলেই ভেবেছিল, এবার আর মহারাজার নিস্তার নেই। কিন্তু ইংরেজ জজসাহেবের রায়দান শেষ হলে, বিস্মিত জনতার সামনে দিয়ে মহারাজা হাসিমুখে আদালতগৃহ পরিত্যাগ করলেন। প্রমাণের অভাবে আইনের চোখে তিনি নাকি নির্দোষ। ক্যাথারিনের শোকার্ত পিতার আপিলের আবেদন

পর্যন্ত না-মঞ্জুর হয়ে গেল।"

"কেন?" অতনু উর্ধ্বশ্বাসে প্রশ্ন করে।

"এ কেন-র উত্তরে শুধু জেনে নাও, সোনা দিয়ে সেকালেও বিচার কেনা যেতো।" চুরুটের আগুনটাকে ছাইদানীতে নিবিয়ে ফেলে গোপালবাবু বলতে থাকেন, "একটি নেকলেশ মহারাজাকে বাঁচিয়েছিল।"

"নেকলেশ?"

"হঁ্যা। চীফ সেক্রেটারী চার্লস ক্যারেলের স্ত্রীকে হ্যামিলটনের বাড়ি থেকে একছড়া নেকলেশ কিনে দেওয়া হয়েছিল।"

॥ নয় ॥

নির্জন দীঘির পাড়। স্নিগ্ধ ও ছায়াশীতল। অতনুর বড় ভাল লাগে জায়গাটা। শান্ত সুন্দর ও সমাহিত পরিবেশ। এখানে এলে মন আনন্দে ভরে ওঠে।

দীঘির দিকে তাকালে কিন্তু তার সেই দুঃখের কাহিনীটি মনে পড়ে যায়। সে এই জলের বুকে ফুলগঞ্জের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছায়া দেখতে পায়।

জলদানের মতো পুণ্য নাকি আর নেই এ সংসারে। রাজাবাহাদুরের বড়মা তাই এ দীঘি খনন করিয়েছিলেন। তিনি নেই, কিন্তু তাঁর নাম আছে বেঁচে —লোকে বলে রাণীদীঘি।

সে কাহিনী অতনু শুনেছে মানদার কাছে। দীঘি খননের পরে বড়মা নাকি এই পাথর বাঁধানো ঘাট বেয়েই প্রথম ঘড়া জল তুলে এনেছিলেন! দান করেছিলেন হোসেন ফকিরকে। দীঘির পূবপাড়ে ঐ ফণিমনসার ঝোপটার ধারে একখানি পাতার কুঁড়ে বেঁধে বাস করতেন ফকির সাহেব। সবাই বলতেন সিদ্ধ-পুরুষ। রাজবাড়ি থেকে দু'বেলা তাঁর সিধে যেত। বড়মা নিজেই এ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি খুবই ভক্তি করতেন ফকির সাহেবকে।

মানদা বলেছে—বড় বউ ছিলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। যেমন রূপ তেমনি প্রাণ। বড় ঘরের মেয়ে ছিলেন তিনি। মহারাজা সত্যনারায়ণ অনেক দেখে-শুনে ছেলের বউ ঘরে এনেছিলেন। তিনি বড় ভালবাসতেন তাকে। কিন্তু তার মৃত্যুর পরেই বজ্রনারায়ণ হয়ে উঠলেন চরম উচ্ছৃংখল। আর তাঁর সমস্তটুকু খেসারত দিতে হলো বড়বউকে। রাজরাণী হয়েও চোখের জল না ফেলে একটি দিন কাটাতে পারতেন না তিনি।

মানদা রাজাবাহাদুরের বড়মা সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলেছে অতনুকে। বলেছে যে শেষ পর্যন্ত বজ্রনারায়ণের লাম্পট্যের কাহিনী পৌঁছেছে বড়মার বাপের বাড়িতে। একমাত্র ছোট বোনের দুর্দশার কথা শুনে স্থির থাকতে পারেন নি

তাঁর দাদা। তিনি হাতিতে চড়ে ফুলগঞ্জে ছুটে এসেছেন—যাতে দরকার হলে বোনকে নিয়ে যেতে পারেন।

বজ্রনারায়ণকে তিনি অনেক বুঝিয়েছেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। বাধ্য হয়ে দাদা বোনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। বোন কিন্তু রাজী হন নি। একটু ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করেছেন—আমার নিজের সংসার ফেলে আমি কোথায় যাব দাদা?

দাদা বিস্মিত হয়েছেন।

বোন আবার বলেছেন—দাদা, শ্বশুরবাড়ির চেয়ে বড় আশ্রয় যে মেয়েদের আর নেই। স্বামীর ঘর ছেড়ে তোমরা আমাকে আর কোথাও যেতে বলো না—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।

একটি দিনের জন্যও বড়মা স্বামীর ঘর ছেড়ে কোথাও যান নি। সারাদিন রাজবাড়ির বিরাট সংসার সামলেছেন। আর সারা রাত ধরে স্বামীর প্রতীক্ষায় বসে থেকেছেন। সব রাতে সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়নি। শেষ রাতে স্বামী বাড়িতে ফিরেছেন বে-সামাল অবস্থায়। স্ত্রী তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছেন শয়নকক্ষে। ধুইয়ে-মুছিয়ে তাঁর জামা-কাপড় পালটে দিয়েছেন। একটু এধার-ওধার হলেই লাথি খেয়েছেন। দাস-দাসীরা মুচকি হেসেছে। কিন্তু বড়মা চোখের জল ফেলেন নি – পাছে তাঁর স্বামীর অকল্যাণ হয়।

বাকি রাতটুকুও দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি বড়মা। স্বামীর শিয়রে বসে রয়েছেন উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে—মা যেমন বসে থাকে অসুস্থ ও অবুঝ সন্তানের শিয়রে।

এইভাবে মাস কেটেছে, বছর অতিবাহিত হয়েছে, দুঃসহ দুঃখের পাহাড় জমে উঠেছে, কিন্তু বড়মা একটি দিনের জন্য ফুলগঞ্জ ছেড়ে যান নি। শ্বশুর-বাড়ির প্রতি একটা আশ্চর্য মমত্ববোধ ছিল তাঁর। আর তাই হয়তো রাধাগোবিন্দ তাঁর শেষ আশা অপূর্ণ রাখেন নি। এই ফুলগঞ্জেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

মানদা বলেছে—বড়মা নাকি খুবই ধর্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। সকালে ঠাকুর-পুজো না করে তিনি জলগ্রহণ করতেন না। তিনিই রাধাগোবিন্দ মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন। প্রতি পূর্ণিমায় মন্দিরে ভাগবত-পাঠ এবং পুজো-পার্বণের সময় দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থাও তিনিই করে গেছেন।

সে নিয়ম অবশ্য আজও প্রচলিত আছে। কারণ রাজাবাহাদুরের মা এবং বর্তমান রাণীমা ভাগবত-পাঠ ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা বন্ধ হতে দেন নি।

কিন্তু পাঠ ও সেবার কথা নয়, অতনু বড়মার কথাই ভেবে চলে। ভাবে সেই অভিশপ্ত সন্ধ্যার কথা—

সেদিন এমনি সময়ে, হ্যাঁ ঠিক এমনি গোধূলির অস্পষ্ট আলোয়, মহারাণী এসে দাঁড়ালেন হোসেন ফকিরের কুটিরে। হাদিসের পাতা ওলটাতে গিয়ে

ফকির সাহেব দেখতে পেলেন তাঁকে। বিস্মিত ফকির ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বলে উঠলেন, "আপনি! এসময়ে এখানে?"

"হ্যাঁ। বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি বাবা!" করুণ কণ্ঠে বড়মা বললেন।

"কি বিপদ মা?" ফকিরের স্বরে সহানুভূতির স্পর্শ।

বড়মার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। একটু সামলে নিয়ে তিনি সকাতর স্বরে বলেন, "আপনার কাছে আমি আজ একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি বাবা!"

"ভিক্ষে! আমার কাছে!" ফকির সাহেব বিভ্রান্ত।

"হ্যাঁ, বাবা! আপনি ছাড়া আমাকে আর কেউ এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।" একবার থামেন বড়মা, তারপরে বলেন, "আপনি আমাকে একটা মাদুলি দিন।"

"কেন তাবিজ নিতে চাইছেন মা!"

"যাতে আমার সন্তান হয়। সন্তান দিতে পারি নি বলে মহারাজা আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন।"

"নসীব মা! সবই খোদাতাল্লার মর্জি। তাঁর ইনসাফের ওপর ভরসা রাখুন।"

"না, না, না।" বড়মা এবার উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠেন। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "এ অবিচার আমি কিছুতেই সইতে পারব না। তবু এতদিন যা কিছু করতেন সবই অন্দরমহলের বাইরে। আমাকে নিজের চোখে কিছু দেখতে হতো না। এবারে যে আমার চোখের সামনেই সব কিছু শুরু হয়ে যাবে। আপনি আমাকে একটা তাবিজ দিন বাবা! আমি সন্তানসম্ভবা হলে মহারাজা হয়তো আর বিয়ে করবেন না।"

"কিন্তু আমি তো তাবিজ দিতে পারি না মা। আমার সে অলৌকিক শক্তি নেই, আমি খোদাতাল্লার একজন সংসার ত্যাগী সেবক মাত্র।"

সহসা বড়মা তাঁর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়েন। মহারাণীর উষ্ণ অশ্রুধারায় হোসেন ফকিরের চরণযুগল সিক্ত হয়ে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বড়মা বলতে থাকেন, "আপনি আমাকে দয়া করুন, আমাকে একটি সন্তান দিন ·· একটি সন্তান···"

কুটিরের ঝাঁপটা হঠাৎ ছিটকে বাইরে পড়ে যায়। মহারাণী মাথা তোলেন।

ঝড়ের বেগে কুটিরে প্রবেশ করেন মহারাজা বজ্রনারায়ণ। তাঁর সঙ্গে দুজন সশস্ত্র পাইক।

চুলের মুঠি ধরে মহারাজা বড়মাকে টেনে তোলেন। তাঁর অট্টহাসিতে ফকিরের জীর্ণ কুটির কেঁপে কেঁপে ওঠে।

হাসি থামিয়ে মহারাজা চিৎকার করতে থাকেন, "সন্তান! সন্তান কামনায়

তুই এই লোকটার কাছে এসেছিস না ?"

মহারাণী নীরব।

মহারাজা তাঁর চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে আবার বলেন, "আমি যাকে সন্তান দিতে পারিনি, তাকে সন্তান দেবে এই ঘাটের-মড়া ?" বজ্রনারায়ণ আবার হেসে ওঠেন।

ফকির সাহেব উঠে দাঁড়ান। নির্ভীক স্বরে বলেন, "আপনি ভুল বুঝেছেন মহারাজ !"

"কি বললি ?" বজ্রনারায়ণ গর্জে ওঠেন, "ভুল ? আমি ভুল করেছি ?"

"হ্যাঁ।" ফকির উত্তর করেন, "মহারাণী সতীলক্ষ্মী..."

"আর তুই বোধহয় সত্যবান ? নেমকহারাম কাহিকা। আমার খেয়ে আমারই ঘরে সিঁদ কাটছিস। নরকের কীট, আজ তোকে আমি নরকেই পাঠাবো।" মহারাজা পাইকদের ইশারা করেন।

ফকির আর কিছু বলতে পারার আগেই বল্লমের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তাঁর অর্ধ-চেতন দেহটা লুটিয়ে পড়ে। কুটিরের মাটি রক্তে লাল হয়ে যায়। একটা অস্পষ্ট গোঙানী জেগে ওঠে, "পানি, একটু পানি !"

রাণীদীঘিতে অথৈ জল। সে জলে কোন সাড়া জাগে না। হোসেন ফকিরের শেষ-তৃষ্ণা অপূর্ণ থেকে যায়। অথচ তিনিই প্রথম এই দীঘির জলে তৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন।

মহারাজা পাইকদের আদেশ করেন, "এবারে এই ঘরটায় আগুন দিয়ে দে। যাতে সবাই ভাবে, আগুন লেগে ফকিরটা পুড়ে মরেছে।"

মহারাজা পেছন ফেরেন। সবিস্ময়ে দেখেন মহারাণী নেই। বুঝতে পারেন, ফকিরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে মহারাণী পালিয়ে গেছেন।

যাবে কোথায় ? বজ্রনারায়ণ হেসে ওঠেন। তিনি ফিরে গেলেন প্রাসাদে।

কিন্তু সারারাত খুঁজেও মহারাণীকে পাওয়া গেল না। তাহলে কি সে বাপের বাড়িতে চলে গেল ? মহারাজা ভাবেন। কিন্তু সে তো বহুদূর ! এই রাতে একাকী সে পায়ে হেঁটে সেখানে যাবে কেমন করে ? কিন্তু তাকে যে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না !

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। অতনু শুনেছে রাজাবাহাদুরের বড়মাকে পাওয়া গিয়েছিল পরদিন সকালে। বজ্রনারায়ণ তখন রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এমন সময় তিনি খবর পেলেন এই দীঘির জলে একটি নারীদেহ ভাসছে।

রাণীদীঘি মহারাণীকে মুক্তিদান করেছে।

কোথা থেকে যেন এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া ছুটে আসে। চাঁপা গাছটি দুলে ওঠে। গুটিকয়েক ফুল ঝরে পড়ে। পদ্মপাতায় বন্দী জলবিন্দু রাণী-দীঘির অথৈ জলে মুক্তি পায়। অতীত মিলিয়ে যায়। অতনু ফিরে আসে বর্তমানে।

জবাগাছগুলি এখনও দুলছে। জবাবন তো নয়, যেন কুঞ্জবন। ওখানে বারোমাস রঙের বাহার। সৌরভ নেই, কিন্তু রূপের বাসর।

জায়গাটা এখনকার চেয়েও নির্জন। এখানে তবু মাঝে-মাঝে মানুষ ঘাটে আসে। কিন্তু ওখানে কেউ বড় একটা যায় না। ওখানে যে শুধুই রূপের পসরা।

অতনু কখনও যায়নি ওখানে। রূপের আগুনে পুড়ে মরার ভয় তার নেই! কিন্তু ওখান থেকে যে রাণীদিঘির অথৈ জল চোখে পড়ে না। জবাবন তাকে আড়াল করে রাখে।

আজ তার কি যেন খেয়াল হলো। সে ধীর পায়ে এগিয়ে চলল জবাবনের দিকে।

সহসা থামতে হল অতনুকে। বড় জবাগাছটির ওপাশে কারা যেন কথা কইছে—

"আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না। আজ এখানেই থাক্।" একটু চুপ করে মেয়েটি। তারপর আবার বলে, "আচ্ছা; আমার ছবি এঁকে তুমি কি করবে?"

"তুমি যখন কাছে থাকবে না, তখন তোমাকে দেখব।'

"তাতে লাভ?"

"তোমার ছবি আমার সৃষ্টির ধারক হবে। তোমার বিরহ আমার শিল্পকে মহীয়ান করে তুলবে।"

"এর বেশি কি তোমার আর কিছুই চাইবার নেই অরুদা?"

"না রুণা। আমাদের পূর্বপুরুষ প্রবৃত্তির বাইরে কিছু চিন্তা করতে পারতেন না। তাই তাঁরা মিলন মানে বুঝতেন সহবাস। আমরা প্রমাণ করবো মিলন মানে মনের সঙ্গে মনের সমন্বয়, আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগসাধন।"

"তোমার এ সব কথা আমি বুঝতে পারি না। বুঝতে চাইও না। আমি যাকে ভালোবাসি, তাকে আমি পেতে চাই কাছে।"

"ভালোবাসার জনকে কাছে পেলেও কিন্তু সবসময় মানুষের দুঃখ ঘোচে না রুণা! কারণ কি জানো?"

"কী?"

"ভোগে যে শান্তি নেই। শান্তি পেতে হলে ত্যাগ করতে হয়। তাই আমরা দু'জনে বহুদূরে থেকে আমাদের বাসর রচনা করব। আমার সৃষ্টি তোমার ও আমার মাঝে মিলনের সেতু তৈরি করবে।"

অসহিষ্ণু কন্ঠে বরুণা বলে ওঠে, "দুর্ভাগ্য আমার। রাজার ঘরে জন্মেছি। ভালোবাসা আমাদের পাপ। হাত-পা বেঁধে যার হাতে তুলে দেবে, তারই খেয়াল চরিতার্থ করতে হবে চিরজীবন ধরে। মল্লিকাপুরে গিয়ে ভাবী শ্বশুর বাড়ি দেখে এসেছি। নিঃশ্বাস রুধ হয়ে আসে ওদের জীবনযাত্রা দেখলে।"

বরুণা বোধহয় ডুকরে কেঁদে ওঠে।

একটু বাদে বরুণাই আবার কথা বলে, "না, না, না—আমি পারব না। তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই মল্লিকাপুরে যাব না। তুমি আমায় বাঁচাও। বাবাকে গিয়ে জোর গলায় বল, তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমাকে তোমার চাই।"

"তা হয় না বরুণা! তুমি রাজার মেয়ে। আমি এক নিঃসম্বল বিধবার সন্তান। তোমার বাবা আশ্রয় দিয়েছেন বলে আমরা আজও বেঁচে আছি। তাঁর ইচ্ছে ছিল আমি লেখাপড়া শিখি, মানুষ হই, মায়ের দুঃখ ঘোচাই। কিন্তু অপদার্থ আমি।" একবার থামে অরুণ। তারপরে আবার বলতে থাকে, "আমি লেখাপড়া না করে বাঁশি বাজাই, মূর্তি বানাই, ছবি আঁকি। তুমি যার কাছে যাচ্ছ তিনি বিলেত-ফেরত, বড়ঘরের ছেলে। তাঁর কুল ও মান দুই-ই আছে। চালচুলোহীন পটুয়ার গলায় মালা দিতে চাইলে তোমার বাবা শুনবেন কেন? যাক্‌গে, এ সব চিন্তা করাও ভুল। তার চেয়ে এসো, আমি বাঁশি বাজাই, তুমি শোন।"

অরুণ বোধহয় বাঁশি হাতে নেয় আর বরুণা তার হাতখানি ধরে ফেলে বলে, "হ্যাঁ, বাঁশি শুনে সবাই ছুটে এসে দেখুক রাজকন্যে রাঁধুনীর ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে। আচ্ছা তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি আর কবে হবে বলতে পার?" বরুণা সামলে নিয়েছে নিজেকে। সে স্বাভাবিক স্বরে কথা বলছে।

"ওঃ! আমি তাহলে ছাদে বসে বাঁশি বাজিয়ে আজ রাতে তোমাকে ঘুম পাড়াব। তুমি দক্ষিণের জানালাটা খুলে রেখো।"

নিঝুম রাত। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। নিস্তব্ধ রাজপুরী। দিনে যেমনি মুখর, রাতে তেমনি নীরব। রাজাবাহাদুর গোলাপগঞ্জে যাবার পরেই প্রাসাদ পড়ে ঘুমিয়ে।

ঘরে বসে বাবার কাছে চিঠি লিখছে অতনু। তিন বছর হল সে ফুলগঞ্জে এসেছে। ইতিমধ্যে ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেছে। দাদা একটা চাকরি নিয়েছেন। ছোট ভাই সামনের বার বি. এ. পরীক্ষা দেবে।

রাজবাড়িতেও পরিবর্তন হয়েছে। বীরেশ্বরবাবু মালী সখীচরণকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। রাজাবাহাদুর তখন মহলে ছিলেন। অতনু গিয়ে কথাটা বলেছিল রাণীমাকে। কিন্তু রাণীমা ম্যানেজারের আদেশ পালটাতে পারেন নি। কারণ রাজাবাহাদুর নাকি বীরেশ্বরবাবুকে খরচ কমাতে বলে গেছেন।

অসহায় অতনু নীরব রয়েছে। ভেবেছে এই তো সংসারের নিয়ম। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই তাকে বিদায় নিতে হয়। ফুলগঞ্জের ফুলের হাটে বৃদ্ধ সখী-চরণের আর কোন প্রয়োজন নেই।

রাণীমা অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত ভান্ডার থেকে সখীচরণকে কিছু টাকা দিয়ে

দিয়েছেন। তবে সে রাণীমার কাছে গচ্ছিত সেই সোনার নথ ও রূপোর মল-জোড়া কিছুতেই ফেরত নেয় নি। ছেলে-বউয়ের জন্য রেখে গিয়েছে।

কানাই আজও আসেনি। হয়তো সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না ফুলগঞ্জে।

মানদাও চলে গেছে। শুধু ফুলগঞ্জ নয়, সে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। সিপাহী বিদ্রোহের শেষ সাক্ষী হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো।

আরও অনেকে চলে গেছে দূরে। তবে দু'টি মানুষ অতনুর বড় কাছে এসেছে। একজন ফুলবাঈ আর একজন বামুনদির ছেলে অরুণ।

বাবার কাছে চিঠি লিখতে বসে অতনুর আজ বার বার অরুণের কথাই মনে পড়ছে। আশ্চর্য ছেলে। গায়ের রংটা কালোই বলা চলে। তাহলেও সে রূপবান। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি মুখশ্রী। চোখ দু'টি অত্যন্ত উজ্জ্বল। বহু চেষ্টা করেও তাকে কলেজে পাঠানো যায় নি, কিন্তু রাজাবাহাদুরের লাইব্রেরীর প্রায় সব বই তার পড়া হয়ে গেছে। অতনু মাঝে মাঝে তার প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে যায়।

বই পড়া, ছবি-আঁকা, গান-বাজনা ও খেলা-ধূলা কোনটাতেই অরুণের জুড়ি নেই ফুলগঞ্জে। অথচ এ বাড়িতে তার আপনজনের সংখ্যা খুবই সামান্য।

অকস্মাৎ অতনুর ভাবনা থেমে যায়। একটা বাঁশির সুর ভেসে আসছে। সকরুণ সুর—বিরহী যক্ষ যেন সুরের লিপি পাঠাচ্ছে রাজকন্যাকে। রাজপুরীর বাতায়ন বোধহয় বিরহিণীর প্রেমাশ্রুতে সিক্ত হয়ে উঠেছে। শ্বেতপাথর শুচিশুভ্র হলেও কঠিন প্রস্তর—অশ্রু তার বুকে কোন দাগ কাটতে পারে না।

॥ দশ ॥

কালীতারাকে দোরগোড়া থেকে বিদায় দিয়ে ভদ্রমহিলা অতনুর শয্যাপাশে এগিয়ে আসেন। তার কপালে একখানি হাত রেখে তিনি তাপ পরীক্ষা করেন। তারপরে বলেন, "কবে জ্বর হয়েছে?"

তিন বছর এক বাড়িতে বাস করেও অতনু তাঁর সঙ্গে বড় একটা কথা বলে নি, অথচ ফুলগঞ্জে আসার আগেই তাঁকে সে দেখেছে। কলকাতার হোটেলে ইনিই তাকে খাবার দিয়েছিলেন। রাজবাড়িতে তাঁর পরিচয়—রাজাবাহাদুরের নিজস্ব রাঁধুনি 'বামুনদি'। আর অতনুর কাছে তিনি অরুণের মা সুবাসিনী দেবী।

অতনু উত্তর দেয়, "হয়তো আগেই হয়েছে, তবে বুঝতে পেরেছি গতকাল বিকেলে—মাথায় বড্ড যন্ত্রণা।"

"আমি অরুকে দিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছি।" বামুনপিসী বলেন।

অতনু প্রতিবাদ করে, "ডাক্তারবাবুকে ডাকার আবার কি দরকার?"

"দরকার আছে বৈকি। এ বাড়ির নিয়ম হল অসুখ করলেই ডাক্তারবাবুকে 'কল্' দিতে হবে। তুমি ইতিমধ্যেই অনিয়ম করেছ। তাছাড়া রাজবাড়ির এই ক'টি লোকের চিকিৎসা করবার জন্য তিনি মাসে পাঁচশ' টাকা করে মাইনে পাচ্ছেন। এমনিতেই এ বাড়িতে অসুখ-বিসুখ কম। যাও মাঝে মধ্যে দু'একজন একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখনও যদি তাঁকে না ডাকা যায়, তাহলে তো ভদ্রলোক ডাক্তারী ভুলে যাবেন!"

এ বাড়িতে বামুনদি'র পরিচয় তিনি রাজাবাহাদুরের রাঁধুনি। কিন্তু অতনু জানে তাঁর বাবা ছিলেন টোলের পণ্ডিত আর স্বামী ছিলেন স্কুল-শিক্ষক। সুতরাং তাঁর সংযত আচরণ ও কথাবার্তায় অতনু বিস্মিত হয় না। সে শুধু বলে, "বেশ তাহলে ডাক্তারবাবু আসুন একবার। কিন্তু তাঁকে ডাকতে যাবে কে?"

"কেন অরু রয়েছে ঘরে, আমি তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।" একবার থামেন তিনি। তারপরে বলেন, "তুমি তাহলে একটু একা থাকো, আমি আসছি।"

অতনু ঘাড় নাড়ে, বামুনদি বেরিয়ে যান।

কিছুক্ষণ বাদে অরুণ ডাক্তার নিয়ে আসে। ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিয়ে চলে যান। যাবার সময় বলেন, "ভয়ের কিছু নেই, কমে যাবে। তবে কয়েকটা দিন ভুগতে হবে, এই যা।"

কালীতারা বোধহয় রাণীমাকে খবরটা দিয়েছে। নইলে রাণীমা হঠাৎ বরুণাকে নিয়ে তার ঘরে আসবেন কেন?

অরুণও বিস্মিত হয় রাণীমাকে দেখে। হয়তো বা খুশিও হয়—বরুণা এসেছে রাণীমার সঙ্গে।

অতনু কিন্তু লজ্জা পায়। তাকে কেন্দ্র করে এমন একটা সমাবেশ তার ভাল লাগে না। তাই সে রাণীমাকে বলে, "আপনারা কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন? সামান্য অসুখ, এমনিতেই কমে যাবে।"

"কি করে? ন্যাচারাল ট্রিটমেন্টে— জল আর হাওয়া খেয়ে!" মাঝখান থেকে বরুণা প্রশ্ন করে বসে।

অতনু কোন উত্তর দেয় না। সে মৃদু হাসে।

বরুণা আবার বলে, "চুপ-চাপ শুয়ে থাকুন। একদম কথার অবাধ্য হবেন না। জ্বর ভাল হয়ে যাবার পরেও সাতদিন খেলা বন্ধ।"

আবার একটু হাসতে হয় অতনুকে।

মা কিন্তু মেয়ের পক্ষই সমর্থন করেন। রাণীমা অতনুকে বলেন, "রুণা ঠিকই বলেছে বাবা! সময়টা ভাল নয়, একটু সাবধানে থেকো। আর জ্বর কমে যাওয়ার পরেও কয়েকদিন বিশ্রাম নেওয়া উচিত হবে।" একবার থামেন তিনি

তারপরে অরুণকে বলেন, "অরু! যা তো বাবা, ওষুধটা নিয়ে আয় চট করে।"

অরুণ বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বরুণা রাণীমাকে বলে, "মা, তুমি আর দেরি করো না, তোমার পুজোর সময় হয়ে গেছে। আমি এখানে বসছি। অরুদা ফিরে এলে একেবারে ওষুধ খাইয়ে আমি ওপরে যাবো।"

"তাই ভাল, আমি তাহলে আসছি বাবা! তোমার যা কিছু দরকার রুণাকে বলো।"

অতনু মাথা নাড়ে। রাণীমা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বরুণা একখানি টুল নিয়ে অতনুর মাথার কাছে বসে।

একটু বাদে অতনু বলে, "এর কোন দরকার ছিল না।"

"কিসের?" বরুণা প্রশ্ন করে।

"এই তোমার এভাবে কষ্ট করার।"

"কষ্ট আমার কিছুই হচ্ছে না। কিন্তু কষ্ট তো করাই উচিত।"

"কেন বলো তো?"

"বারে, দাদার অসুখ করলে বোন কষ্ট করবে না?"

বিস্ময়মুগ্ধ অতনু চট করে কোন জবাব দিতে পারে না। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপরে বলে, "কিন্তু রুণা আমি যে তোমাদের কর্মচারী।"

"কে বললে একথা?"

"কেউ বলে নি, কিন্তু কথাটা তো সত্যি!"

"না।" বরুণার স্বরে আত্মপ্রত্যয়ের পরশ। সে বলে, "কর্মচারী হলে আপনি রুণা বলতে পারতেন না, বলতেন রাজকুমারী।"

"বেশ মেনে নিলাম। কিন্তু তুমিই বা ছোট বোন হয়ে দাদাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করছ কেন?'

"ও! বড্ড ভুল হয়ে গেছে।" বরুণা হাসতে হাসতে বলে।

"আর কখনও হবে না তো?" অতনু গম্ভীর।

"না। সত্যি বলছি দাদা! তুমি দেখে নিও, আর কখনও তোমাকে আমি আপনি ডাকব না।"

মুগ্ধ অতনু অপলক নয়নে বরুণার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অতনুর অনুমান মিথ্যে হয়। অসুখটাকে সে যত সামান্য মনে করেছিল, ঠিক তত সামান্য নয়। গতকাল শেষ রাতে সে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তবে ভোর বেলাতেই জ্ঞান ফিরে এল।

অতনু চোখ মেলে। দেখে অরুণ তার মুখের সামনে ঝুঁকে রয়েছে। স্নিগ্ধ স্বরে সে জিজ্ঞেস করে, "এখন কেমন লাগছে অতনুদা?"

"ভাল।" অতনুর আস্তে আস্তে মনে পড়ে সব কথা। সে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন

করে, "তুমি আবার এত সকালে এলে কেন ?"

অরুণ একটু হাসে। বলে, "আমি কাল রাতে এখানেই ছিলাম।"

"তার মানে সারারাত আমার শিয়রে বসে কাটিয়েছ ?"

অরুণ কোন জবাব দেয় না। অতনু তার দিকে তাকায়। অরুণের উজ্জ্বল চোখদু'টি একটু লালচে হয়ে উঠেছে। ঘন-কৃষ্ণ চুলগুলো অবিন্যস্ত।

লজ্জা পায় অতনু। কিন্তু তারপরেই তার মনে পড়ে কথাটা—অরুণ শিল্পী। দরদী না হলে কখনই সার্থক শিল্পী হওয়া যায় না। মহৎ না হলে সেদিন সে অমন হাসতে হাসতে বরুণাকে অতবড় ত্যাগের কথা বলতে পারত না।

অরুণ সেই টুলখানায় বসে। একটু বাদে বলে, "জ্বরটা বেড়ে গিয়েছিল কিনা, তাই মা আর রুণা বলল একজন কারও আপনার কাছে থাকা দরকার। আমি থেকে গেলাম। আপনি বিশ্বাস করুন, কোন কষ্ট হয় নি। আমার রাত জাগার অভ্যেস আছে। আমি তো মাঝে মাঝেই সারারাত জেগে বই পড়ি।"

"পড়াশুনায় তোমার এত আগ্রহ, অথচ তুমি কলেজ ছেড়ে দিলে কেন ?" সুবিধা পেয়ে অতনু প্রশ্নটা করে ফেলে।

"কলেজী" পড়া বড়ই অর্থহীন ও একঘেয়ে। আমি ঠিক বরদাস্ত করতে পারলাম না। তাছাড়া ডিগ্রী, বড় চাকরি, অনেক টাকা—এর কোনটাই আমার কাম্য নয়।"

"তাহলে তোমার জীবনের লক্ষ্য কি ?"

"আমি একজন সার্থক শিল্পী হতে চাই।"

"লেখা-পড়া না শিখে, তুমি তা হবে কেমন করে ?" অতনু একটু বিরক্ত হয়।

অরুণ হাসে। বলে, "লেখা-পড়া তো শিখতেই হবে। তার চেষ্টাও করছি। আপনি তো জানেন দাদা, কলেজে পড়ার সঙ্গে লেখা-পড়া শেখার তেমন একটা সম্পর্ক নেই। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।"

"তুমি রবীন্দ্রনাথ পড়েছো ?"

"সব নয়, কিছু কিছু।"

"এখন কি পড়ছ ?"

"H. W. Furness সম্পাদিত শেক্সপিয়ারের Hamlet."

"কেমন লাগছে ?"

"খুব ভাল।" একবার থামে অরুণ। তারপরে লজ্জিতস্বরে বলে, মুশকিল কি জানেন, অল্পবিদ্যে বলে সব জায়গা ঠিক বুঝতে পারি না।"

"আমারও বিদ্যে বেশি নয়। তবু না বুঝতে পারলে এসো, বুঝবার চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা অতনুদা, Frank J. Ross সম্পাদিত 'An Illustrated

Hand-book of Art History' বইটা একটু যোগাড় করে দিতে পারেন ?" সলজ্জস্বরে অরুণ বলে, "মানে আমার এ বইটা নেই কিনা।"

"কারা প্রকাশ করেছেন ?" অতনু জিজ্ঞেস করে।

"ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী।"

"তা বেশ তো, একটা অর্ডার পাঠিয়ে দাও না। ওরা ভি পি করে বইটা পাঠিয়ে দিক, আমি ছাড়িয়ে নেব।"

"আপনি আমাকে বইখানা আনিয়ে দেবেন ?" অরুণের চোখেমুখে কৃতজ্ঞতা উপচে পড়ছে।

"নিশ্চয়ই", অতনু বলে "তোমার যখন দরকার, তখন আনাতে হবে বৈকি।"

তেমনি প্রগাঢ় স্বরে অরুণ আবার বলে, "জানেন, লেখা-পড়া করতে আমার খুব ভালো লাগে। আমি শুধু শিক্ষার নামে জবরদস্তি বরদাস্ত করতে পারি না।

"আমাকে পারবে তো ?"

"নিশ্চয়ই।"

"আচ্ছা তুমি কার কাছে ছবি আঁকা শিখেছ ?"

"কার কাছে শিখবো আবার ? নিজে নিজেই শিখেছি। তবে রোজ প'টো পাড়ায় গিয়ে ওদের কাজ দেখি।"

"তুমি বাঁশি বাজাও ?"

"আপনি জানলেন কেমন করে ?"

'সে যেমন করেই হোক্। এটা কার কাছে শিখেছ ?"

"বরকন্দাজ স্তান মন্ডলের কাছে। আমি ওর একটা মূর্তি গড়ে দিয়েছিলাম কিনা!"

অতনু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অরুণের দিকে। অরুণ বোধহয় লজ্জা পায়। সে উঠে দাঁড়ায়। "আমি মুখ ধুতে যাচ্ছি অতনুদা। মা-কে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে এসে আপনার মুখ ধুয়ে দেবে।"

অরুণ চলে যায়। অতনু তারই কথা ভাবতে থাকে—

রাজবাড়ির খাতায় ছেলেটির নাম দুর্জনের পাতায়। দুখিনী মায়ের বড় আশা—ছেলে মানুষ হবে, বড় হবে, তাঁর দুঃখ ঘোচাবে। সে আশা যে বিফল হবে, একথা রাজবাড়ির লোকেরা প্রায়ই তাঁকে মনে করিয়ে দেয়। তিনি কিন্তু হতাশ হন না। অভিমানী ছেলেকেও কিছু বলেন না। কেবল স্বর্গীয় স্বামীর কাছে ছেলের জন্যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

অতনু শুনেছে, অরুণ সারাদিন প'টোপাড়ায় কাটায়। এজন্য তাকে দু'-একবার বিপদেও পড়তে হয়েছে। এই তো সেবার কাজলগাঁয়ের প'টোপাড়ায় বাঘের উৎপাত শুরু হল। তারাপদ কুমারের গোয়াল থেকে একটা গোরু নিয়ে গেল। খবরটা রাজবাড়িতে এলেও তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। অরুণ

বীরেশ্বরবাবুকে অনুরোধ করেছিল একটা বিহিত করতে। কিন্তু তিনি তার কথায় আমল দেন নি।

পরদিন সকালে সিপাই রসিকলাল ছুটতে ছুটতে এল বীরেশ্বরবাবুর কাছে। জানালো. তার বন্দুকটা পাওয়া যাচ্ছে না। বহু খোঁজাখুঁজিতেও বন্দুক মিলল না। থানায় ডায়েরী করা হল। অরুণ যে আগের রাত থেকে উধাও, একথা বামুনপিসী ছাড়া আর কেউ জানত না। কিন্তু বন্দুক চুরির সঙ্গে যে অরুণের যোগাযোগ থাকতে পারে, এটা তিনিও ধারণা করতে পারেন নি।

দুপুর নাগাদ খবর পাওয়া গেল, বাঘ বন্দুক ও চোরকে একযোগে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চোরের নাম—অরুণ লাহিড়ী।

সংবাদদাতা তারাপদ কাঁদতে কাঁদতে বীরেশ্বরবাবুকে বললেন, "অরু ঠাকুর আমাদের বাঁচাতে একাজ করেছে ম্যানেজারবাবু! আপনি তাঁকে ছাড়িয়ে আনুন। তাঁকে সদরে চালান করলে, আমরা পাপের ভাগী হব।"

"পাপের ভাগী! ব্যাটা আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির এযেছেন।" ম্যানেজার গর্জে উঠলেন, "পিরীত করে বাঘ মারতে গ্যাছেন। এবারে কয়েকদিন শ্রীঘর বাস করে আসুন। শিক্ষা হবে। যেমন মা, তার তেমনি ছেলে হবে তো।"

গোপালবাবু তৌজির দিকে তাকিয়ে একবার মৃদু হেসেছিলেন। হাসিটুকু অতনুর চোখে ধরা পড়েছিল। পরে একদিন সুযোগ পেয়ে সে গোপালবাবুকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল। গোপালবাবুকে তখন বলেছিলেন—

সুবাসিনী দেবী প্রথম যখন এ বাড়িতে আশ্রয় নেন, তখন তাঁর সুখ-সুবিধের দিকে বীরেশ্বর বড় বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। কয়েকদিন বাদেই, এক গভীর নিশীথে হঠাৎ নারীকন্ঠের চীৎকারে নিচের তলায় অনেকের ঘুম ভেঙে গেল। বামুনদি'র ঘরের গরাদহীন জানালা দিয়ে একটা ছায়া-মূর্তি বাইরে লাফিয়ে পড়ল। বরকন্দাজের দল তাকে ধাওয়া করতে গেল। কিন্তু বামুনদি বাধা দিলেন।

সকালে দেখা গেল বীরেশ্বরবাবুর মাথায় পট্টি বাঁধা। আগের রাতে গোপাল গঞ্জ থেকে ফেরার পথে তিনি নাকি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। অরুণের একটা পাথরের খেলনা ভাঙা অবস্থায় বামুনদি'র জানালার বাইরে পড়েছিল। তাতে রক্তের দাগ।

এরপরে সুযোগ বুঝে বীরেশ্বর বামুনদির নামে লাগিয়েছিলেন রাজাবাহাদুরের কাছে। কিন্তু কথাটা কানে তোলেন নি তিনি। তাঁর এই নির্লিপ্ততার একটা কুৎসিত ব্যাখ্যাও করেছিলেন বীরেশ্বর। তবে সেকথা রাজাবাহাদুরের কান পর্যন্ত পৌঁছায় নি।

যাক্ গে, সেকথা ভাবছিল অতনু। বীরেশ্বরবাবুর কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন সহসা রাজাবাহাদুর সেরেস্তায় প্রবেশ করেছিলেন। অসময়ে তাঁকে আসতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন বীরেশ্বর।

সেরেস্তায় ঢুকেই রাজাবাহাদুর প্রশ্ন করেছিলেন, "কী হয়েছে তারাপদ ?"

"মহারাজ, আপনি অরুঠাকুরকে বাঁচান। কাল রাতে রসিক মোড়লের বন্দুক দিয়ে সে বাঘ মেরেছে, আমাদের রক্ষা করেছে। তাঁকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে।"

"বাঘ মেরেছে বলে থানায় ধরে নিয়ে গেছে!" রাজাবাহাদুর বিস্মিত হলেন। তিনি বীরেশ্বরবাবুর দিকে তাকালেন।

বীরেশ্বর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "বন্দুকটা না পেয়ে আমরাই থানায় খবর দিয়েছিলাম। বুঝতে পারি নি যে আমাদের অরু বন্দুক নিয়ে বাঘ মারতে গেছে।"

কথাটা মিথ্যে জেনেও কেউ কিছু বলতে সাহসী হন না। কেবল তারাপদ অরুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে উঠেছিল, "বলিহারী হাত হুজুর অরু-ঠাকুরের। এক গুলিতেই সাবাড়। বাছাধন আর উঠে দাঁড়াতে পারে নি।

"হুঁ।" রাজাবাহাদুর যেন একটু অন্যমনস্ক। "অতনু!"

"আজ্ঞে।" বিনীত কন্ঠে উত্তর দিয়েছিল অতনু।

"রসিককে নিয়ে তুমি একবার থানায় যাও। অরুকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসো। কিছু টাকা নিও। যদি জরিমানা করে, দিয়ে দিও।" তারপর তিনি রসিক-লালকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমার তো বয়স হল রসিক। যে ক'দিন আছো আর গোলাগুলির মধ্যে যেও না। তোমার বন্দুকটা অরুকে দিয়ে দাও। আর ওর একটা কেরিয়ার লাইসেন্স করে দিও।" রাজাবাহাদুর বীরেশ্বরবাবুর দিকে তাকালেন। বীরেশ্বর মাথা নাড়লেন।

অতনু সেদিন থানায় গিয়েছিল। ছাড়িয়ে এনেছিল অরুণকে। কথায় কথায় সেদিন দারোগাবাবু তাকে বলেছিলেন, "বাঘ মেরে অরুণবাবু যে উপকার করেছেন, সে তুলনায় তাঁর অপরাধ নিতান্তই নগণ্য। শুধু আপনারা 'ডায়েরী উইথড্র' না করলে আমি ওনাকে ছাড়তে পারছি না। 'ফাইন' তো দূরের কথা ওনাকেই আমরা তিরিশ টাকা পুরস্কার দেব।"

বন্দুকটা হাতে নিয়ে, টাকা তিরিশটা ভাল করে গুনে নিয়েছিল অরুণ। তার মুখে তখন তৃপ্তির পূর্ণতা। তারাপদ ও তার প্রতিবেশীদেরও আনন্দ আর ধরে না।

দারোগাবাবুকে নমস্কার করে বাইরে বেরিয়ে এলো অরুণ। তারাপদকে বলল, "এই টাকা ক'টা ধরো কুমোর। ভাল দেখে একটা গোরু কিনে নিও।'

বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই তার দিকে তাকিয়েছে। তারাপদ প্রতিবাদ করছে, "না, না। তা হয় না ঠাকুর। সারারাত জেগে বাঘ মারলে তুমি, সারাদিন হাজতে কাটালে তুমি, আর পুরস্কার নেব আমি ?"

"তোমাদের জীবন নিরাপদ করেছি, এইতো আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার মোড়ল! এ টাকা সে তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ। তবু যদি এই তুচ্ছ বস্তুর

বিনিময়ে তোমার গোয়াল ভরে ওঠে, তাহলে সার্থক হবে এ পুরস্কার।"

"না, না। এ আমি নিতে পারব না।" তারাপদ তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল।

"তুমি তো আমাকে চেনো কুমোর!" অরুণ তাকে বলেছিল, "তুমি না নিলে এ টাকা আমি পথে ছড়িয়ে দেব।"

নিরুপায় তারাপদ কৃতজ্ঞ চিত্তে অরুণের দিকে হাত বাড়িয়েছে।

কোমল হাতের স্নিগ্ধ-শীতল স্পর্শে অতনুর তন্দ্রা টুটে যায়। দুপুরের পথ্য খাইয়ে বরুণা তাকে ঘুমোতে বলে গেছে। সে-ই বোধ হয় আবার দেখতে এসেছে।

অতনু চোখ মেলে তাকায়। না, বরুণা নয়। গভীর উৎকন্ঠা নিয়ে বকুলবাঈ দাঁড়িয়ে আছে শিয়রে। অনুযোগ করে, "একটা ইত্তেলাও দিতে নেই?"

"সামান্য জ্বর। তোমাকে কষ্ট দিতে চাই নি।"

"খবর না দিয়েই তো কষ্ট দিলে। নসীব ভাল যে, ছেলেটা ছিল।"

"ছেলেটা কে?"

"অরুণ। সে আজ সকালে গিয়ে না বলে এলে তো জানাতেই পারতাম না যে, এদিকে এই কান্ড বাধিয়ে বসে আছো।"

"সে কেমন করে বুঝল যে, এ কান্ডের কথাটা তোমাকে জানানো দরকার?" অতনু জাবেদার দিকে তাকায়।

দু'জনে চোখা-চোখি হয়। জাবেদার মুখখানি রাঙা' হয়ে ওঠে। সে আরেকটু কাছে এগিয়ে আসে। অতনুর পাশে বসে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, "কাল রাতে বোখারের ঘোরে তুমি নাকি বার বার আমাকে ডেকেছো।"

অবচেতন মনকে আচ্ছন্ন করে আছে জাবেদা। অতনু কামনা করেছে তার সেবা। অজ্ঞাতে গোপন সত্যটি প্রকাশ করে ফেলেছে অরুণের কাছে। লজ্জা পায় অতনু। শুধু অরুণের কাছে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ পেয়েছে বলে নয়, বকুলবাঈয়ের এই আকস্মিক আগমন যদি রাজবাড়ির আলোচনার বিষয় হয়?

হোক্ গে, যে যা ভাবায় ভাবুক। যা সত্য, তা প্রকাশ হয়ে পড়লে ক্ষতি কি? হ্যাঁ, অতনু তাকে ভালোবাসে। বাইজী জেনেও ভালোবাসে মুসলমান জেনেও ভালোবাসে, অতনু জাবেদাকে ভালোবাসে। ভালোবাসে. তার সমস্ত সত্তা দিয়ে।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটে। অতনুর রুক্ষ-অবিন্যস্ত চুলের ভেতরে আঙুল চালিয়ে বকুলবাই বলে, "এখন কেমন লাগছে?"

"ভালো।" অতনু তৃপ্ত কন্ঠে উত্তর দেয়।

"দুপুরের দাওয়াই খেয়েছো?"

"হ্যাঁ। বরুণা খাইয়ে গেছে।"

"আজ ডাক্তারসাব আসবেন?"

"হ্যাঁ। বামুনদিদি তাঁকে রোজ আসতে বলে দিয়েছেন।"

"আল্লা, রাজকুমারী ও বামুনদিদির খয়রিয়ত করুন।"

কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতে চায় বকুলবাঈ। প্রিয়জনের যে মঙ্গল করেছে, ঈশ্বরের কাছে তাদের মঙ্গলকামনা করে নারী। ভুলে যায়—যে সবার মঙ্গল করে, আল্লা সব সময়ে তার মঙ্গল করেন না। আবার ঈশ্বরের অনুগ্রহ যারা পায়, তারাও সবাই অন্যের মঙ্গল চায় না।

গোধূলি ঘনিয়ে আসে। ক্ষীণকণ্ঠে অনুমতি চায় বকুলবাঈ, "এখন তাহলে আসি।"

"এই তো এলে।" অতনুর কণ্ঠে অভিযোগ।

একটু হেসে জাবেদা বলে, "সময় হিসেব করার মতো মন এখন তোমাতে নেই। সেই ভরদুপুরে এসেছি, সাঁঝ গড়িয়ে এলো। এবারে ইজাজত দাও।"

অতনু বকুলবাইয়ের একখানি হাত আঁকড়ে ধরে অবুঝ কণ্ঠে বলে, "না।"

॥ এগারো ॥

শব্দটা এগিয়ে আসছে। মানুষ পশুকে তাড়াচ্ছে।

কয়েকটি হরিণ বিদ্যুৎবেগে পালিয়ে গেল। লাটসাহেব রাইফেল তুললেন, কিন্তু ততক্ষণে তারা আড়ালে চলে গেছে।

একই মাচা। লাটসাহেবের পাশে রাইফেল হাতে রাজাবাহাদুর বসে আছেন। সুযোগ পেয়েও গুলি করতে পারলেন না তিনি। এ শিকারের নিয়ম হল, লাট-সাহেব গুলি ছোড়ার আগে কেউ রাইফেল দাগতে পারেন না।

প্রতিবছরই এ সময় লাটসাহেব কোন না কোন জমিদারীতে শিকারে বেরোন। এতে ইংরেজ প্রভুত্বের সঙ্গে জমিদারদের দাসত্বের বন্ধন যেমন সুদৃঢ় হয়, তেমনি নিখরচায় কয়েকদিন স্ফূর্তি করেও নেওয়া যায়।

এবারে তিনি ফুলগঞ্জে এসেছেন। ফুলগঞ্জের সৌভাগ্য, সাতদিন তিনি এখানে থাকবেন।

অতনু কিন্তু অন্য কথা ভেবেছে। ফুরিয়ে আসা রাজভান্ডার থেকে আরও হাজার বিশেক টাকা বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু অতনুর ভাবনায় কি এসে যায়। লাটসাহেবের আদর-যত্নের কোন ত্রুটি হলে চলবে না। তাই এক মাস ধরে রাজবাড়ি সাজানো-গোছানো হয়েছে। যেদিন লাটসাহেব ফুলগঞ্জে পদধূলি দিলেন, সেদিন থেকে শুরু হয়েছে

মহোৎসব। সেদিন থেকেই সেরেস্তা বন্ধ। সেদিন সদর থেকে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সারা পথটা রঙিন কাগজের শেকল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। আধ-মাইল অন্তর তৈরি হয়েছিল সুসজ্জিত তোরণ। প্রতি তোরণের মাথায় উড়েছে ইউনিয়ান জ্যাক্—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হয় না।

বহুদিন বাদে সেদিন আবার রুপোর নক্‌শা-করা আট ঘোড়ার জুড়িগাড়ি রাস্তায় বের হয়েছিল। এই যন্ত্রযুগেও সাবেকী যুগের যানবাহনের আভিজাত্য যে অম্লান রয়েছে, রাজাবাহাদুর তারই প্রমাণ দিয়েছেন লাটসাহেবকে।

সবার আগে ধুলো উড়িয়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে, বন্দুক কাঁধে সেপাইরা এসেছে। পেছনে জুড়ি হাঁকিয়ে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে লাটসাহেব। মন-মাতানো আতরের গন্ধে বিভোর হয়ে লাটসাহেব রাজপ্রাসাদের কোমল গালিচায় পদার্পণ করেছেন।

দিনে রাজবাড়ি সেজেছে ফুলের মালায়—রাতে আলোর ঝরণায়। দিন রাত চলেছে পান আর গান, সাজ আর নাচ। তিন দিন ধরে বিরামহীন মহোৎসব চলার পর আজ রাজবাড়ি নিঝুম হয়েছে। দলবল নিয়ে লাটসাহেব এসেছেন শিকারে।

মজা দেখার লোভে অতনুও এসেছে। অরুণের সঙ্গে একই মাচায় আশ্রয় নিয়েছে সে। জঙ্গলের এক প্রান্তে ঝরণার ধারে, অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে আটটি মাচা বাঁধা হয়েছে। রাজাবাহাদুরের হুকুমে অতনুকেও একটা রাইফেল নিতে হয়েছে। কিন্তু সে যে গোলাগুলির মধ্যে যাবে না, এ কথা আগেই অরুণকে বলে রেখেছে। অরুণ তখন হেসে বলেছিল. "এ সব শিকারে রাইফেল হল শোভা, ব্যবহার করতে হয় না। এ হচ্ছে শিকারের নামে একটা হৈচৈ।"

হৈচৈয়ের শব্দটা আরও এগিয়ে এসেছে। প্রায় শ'খানেক স্থানীয় লোককে লাগানো হয়েছে বন-তাড়ানোর কাজে। তারা ঢোল-ঢাল, কাঁসর-ক্যানেস্ত্রা, বল্লম বর্শা ইত্যাদি নিয়ে চারদিক থেকে জন্তুদের তাড়িয়ে এই বধ্যভূমিতে নিয়ে আসছে। জঙ্গল ফুলগঞ্জ এস্টেটে আরও আছে। কিন্তু এটাতেই নাকি হিংস্র জন্তুর সংখ্যা সবচেয়ে কম।

আবার একপাল হরিণ এলো। এবারেও লাটসাহেব বন্দুক তোলার আগেই তারা পালিয়ে গেল।

কেউ কোন কথা বলছে না। সবাই তাকিয়ে আছে নিচে। কয়েকটি বুনো মোষ এসে হাজির হয়েছে। এবারে সময় মতো রাইফেল তুললেন লাটসাহেব। কিন্তু রাজাবাহাদুর কি বলতেই তিনি রাইফেল নামিয়ে নিলেন। বুনো মোষদের আক্রমণ করা যে আত্মহত্যারই সামিল, একথাটাই বোধহয় রাজবাহাদুর তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন।

এক ঝাঁক বলাকা যাচ্ছে উড়ে—যেন নীল আকাশের বুকে শ্বেতকণিকা। লাটসাহেব আবার রাইফেল হাতে নিলেন। এবারেও রাজাবাহাদুর বাধা দিলেন গুলির শব্দ হলে কোন জানোয়ারই আর এমুখো হবে না।

রাইফেল রেখে চুপচাপ বসে আছে অরুণ।

"তুমি কি আর বন্দুক ছোঁবে না নাকি?" অতনু জিজ্ঞেস করে।

"আমি তো নিরীহ হরিণ বা পাখী মারতে এখানে আসি নি অতনুদা।"

ওর বোধহয় শিকারের স্পৃহা নষ্ট হয়ে গেছে।

দিনের আলো কমে আসছে। কিন্তু এখনও আঁধার নামে নি এখানে। ঝিঁঝি পোকার সমবেত সঙ্গীত চলেছে সমানে। মাঝে মাঝে শুকনো পাতার ওপরে পদসঞ্চারের শব্দ শুনতে পাচ্ছে অতনু। শেয়াল কিংবা শজারু, কাঠ-বিড়াল কিংবা খরগোশের দল যাওয়া-আসা করছে। একটা মাঝারি আকারের অজগর এঁকে-বেঁকে জঙ্গলের গভীরে মিলিয়ে গেল। থেকে থেকে বনের বুকে বাতাস বইছে। ডালে ডালে সংঘর্ষের শব্দ হচ্ছে। অতনু শুধু দেখছে আর শুনছে। শুনছে আর ভাবছে।

সহসা একটা গুরুগম্ভীর শব্দে সবাই চমকে ওঠে। যেন মেঘ ডাকছে। ধীরে অথচ বেপরোয়া গতিতে হেলতে-দুলতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা। এক জোড়া বাঘ। ভয়াবহ অরণ্যের ভয়ঙ্কর অধিবাসী। খেলাচ্ছলে যা শব্দ করছে, তাতেই যেন মাচাগুলো থরথর করে কাঁপছে। অতনুর হৃৎকম্প শুরু হল। ভয়ে তার গলা আটকে আসছে। অতনু বুঝতে পারছে ব্যাঘ্র-সমাজে এরা কুলীন—সবল, সুন্দর ও শঙ্কাহীন রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

সহসা সমস্ত বনভূমি প্রকম্পিত করে লাটসাহেবের '৪৪ উইঞ্চেস্টার গর্জে ওঠে। ব্যাঘ্র আহত হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষিপ্র গতিতে সে লাটসাহেবের মাচার দিকে এগিয়ে গেল।

রাজাবাহাদুরও গুলি চালালেন। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ পশু ততক্ষণে শত্রুর উদ্দেশ্যে লাফ দিয়েছে। রাজাবাহাদুরের গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এখন উপায়?

সহসা অতনুর কানের পাশে বন্দুক গর্জে উঠল। লাটসাহেবের ঘাড় অক্ষত রইল। বাঘ ধরাশায়ী হলো।

বাঘিনী পশ্চাদপসরণ করছে তীব্রগতিতে। কিন্তু জঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ধরাশা ী হলো অরুণের দ্বিতীয় গুলিতে।

অরুণের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে বন্দুক হাতে লাটসাহেব গিয়ে দাঁড়ালেন মৃত বাঘ দু'টির ঠিক মাঝখানে। ক্যামেরাম্যান শাটার টেপে। ক্লিক শব্দটি বিজয়োল্লাসের মাঝে মিলিয়ে যায়।

লাটসাহেব অতি সাবধানে গায়ে হাত বোলান। বিনীতকণ্ঠে রাজাবাহাদুর কুকুরটির জীবনী বর্ণনা করেন। এই মহলটি তাঁর গর্বের বস্তু। বিভিন্ন দেশ থেকে কুকুর আনানো হয়েছে। প্রাসাদের ভেটেরিনারী সার্জেনের ওপর নির্দেশ আছে, তিনি অন্য সব পশুপোষ্যের চেয়ে কুকুরের দিকে বেশি নজর দেবেন।

ছোট ছোট খুপরিওয়ালা এই বাড়ি তৈরি করা হয়েছে ওদের জন্যে। রাজা-বাহাদুর বলেন 'ডগ্ প্যালেস্', কেউবা বলে 'কুত্তামহল'। এই মহলের জন্য আলাদা চাকর, জমাদার এমন কি বাবুর্চি পর্যন্ত রয়েছে। প্রত্যেকটি কুকুরের প্রতি সপ্তাহে ওজন নেওয়া হয়। রোজ বিলিতি সাবান দিয়ে স্নান করানো হয়। শীতের আগে দর্জি নতুন জামাকাপড় তৈরি করে দেয়।

জীবনী শুনে স্তব্ধ হলেন লাটসাহেব। বুঝতে পেরে কুকুরটা তাঁকে দিয়ে দিলেন রাজাবাহাদুর। মুগ্ধ হলেন লাটসাহেব। ক্ষুব্ধ হল ডগ্ প্যালেসের কর্মচারীরা! ওরা জানে না লাটসাহেবকে কুকুরদান করতে পারা কত বড় সৌভাগ্য।

লাটসাহেব ডগ্ প্যালেস থেকে দরবার কক্ষের দিকে এগোলেন।

আজ মহোৎসবের শেষ রাত। কাল সকালে তিনি ফিরে যাচ্ছেন কলকাতায়। কাজেই আজ বিকেল থেকেই মুহুর্মুহুঃ বাজীর শব্দে কানে তালা লাগার যোগাড় হয়েছিল। একটু আগে বাজীপর্ব শেষ হয়েছে। এখন লাটসাহেবের দেহরক্ষীদের তাঁবুর পাশে যাত্রার আসর বেশ জমে উঠেছে। সেখানে নল-দময়ন্তীর পালা চলেছে।

আর বিশিষ্টদের জন্য দরবার কক্ষে বসেছে এই খেমটার আসর। গোলাপ-গঞ্জ থেকে বাঈজীরা আজ ফুলগঞ্জে এসেছে। বকুলবাঈও এসেছে সবার সঙ্গে।

লাটসাহেবের চোখে আমেজ। মুখে মদিরা। মশগুল হয়ে বসে আছেন তিনি।

রঙিন চিকের আড়ালে মেয়েরা। রাজকুমারীও এসেছে আসরে। রাণীমার আঁচল ঘেঁষে বসে আছে সে। মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠিত চোখে চতুর্দিকে চাইছে। অরুণ এ আসরে আসে নি।

রাণীমাকে কি বলে বরুণা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। দোতলার দিকে নয় অরুণের ঘরে। দরজা খোলা, ঘর খালি—অরুণ ঘরে নেই। ত্রস্ত পদক্ষেপে বরুণা বাগানের দিকে পা বাড়ায়।

॥ বারো ॥

অতনুদের চুরাশি হয়ে গেল। রাজাবাহাদুর উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। বার বার 'কিউ' বদলাচ্ছেন। ফল হচ্ছে উল্টো। তিরিশের বেশি আর তুলতে পারছেন না। বিলিয়ার্ডে একার পক্ষে দু'জনের সঙ্গে এঁটে ওঠা প্রায় অসম্ভব। সুরেশবাবু আর ঝুঁকি নিতে চান না। অতনুর পায়ে একটা চাপ দেন। এবার তাদের খারাপ খেলতে হবে।

ওদের ইচ্ছাকৃত ভুল মার রাজাবাহাদুরকে উৎসাহিত করে তোকে। তাঁর পয়েন্ট বাড়তে থাকে। অতনুরা চুরাশিতে স্থির হয়ে থাকে!

খেলায় জিতে কিউটা স্ট্যান্ডে রাখলেন রাজাবাহাদুর। দু'খানা দশ টাকার নোট অতনুদের হাতে দিয়ে বললেন, "দুঃখ পেও না। খেলায় হারজিত আছেই।"

হৃষ্টচিত্তে দোতলার দিকে চললেন তিনি। অতনু ও সুরেশবাবু রুদ্ধ হাসিকে মুক্ত করার জন্য অধীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, রাজাবাহাদুরের নিষ্ক্রমণের অপেক্ষায়।

কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। দারোয়ান এসে খবর দেয়, মল্লিকাপুর থেকে জমিদার অসিতপ্রসাদ তাঁর ছেলেমেয়েসহ এসে গেছেন।

রাজাবাহাদুরের পেছনে অতনুও বাইরে আসে। অতিথিরা মোটর থেকে নেমে পড়েছেন। বীরেশ্বরবাবু গালভরা হাসি নিয়ে করজোড়ে অসিতপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলছেন। রাজাবাহাদুর আলিঙ্গন করলেন অসিতপ্রসাদকে।

ছেলে অমর এগিয়ে আসে। সে করমর্দন করে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে। বয়সে অতনুর চেয়ে কিছু ছোটই হবে। ছিপছিপে গড়ন। পরনে সাহেবী পোশাক। গায়ের রং পোশাকের অনুকূল। মুখখানি মন্দ নয়। তবে চোখ দুটি বড্ড ছোট এবং স্বাস্থ্যটা মোটেই ভাল নয়।

মেয়ে সুজাতাও হাতজোড় করে রাজাবাহাদুরকে নমস্কার করে। সে দাদার মতো ফর্সা নয়। কটা চোখ। ভাঙা গাল। উঁচু কণ্ঠা। পরনে স্বচ্ছ-সবুজ শাড়ী ও কালো হাই হিল্ জুতো। খোঁপাটি অস্বাভাবিক বড়। গায়ে হাতা-হীন হলদে জামা—দৈর্ঘ্যে খাটো। বুক, পিঠ ও পেটের অধিকাংশ অংশই অনাবৃত। ফলে তার স্বাস্থ্যহীনতা সম্পর্কেও কোন সন্দেহ থাকছে না।

অতনুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয় মেয়েটি। কুমীরের চামড়ার হাতব্যাগ থেকে রেশমী রুমালখানা বের করে। রং মাখানো মুখখানায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে কিনা!

"চলুন ওপরে গিয়ে বসা যাক্।" রাজাবাহাদুর আমন্ত্রণ জানান।

অমর ও সুজাতা নিজেদের হাতঘড়ির দিকে তাকায়। ছড়িতে ভর দিয়ে অগ্রসর হন অসিতপ্রসাদ।- বাঁ-পাটা একটু টেনে টেনে চলেন তিনি। ছেলের চেয়ে দীর্ঘতর দেহ। তাহলেও রাজাবাহাদুরের কানের কাছে পড়েন।

রোদ পড়ে আসছে। বাগান ছায়াচ্ছন্ন। ঘরে বসে অতনু একখানা বই পড়ছিল। পাতা ওল্টাতে গিয়ে বাগানের দিকে নজর পড়ে। শিউলীতলায় বসে মূর্তি তৈরি করছে অরুণ। সামনে বসে আছে বরকন্দাজ কেষ্ট দাস। মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে আছে অরুণের দিকে।

বই বন্ধ করে বেরিয়ে আসে অতনু। অরুণ একবার তার দিকে তাকায়। তারপর কাজ বন্ধ না করেই বলে, "কেমন হলো বলুন। মুশকিলে পড়েছি

কেষ্টদা'র উঁচু দাঁতক'টি নিয়ে। কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না।"

"সুন্দর। অবিকল কেষ্টর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। তুমি বিশ্বকর্মা।" মুগ্ধকণ্ঠে অতনু বলে ওঠে।

কেষ্ট আনন্দে আটখানা। অরুণ নতমুখে কাজ করে যেতে থাকে।

"এক্স্‌কুইজিট্‌। ছেলেটা কে?"

অতনু পেছন ফেরে। বরুণা ও কালীতারার সঙ্গে কখন্‌ অমর ও সুজাতা তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সুজাতাই প্রশ্নটা করেছে—সম্ভবত বরুণাকে।

বরুণার সঙ্গে অরুণের চোখাচোখি হয় একবার। তারপর দু'জনেই চোখ ফিরিয়ে নেয়।

"আমাদের বামুনদি'র ছেলে অরুদা গো।" বরুণাকে নীরব দেখে কালীতারা শুরু করে, "ঠাকুর বানায়, বাঁশ বাজায়, ছবি আঁকে, বাঘ মারে, কুস্তি করে। তোমার মনে নেই দিদিমণি?" কালীতারা বরুণাকে সাক্ষী মানে, "গতবার পদ্মবাগানের সেই পালোয়ানটা যখন আমাদের মহতোকে হারিয়ে দিলে, তখন অরুদাই তো ফুলগঞ্জের মান রেখেছিল। ওঃ, অতবড় পালোয়ানটাকে পাঁচ মিনিটে চিত করে ফেললে! কি আনন্দই আমাদের হয়েছিল সেদিন।"

"স্ট্রেঞ্জ, কুস্তি করে আবার মূর্তিও বানায়। কিন্তু কি বললে? বামুনদির ছেলে? সে আবার কে?" অমর তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

জিজ্ঞাসার ধরনটা অতনুর খারাপ লাগে। অজানা আশংকায় আতঙ্কিত হয় বরুণা।

কালীতারা যথারীতি কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে কিছু বলতে পারার আগেই অতর্কিতে উঠে দাঁড়ায় অরুণ। হাতের ছুরিখানা দোলাতে দোলাতে দৃপ্তকণ্ঠে বলে, "আমার মা। রাজাবাহাদুরের নিজস্ব রাঁধুনি।" একটু থেমে ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলে, "মূর্তি যে বানাই তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। কুস্তি যে জানি, তাও ইচ্ছে করলে যাচাই করতে পারেন।"

একবার হেসে উঠেই চুপ করে যায় বরুণা। ক্ষুব্ধ অমর টাইয়ের 'নট্‌' ঠিক করতে করতে সেখান থেকে প্রস্থান করে। কেষ্ট দাস ততক্ষণে ঘামতে শুরু করেছে। তার মূর্তিকে কেন্দ্র করেই মহামান্য অতিথি অপমানিত হয়েছেন। মূর্তির মধ্যে অমরত্বলাভের বাসনার অবসান হয়েছে। সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

"আমার একটা মূর্তি বানিয়ে দেবে?" দাদার অপমান গায়ে না মেখে সুজাতা বলে।

"দেব। তবে একটা শর্ত আছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাতো পাবেই। আমার জন্য খাটবে আর টাকা পাবে না? বল, কত দিতে হবে?"

"পারিশ্রমিক নিতে পারার মতো উপযুক্ত আমি এখনও হই নি। আমার

শর্তটা অন্য রকম।"

"কী? শুনি।"

"প্রত্যেকের শিক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব অনুসারে এক একটা বিশেষ বেশ ও ভঙ্গিমা আছে, যাতে তাকে সবচেয়ে ভাল মানায়। আমার নির্দেশিত পোশাকে ও ভঙ্গিমায় যদি আপনি মডেল হতে রাজী থাকেন, তবে আপনার মূর্তি গড়ে দিতে পারি।"

"অর্থাৎ?"

"মূর্তিতে রক্তমাংসের শরীর যে লাগানো যায় না, তা প্রত্যাশার মাত্রাধিক্যে অনেকে বোঝেন না। প্রতিমূর্তিতে যা থাকে শিল্পীর পরিকল্পনা অনুসারে তা সাদৃশ্যের ইলিউসিভ্ এফেক্ট মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। এ বিষয়ে অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু সে-সব কথা আপনারা বুঝতে পারবেন না। কাজেই সে কথা থাক্। আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী না হলে, আমি রাজী নই।"

সবাইকে বিস্মিত করে সুজাতা বলে ওঠে, "বেশ, আমি রাজী আছি। বল, কোথায় বসে বানাবে?"

"আমার ঘরে—দোর বন্ধ করে।"

বরুণা একবার চমকে উঠে স্থির হয়ে যায়। আর অতনু ভাবে—অরুণ মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে।

অতনুর অনুমান মিথ্যে হয় না। অরুণ সত্যিই প্রতিশোধ নেয়। কয়েক-দিন বাদে একদিন বিকেলে হঠাৎ অরুণ এসে হাজির হয় সেরেস্তায়। এসে দাঁড়ায় খোদ ম্যানেজারের সামনে।

"তোমার আবার কি চাই?" বীরেশ্বরবাবু বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

"আপনি নাকি মল্লিকাপুরে যাচ্ছেন, বরুণার বিয়ের পাত্রি-পত্র করতে?"

"যাচ্ছি। কিন্তু বরুণার বিয়ের মধ্যে তুমি আবার মাথা গলাতে এলে কেন?"

"আপনি যেখানে মাথা দিয়ে বসে আছেন, সেখানে গলাবার মতো মাথা কি ফুলগঞ্জে কারও ঘাড়ে আছে? আমি বরুণার জন্য এখানে আসি নি, আমি এসেছি সুজাতার জন্য।"

"সুজাতা?" বীরেশ্বর বিস্মিত।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সে যাবার সময় তার একটা জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নি। দয়া করে আপনি যদি সেটা নিয়ে যান?"

"সুজাতার জিনিস যখন, নিশ্চয় নিয়ে যাব! কিন্তু সে আবার তোমার কাছে কি রেখে গেল?"

"তার একটা মূর্তি।" মোড়ক খুলে মূর্তিটা বীরেশ্বরবাবুর সামনে রাখে অরুণ।

সেরেস্তার সকলেই দেখতে পায়। সকলেই হতবাক হয়ে যায়। অদ্ভুত নিখুঁত ও জীবন্ত মূর্তি। মনে হচ্ছে সত্যই সুজাতা আধশোয়া ভঙ্গিতে সামনে বসে আছে। কিন্তু কোন পেশাদার মডেলের মূর্তিও বোধ করি এমন অনাবৃত হতে পারে না।

অরুণই প্রথম কথা বলে। সে বীরেশ্বরবাবুকে জানায়, "সুজাতা নিজেই এই-ভাবে সামনে বসে আমাকে দিয়ে এটা তৈরি করিয়েছে কিনা, তাই তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইছি।"

"ঠিক আছে। রেখে যাও।"

"আমি তাহলে সুজাতাকে লিখে দিচ্ছি। ও আবার আমাকে চিঠি লিখে তাগিদ দিয়েছে।" বলতে বলতে অরুণ বেরিয়ে যায়।

মূর্তিটা তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলেন বীরেশ্বরবাবু। তাঁর দু'চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।

॥ তেরো ॥

আজ একেবারে সকালবেলাতেই অরুণ এসে উপস্থিত হল। যথারীতি তার হাতে একখানি বই। অতনু জিজ্ঞেস করে, "ওটা কি বই?"

অরুণ উত্তর দেয়, "Unto This Last & Other Essays On Art And Political Economy By John Ruskin."

"কোথায় পেলে?" অতনু হাত বাড়ায়।

বইখানি তার হাতে দিয়ে অরুণ বলে, "কোথায় আবার পাবো, মামা দিয়েছেন।"

"রাজাবাহাদুর এসব বইও পড়েন?" বইখানি নাড়াচাড়া করতে করতে অতনু জিজ্ঞেস করে।

"পড়েন বৈকি। ভাল বইয়ের খোঁজ পেলেই তিনি কিনে ফেলেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়েন।"

সত্যই তাই। বিচিত্র এই মানুষটি। অসংখ্য মহৎ গুণের অধিকারী হয়েও নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনছেন। প্রথমদিন এ বাড়িতে এসেই অতনুর তাঁকে দেবতা বলে মনে হয়েছিল, আজও তার সে মত অপরিবর্তিত। রাজাবাহাদুর সত্যই দেবতা—ভাঙা দেউলের দেবতা।

তাকে নীরব দেখে অরুণ বলে, "বইটা আমাকে দিন। আমি একটা জায়গা আপনাকে পড়ে শোনাতে চাই। আমার বড় ভাল লেগেছে কথাগুলো—মানে

সেগুলো আমার মনের কথা কিনা।"

অতনু বইখানা অরুণের হাতে দিয়ে বলে, "বেশ তো পড়ো না।"

অরুণ পড়তে শুরু করে—'···You have always to find your artist, not to make him ; you can't manufacture him, any more than you can manufacture gold. You can find him, and refine him.···A certain quantity of art-intellect is born annually in every nation,···' একবার থামে অরুণ। তারপরে অতনুর দিকে তাকিয়ে বলে, "আমি আমার অন্তরের সেই শিল্পীটিকে খুঁজে পেয়েছি। এখন তাকে আমার বিশুদ্ধ করে তুলতে হবে, নির্মল করে গড়তে হবে—সেই শিল্পসত্তার উৎকর্ষসাধন করতে হবে।"

অরুণ থামে, কিন্তু অতনু কোন কথা বলে না। সে শুধু চেয়ে চেয়ে অরুণকে দেখে—তার সারামুখে আত্মপ্রত্যয়ের দীপ্তি, চোখ দুটিতে সাধনার সংকল্প।

অতনুকে নীরব দেখেই বোধহয় অরুণ আবার বলতে থাকে, "আর সেই উৎকর্ষলাভ শুধুমাত্র সম্ভব দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে। নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন জীবন সার্থক শিল্পসৃষ্টির অন্তরায়। ব্যথা ও বেদনার কষ্টিপাথরে স্রষ্টার উৎকর্ষ যাচাই হয়। আমিও সেই দুঃখের সমুদ্রমন্থনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই, নইলে যে আনন্দের অমৃত আমার নাগালের বাইরে রয়ে যাবে।"

"তুমি কি ফুলগঞ্জ ছেড়ে চলে যেতে চাইছ?"

অরুণ নিরুত্তর।

অতনু আবার বলে, "কিন্তু কোথায় যাবে?"

"তা তো জানি না অতনুদা! শুধু জানি, রাজপ্রাসাদের প্রাচুর্য আমার জন্য নয়। আমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু'বেলা দু'টি অন্ন জোগাড় করতে হবে, বেদনার আগুনে পুড়িয়ে আমার অন্তরের সেই শিল্পসত্তাকে নিখাদ করে তুলতে হবে।" ··

অরুণ হয়তো আরও কিছু বলত। কিন্তু থামতে হয় তাকে। অতনুর জল-খাবার নিয়ে কালীতারা ঘরে ঢুকেছে। আর তার পেছনে স্বয়ং বরুণা। অসুখের পর থেকে রাণীমা এই নিয়মটি চালু করেছেন। তাঁর নিজের হেঁশেল থেকে অতনুর খাবার আসে। আর সে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছে কিনা, তা তদারক করতে বরুণা প্রায়ই কালীতারার সঙ্গে আসে।

ঘরে ঢুকেই বরুণা বলে ওঠে, "আজ দেখছি সাত-সকালেই 'স্টাডি-সার্কেল' শুরু হয়ে গেছে। সত্যি বলছি দাদা, তোমার মাস্টার হওয়াই উচিত ছিল।"

হেসে অতনু বলে, "তা ছাত্র-ছাত্রী পেলেই টোল খুলে বসতে পারি।"

"সে কি দাদা! এমন অনুগত ছাত্র পেয়েও তোমার মন ভরছে না, এ তোমার ভারী অন্যায়। বেচারী হয়তো সকালে চা পর্যন্ত না খেয়ে তোমার কাছে বই হাতে ছুটে এসেছে আর তুমি কিনা ·" শেষ করে না বরুণা।

একটু হেসে অরুণ বলে, "আমি চা খেয়ে এসেছি। তবে খাবার খাই নি। ইচ্ছে করেই খাই নি। কারণ আমি জানতাম অতনুদার জন্য যে জল-খাবার আসবে, তাতে আমাদের দু'জনেরই বেশ হয়ে যাবে।"

"খবরদার! দাদার খাবারে ভাগ বসালে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।" বরুণার মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

কিন্তু গম্ভীর থাকতে পারে না কালীতারা। সে ফিক্ করে হেসে দেয়। অরুণ তার দিকে তাকায়। কালীতারা হাসতে হাসতে বলে, "তুমি এমন মিছে কথা বলতে পারো দিদিমণি।"

"সত্যি কথাটা কি কালীদি?" অরুণ প্রশ্ন করে।

"আমি দাদার একার জন্যই খাবার নিচ্ছিলুম, তখন দিদিমণি আমাকে বললে, অরুদাও ওখানেই রয়েছে, ওর খাবারটাও সঙ্গে নিও।"

"তুই এবার যাবি এখান থেকে?" বরুণা হেঁকে ওঠে।

কালীতারা ঘর থেকে চলে যায়। ওরা তিনজনেই প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

হাসি থামলে বরুণা বলে, "খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।"

"তুমি খেয়েছো?" অরুণ প্রশ্ন করে।

"না।" বরুণা উত্তর দেয়, "তোমাদের খাইয়ে গিয়ে খাবো।"

"কেন, এই তো অনেক খাবার রয়েছে, এখানেই খেয়ে নাও না।"

"আজ্ঞে না মশাই!" বরুণা অরুণকে বলে, "দু'জনের খাবারে কখনও তিনজনের খাওয়া নয় না।"

"ভুল বললে রুণা!" অরুণ প্রতিবাদ করে, "অবস্থার বিপাকে পড়ে অনেক সময় একজনের খাবারও পাঁচজনে ভাগ করে খেতে হয়।"

"তেমন অবস্থায় তো এখনও আমরা পড়ি নি অরুদা, পড়লে দেখে নিও, সেদিনও আমার কোন কষ্ট হবে না।"

অপ্রস্তুত অরুণ আর কথা না বলে খাবারে হাত দেয়। অতনুও তাকে অনুসরণ করে। ওরা নীরবে খেতে থাকে।

বোধহয় ঘরের আবহাওয়াটাকে স্বাভাবিক করে তুলবার জন্যই সহাস্যে বরুণা বলে, "তা আজকের স্টাডি সার্কেলের সাবজেক্ট্ ম্যাটারটা কি ছিল?"

অতনু চমকে ওঠে। ভাবে, বরুণা কি দরজার আড়াল থেকে ওদের কথা-বার্তা শুনে ফেলেছে নাকি? সে কি জানতে পেরেছে যে অরুণ ফুলগঞ্জ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে?

অতনুকে নীরব দেখেই বোধহয় অরুণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "আমরা রাসকিনের ঐ বইটার ওপরে আলোচনা করছিলাম।"

বরুণা এগিয়ে এসে বইখানা হাতে নেয়। একটু নাড়া-চাড়া করে আবার রেখে দেয়। তারপরে হঠাৎ বলে বসে, "এতো বই পড়ছ, অথচ কলেজের

বইগুলো কিছুতেই পড়লে না !"

"কি হতো সে-সব বই পড়ে ?"

"কি হতো ?" বরুণা যেন জ্বলে ওঠে, "কি আর হতো ? পরীক্ষায় পাস করতে, মানুষ হতে।"

"কলেজের পরীক্ষায় পাস না করলে বুঝি মানুষ হওয়া যায় না ?" অরুণ শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে।

কিন্তু বরুণা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সে কর্কশকণ্ঠে বলে, "যায়ই না তো !" তার কণ্ঠস্বর রীতিমত বিকৃত। তার চোখে জল।

অতনু অপ্রস্তুত। অরুণও এমন পরিণতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে চুপ করে থাকে।

বরুণা কিন্তু সামলে নেয় নিজেকে। চোখ মুছে শান্ত কণ্ঠে বলে, "তোমার এত গুণ, অথচ তুমি না পারলে পিসীর দুঃখ ঘোচাতে, না পারলে আমাদের কোন কাজে আসতে।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "আজ যদি তুমি পাস-টাশ করে একটা চাকরি-বাকরি করতে, তাহলে তো আমাদের ম্যানেজার-জ্যাঠার এমন খেয়ালের পুতুল হয়ে থাকতে হতো না।"

অতনু বুঝতে পারে বরুণা বহুবচনের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখতে চাইছে। তবু সে নীরব থাকে।

বাইরে রোদ পড়ে এসেছে। আগে অতনু এসময়ে বাগানে গিয়ে বসত। আজকাল আর বড় একটা যায় না। বাগানে গেলেই যে তার সখীচরণের কথা মনে পড়ে। মনটা ভারী হয়ে ওঠে।

ঘরে বসেই একখানি বই পড়ছিল সে—রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা'। রাজা-বাহাদুরের বই—কিছুক্ষণ আগে অরুণ তাকে দিয়ে গেছে।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে বকুলবাঈ। মুখে একরাশ হাসি।

অতনু উঠে বসে। বলে, "এসো।"

"কোথায় ?"

"বুকে বলতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু তা তো বলার উপায় নেই, এযে ফুলগঞ্জের রাজবাড়ি—গোলাপগঞ্জের বাগানবাড়ি নয়।"

"তাতে কি হয়েছে ?" দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জাবেদা এগিয়ে আসে কাছে। অতনুর অধরে একটি চুম্বনের উষ্ণ স্পর্শ এঁকে দেয়।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। বাঈজীর বাহুবন্ধন শিথিল হয়। অতনু মুখ তোলে। জাবেদা তার পাশে বসে।

অতনু হাসতে হাসতে বলে, "সাহস বড্ড বেড়ে গেছে।"

"এতে হিম্মতের কি আছে ?" জাবেদা জবাব দেয়, "সবাই জানে, তুমি আমাকে প্যার করো।"

"তাই বলে রাজবাড়িতে বসে এই সব কাণ্ড !"

"আর কিছুদিন পরে তো সব কাণ্ডই রাজবাড়িতে বসে হবে।"

"কেন ?"

"গোলাপগঞ্জ প্রাসাদ বেচে দেওয়া হচ্ছে।"

"তাই নাকি !" অতনু বিস্মিত।

"হ্যাঁ।" বকুলবাঈ বলে, "দুটো মহল বন্ধক রেখেও রাজকুমারীর বিয়ের টাকা জোগাড় হয় নি, তাই একজন গুজরাটী মহাজনের কাছে গোলাপগঞ্জ প্রাসাদ বেচে দেওয়া হচ্ছে।"

"সেকি ! তাহলে তোমরা থাকবে কোথায় ?" অতনু আঁতকে ওঠে।

"আপাতত কোন সমস্যা নেই। কারণ রাজকুমারীর বিয়ের পরে বাড়ির দখল দেওয়া হবে।"

"তখন কি করবে ?" অতনু উৎকণ্ঠিত।

"অন্য বাঈজীরা সবাই চলে যাবে, রাজাবাহাদুর তাদের কিছু টাকা ও জমি দেবেন।"

"তুমি ?" অতনু উত্তেজিত।

"আমি একা আর থাকব কেমন করে ?" বকুলবাঈ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, "রাজাবাহাদুর যখন বাঈজীর পাট তুলেই দিচ্ছেন, তখন আমাকেও চলে যেতে হবে।"

"না।" অতনু বকুলবাঈয়ের একখানি হাত ধরে। বলে, "আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবো না।"

অতনুর বুকে মুখ লুকিয়ে জাবেদা মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "আমাকে রাখতে পারবে তুমি ?"

"নিশ্চয়ই।"

"কোথায় রাখবে ?"

"আমার ঘরে।"

"আমি যে বাঈজী, মুসলমান · ·

"তাতে আমার কিছু এসে যায় না।"

"আমি যদি তোমাকে সুখী করতে না পারি ?"

"কেন পারবে না ? তুমি যে আমাকে ভালোবাসো।"

"তাহলে তুমি রাজাবাহাদুরকে বলবে কথাটা।" জাবেদা মুখ তোলে। সে ঠিক হয়ে বসে।

"কি কথা ?" অতনু ঠিক বুঝতে পারে না।

"আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি এখানেই থাকব—তোমার কাছে থাকব।"

"বেশ বলব।"

"সরম লাগবে না ?"

"সত্যি কথা বলতে লজ্জা লাগবে কেন ? তাছাড়া রাজাবাহাদুর তো জানেন, তুমিই আমাকে ফুলগঞ্জে নিয়ে এসেছো। রাজকর্মচারী হলেও আমি তোমার ক্রীতদাস।"

"কথাটা মনে থাকে যেন!" জাবেদার কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

"জো হুকুম শাহজাদী।" অতনু জাবেদাকে কৃত্রিম কুর্নিশ করে।

তারপরে দু'জনেই একসঙ্গে হাসতে থাকে।

হাসি থামলে বকুলবাঈ বলে, "এই রে! আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।"

"সেটা আবার কি কথা ?" অতনু প্রশ্ন করে।

বকুলবাঈ উত্তর দেয়, "আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

"বিদায়!" অতনু বিভ্রান্ত।

"হুঁ।"

"কোথায় যাচ্ছ ?" ঊর্ধ্বশ্বাসে অতনু জিজ্ঞেস করে।

"দার্জিলিং।"

"তাই বলো।" অতনু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। বলে, "মেয়েকে দেখতে ?"

"না। আনতে যাচ্ছি।"

"আনতে! এ সময়ে! এখন তো তার ক্লাশ চলছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু রাজাবাহাদুর বললেন, রাজকুমারীর শাদীতে এত আনন্দ-ফুরতী হবে আর আমার মেয়েটা আসবে না!"

অতনু আর আপত্তি করতে পারে না! ভাবে—রাজাবাহাদুর সত্যই দেবতা। কি উদার অন্তঃকরণ! তাঁর একজন বাঈজীর অবৈধ সন্তানেরও যে রাজবাড়ির উৎসবে একটা অংশ আছে, এটুকু পর্যন্ত তিনি মনে রেখেছেন। অথচ এই দেবতুল্য মানুষটির ভবিষ্যতের কথা ভাবলে অতনুর বড় ভয় হয়।

তাকে নীরব থাকতে দেখে বকুলবাঈ বোধহয় ভয় পায়। সে অতনুর একখানি হাত নিজের দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে, "তুমি কি নারাজ হলে ?"

অতনু একটু হাসে। বলে, "না না, রাগ হবে কেন ? রাজাবাহাদুর বললে তুমি আপত্তি করবে কেমন করে ? তিনি তো মিথ্যে বলেন নি, এখানে এত আনন্দ আর ছায়া পড়ে থাকবে অত দূরে ?"

"আমার কিন্তু আরও একটা মতলব আছে।"

"কি বল দেখি ?"

বাঈজী সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। গাঢ় স্বরে বলে, "তুমি তো জানো, ছায়ার একটা প্রশ্নের আমি জবাব দিতে পারি নি এতদিন। এবারে আমি সে জবাব দেব। তাকে তার বাবার সঙ্গে পহচান করিয়ে দেব। তোমার কোন আপত্তি নেই তো ?" তার চোখে-মুখে সকরুণ প্রত্যাশা।

"না।" অতনু বাঈজীর দিকে তাকায়। দু'জনের চোখে দু'জনের চোখ পড়ে। বাঈজী চোখ নামিয়ে নেয়।

অতনু আবার বলে, "আমি তো তোমাকে সেদিনই বলেছি জাবেদা! ছায়া আমার মেয়ে—আমার মানস-কন্যা।"

আনন্দে ও উত্তেজনায় জাবেদার সারা শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। অতনু তাকে কাছে টেনে নেয়।

॥ চৌদ্দ ॥

কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে। অতনুর ঘুম ভেঙে যায়। সকাল হয়ে গেছে। নহবৎখানায় সানাই বাজছে। আগামী সপ্তাহে রাজকুমারীর বিয়ে। ফুলগঞ্জ উৎসবমুখর।

কিন্তু এত সকালে দরজা ধাক্কাচ্ছে কে? তাড়াতাড়ি উঠে বসে অতনু। খাট থেকে নামে। দরজা খোলে। কালীতারা দাঁড়িয়ে। অতনু অবাক হয়। এত সকালে কালীতারা··!

কালীতারা ঊর্ধ্বশ্বাসে বলতে থাকে, "সর্বনাশ হয়ে গেছে বলুবাবু! অরুদা পালিয়ে গেছে।"

"পালিয়ে গেছে!" অতনু বিস্মিত। অরুণ চলে যাবে, সে জানত। কিন্তু কালীতারা পালিয়ে গেছে বলছে কেন? তাহলে কি সে বরুণাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে?

"হ্যাঁ, বলুবাবু!" কালীতারা বলে, "পালিয়েই গেছে। সকালে বামুনদি ঘুম থেকে উঠে দেখেন, তাঁর পায়ের কাছে একখানা চিঠি। তাতেই অরুদা লিখে গেছে, সে পালিয়ে গেল।"

"সে একাই গেছে তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! তাই তো বলছি পালিয়ে গেছে। কাউকে বলে যায়নি কিনা।"

কালীতারার কথায় হাসি পায় অতনুর। কিন্তু হাসতে পারে না সে। অরুণ চলে গেছে! হয়তো বা চিরবিদায় নিয়েছে ফুলগঞ্জ থেকে। এমন একটা দুর্ঘটনা যে ঘটতে পারে, অতনু সে আশংকা করছে কিছুদিন থেকেই। তবু সে ভেবেছিল, বরুণার বিয়ে পর্যন্ত অন্তত অরুণ থাকবে ফুলগঞ্জে। সে বরুণাকে ভালোবাসে। কাজেই এই শুভ-উৎসবে সে কিছুতেই বিঘ্ন ঘটাবে না। বরুণার অকল্যাণ হতে পারে, এমন কোন কাজ অরুণ করতে পারে, এ অতনুর অজানা ছিল। তার মতো বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছেলে কেন এ ভুল করল?

কালীতারা আবার বলে, "রাজাবাহাদুর আপনাকে ডাকছেন।"

'কোথায় তিনি ?" অতনু জিজ্ঞেস করে।

"বামুনদির ঘরে।"

"রাণীমা ?"

"তিনিও সেখানে।"

"বরুণা ?"

"দিদিমণি তার ঘরে। একবার বামুনদির কাছে যাবার জন্য রাণীমা তাকে কত করে বললেন, কিন্তু দিদিমণি কিছুতেই গেল না।"

আর সময় নষ্ট না করে অতনু ছুটে আসে বামুনদির ঘরে। মেঝেতে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছেন তিনি। রাণীমা তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

পাঁচ বছরের বেশি হল অতনু এ বাড়িতে এসেছে। বামুনপিসীকে সে দেখে এসেছে ধৈর্যের ধাত্রীরূপে। স্বল্পভাষী এই ব্রাহ্মণ-বিধবা ছোট-বড় নির্বিশেষে সবারই সমান প্রিয়। অতনু তাঁর জীবনের সামান্য কিছু কথা জানে। সে শুনেছে—অরুণের মা সুবাসিনীদেবীর বাবা টোলের পণ্ডিত ছিলেন। আর অরুণের বাবা ছিলেন একজন স্কুল মাস্টার। বামুনপিসীর বাবার বাড়িতে কিম্বা স্বামীর ঘরে প্রাচুর্য ছিল না, কিন্তু শান্তি ছিল।

স্বামীর অকাল-মৃত্যুর প্রায় দু'মাস পরে অরুণের জন্ম হয়। একজন দরিদ্র প্রজার স্ত্রী হয়েও, তিনি রাজবাড়িতে জায়গা পেয়েছেন। রাজাবাহাদুর তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। তবু তাঁকে অনেক সইতে হয়েছে। দেবরের দুর্ব্যবহার, বীরেশ্বরের বজ্জাতি, রাঁধুনির কায়িক পরিশ্রম—সবই তিনি এতকাল ধরে হাসি-মুখে সয়ে আসছিলেন শুধু একটি আশায়—অরুণ একদিন মানুষ হবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি যখন কারও কোন ক্ষতি করেন নি, তখন তাঁর এ আশাও বিফল হবে না। বার বার ভেবেছেন—না-ই বা হল লেখা-পড়া, তবু অরুণ মানুষ হবে—সত্যিকারের মানুষ।

আজ তাঁর সব আশা ঘুচে গেছে। বেঁচে থাকবার একমাত্র সম্বল নিঃশেষ হয়েছে। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছে। তিনি পাগলের মতো চিৎকার করে কাঁদছেন।

রাজাবাহাদুর ইসারায় অতনুকে কাছে ডাকেন। হাতের কাগজখানি তাকে দেন। অরুণের চিঠি। অতনু পড়তে শুরু করে। অরুণ লিখেছে—

> 'দুঃখ করো না মা-মণি। ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। চাইবে কেমন করে বলো! আশৈশব যাঁদের এত আপন বলে জেনেছি, মন কি তাঁদের ছেড়ে যেতে চায় ?
>
> তবু যেতে হবে। তুমি তো জানো মা-মণি! রুণা আমাকে কতো ভালোবাসে। তার সুখ ও শান্তির জন্য আমি যদি এই সামান্য ত্যাগটুকু স্বীকার না করতে পারি, তাহলে আমার বেঁচে থাকাই যে অর্থহীন হবে।

জানি তোমার কষ্ট হবে। রুণার কষ্ট হবে। অতনুদা, বকুলদি ও মামা-মামীর কষ্ট হবে। কষ্ট হবে কেষ্টদার, কালীতারার, প'টো-পাড়ার আরও অনেকের। তোমার মতো তাদের সকলের কথাও আমার সব সময়ে মনে থাকবে। তোমার আশীর্বাদ ও তাদের ভালো-বাসা আমার ভাবী জীবন-পথের পাথেয় হয়ে রইলো। রুণাকে বলো, যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, তার ডাক শুনতে পেলে আমি সাড়া দেব। মঙ্গলময়ের কাছে কায়মনোবাক্যে কামনা করছি —সে সুখী হোক্।

মামা ও মামীকে বলো, তাঁরা যেন আমাকে মার্জনা করেন। আর তুমি তোমার এই অপদার্থ সন্তানকে ক্ষমা করে তার প্রণাম নিও।

ইতি—

হতভাগ্য অরুণ

অতনু চিঠিখানা রাজাবাহাদুরকে ফিরিয়ে দেয়। তিনি ইসারা করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। অতনু তাঁকে অনুসরণ করে।

লাইব্রেরীতে ঢুকে রাজাবাহাদুর বলেন, "দরজাটা বন্ধ করে দাও।"

অতনু আদেশ পালন করে। সে রাজাবাহাদুরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

রাজাবাহাদুর গুরুগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন, "তুমি অরু ও রুণার ব্যাপারটা জানতে ?"

"আজ্ঞে জানতাম।"

"আমাকে বলো নি কেন ?" রাজাবাহাদুর প্রায় চিৎকার করে ওঠেন।

অতনু চুপ করে থাকে।

রাজাবাহাদুর গর্জে ওঠেন, "কথা বলছ না কেন ? আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"আজ্ঞে, সাহস পাই নি।"

"ননসেন্স।" তাঁর কন্ঠস্বরে বিরক্তি। "সাহস পাইনি! কেন, আমি কি একটা বাঘ, যে কথাটা বললে তোমাকে খেয়ে ফেলতাম !"

অতনু নিরুত্তর। রাজাবাহাদুরও চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপরে কন্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলেন, "তুমি ভুল করেছো অতনু! রুণা আমার একমাত্র মেয়ে। তার জীবনের সুখ ও শান্তির চেয়ে আমার প্রেস্টিজ বড় নয়। তাছাড়া অরু তো ছেলে খারাপ নয়, তার মতো গুণী ছেলে ক'টা জন্মায় এ সংসারে ?"

অতনু এবারেও কোন কথা বলতে পারে না। কি বলবে সে? সত্যিই তো অরুণ ও বরুণার দিক ভেবে, একজন রাজকর্মচারী হিসেবেও কথাটা তার রাজাবাহাদুরকে বলা উচিত ছিল। সে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে।

"আচ্ছা, সে তো শুনলাম টাকা-পয়সা কিছু নিয়ে যায় নি, তাহলে বোধহয় পায়ে হেঁটেই যাচ্ছে কি বল ?"

অতনু ঘাড় নাড়ে।

রাজাবাহাদুর আবার বললেন, "গেছেও তো মাত্র শেষ রাতে। কতদূর আর যেতে পেরেছে এর মধ্যে? চারিদিকে লোকজন পাঠিয়ে দিয়ে একবার খোঁজ করলে কেমন হয় বল দেখি?"

"ভালোই হয়, খুব ভালো।" অতনু রীতিমত উৎসাহিত।

"তুমি তারই ব্যবস্থা করো! যেখান থেকে পারো, ছেলেটাকে ধরে নিয়ে এসো। সে আসতে না চাইলে, তাকে আমার কথা বলো। বলো, আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি।" একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলে ওঠেন, "আসুক হতভাগা, কি সাহস তার? আমাকে না বলে সে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়!"

শেষ পর্যন্ত রাজাবাহাদুর হার মানলেন। পাঁচ দিন ধরে বহু খোঁজাখুঁজি করেও অরুণকে পাওয়া গেল না। সে বুদ্ধিমান ছেলে—বোধহয় জানত যে তাকে খোঁজাখুঁজি করা হবে, তাই এমনভাবে গা-ঢাকা দিয়েছে যে কিছুতেই তার নাগাল পাওয়া গেল না।

আর আশ্চর্য মানুষ রাজাবাহাদুর। অতনু ছাড়া কেউ বোধহয় তাঁর মনের প্রকৃত অবস্থাটা টের পায় নি। বিয়ে-বাড়ি কাজকর্ম মুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয় নি। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে তিনি নিজে সবকিছু দেখা-শোনা করছেন। তাঁর আচার-আচরণে মনে হচ্ছে যেন অরুণের অন্বেষণটা একটা নেহাৎই মামুলি ব্যাপার, তার সঙ্গে বরুণার বিয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

এদিকে অভ্যাগতরা প্রায় সকলেই এসে গেছেন। প্রথম শ্রেণীর যাঁরা, তারা ঠাঁই পেয়েছেন রাজবাড়িতে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্য রাজবাড়ির সামনে, গোটা দক্ষিণ জুড়ে সারি সারি তাঁবু পড়েছে। নাটমন্দিরে বাসা বেঁধেছে নবদ্বীপের কীর্তনীয়া, চিৎপুরের অপেরা ও যাত্রা, ময়মনসিংহের কবিয়াল। বাগবাজারের থিয়েটারের দল এবং একজন জাদুকরও তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে। কলকাতা থেকে যে গোর্খা ব্যান্ড পার্টি এসেছে তাদের জন্য সেপাই মহলের একটা অংশ খালি করে দেওয়া হয়েছে। খেমটার নর্তকীরা কিন্তু গোলাপগঞ্জেই উঠেছে। স্থায়ী বাঈজীরা তাদের তদারকীতে ব্যস্ত। কালীবাড়ির চত্বরে মেলা বসেছে। ম্যাজিক, ক্যারিকেচার ও বাঁদরনাচ সমানে চলেছে। আয়োজন ত্রুটি-হীন কিনা অতনু জানে না। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকে অনুভব করতে বাধ্য হচ্ছে যে, রাজকুমারীকে সুখী করার জন্য রাজাবাহাদুর আয়োজনের ত্রুটি করছেন না।

শ্রান্ত অতনু শুয়ে পড়ে। কয়েকদিন বড়ই ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। তার জন্যও দুঃখ ছিল না, যদি অরুণকে খুঁজে পাওয়া যেত—যদি বরুণাকে সুখী করা যেত।

আজ বরুণার কথাই অতনুর বড় বেশি মনে পড়ছে। গত পাঁচ দিন দেখা হয় নি তার সঙ্গে। একে তো অতনু ব্যস্ত ছিল, তার ওপর বরুণা নাকি এ ক'দিন একদম নিচে নামে নি।

না। কান্নাকাটি করছে না সে। কালীতারা নাকি তার চোখে কখনও জল দেখে নি। সময় মতো স্নান-খাওয়া সবই করেছে। তবে কারও সঙ্গেই কথাবার্তা বলে না বড় একটা। নিজের ঘরে বসে সে একমনে একটা সোয়েটার বুনে চলেছে।

কথাটা শুনে চমকে উঠেছে অতনু। ভেবেছে—কার সোয়েটার? সেদিন এই ঘরে বসে বরুণা অরুণের গায়ের মাপ নিয়েছিল। বলেছিল—তোমার ফুল হাতার সোয়েটারটা ছিঁড়ে গেছে, এবারে তোমাকে আমি একটা সোয়েটার বুনে দেব।

ঠাট্টা করে অরুণ বলেছিল—তাতে আমার কি লাভ হবে? রাজকন্যের বোনা সোয়েটার, ওতো গায়ে দেওয়া যাবে না, মাথায় করে রাখতে হবে।

—বেশ, তাই রেখো। তাতেই তোমার শীত কমে যাবে। হাসতে হাসতে বরুণা জবাব দিয়েছিল।

আরও কত কথা আজ মনে পড়ছে অতনুর। মনে পড়ছে—সেই জবাবনের কথোপকথন। বরুণা বলছে—আমি যাকে ভালোবাসি, তাকে আমি পেতে চাই কাছে।

আর অরুণ বলছে—ভালোবাসার জনকে কাছে পেলেও কিন্তু সব সময় মানুষের দুঃখ ঘোচে না বরুণা! ভোগে যে শান্তি নেই। শান্তি পেতে হলে ত্যাগ করতে হয়। তাই আমরা দু'জনে বহুদূরে থেকে আমাদের বাসর রচনা করব। আমার সৃষ্টি তোমার ও আমার মাঝে মিলনের সেতু তৈরি করবে।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল অতনু। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কেউ কাঁদছে।

মিনারের ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। উৎসবের আগে প্রাসাদ বিশ্রাম নিচ্ছে। রাজকুমারীর জীবনকে আনন্দমুখর করে তুলতে যারা আনন্দের ডালি সাজিয়ে এনেছে, তারা শেষ বিশ্রাম নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে।

আর এক প্রহর! তারপরে শেষ হবে এ অসাড়তা। ঊষার আলো করতোয়ার বুকে আছাড় খেয়ে পড়ার আগেই শুরু হবে উৎসব—অহোরাত্র আনন্দোৎসব।

এ সময় কে কাঁদে? কে চোখের জলে রাজকুমারীর অমঙ্গল ডেকে আনছে? অতনু উঠে বসে।

অস্পষ্ট জোছনা। শিউলীতলায় একটি নারীমূর্তি! ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। অতনু হাস্নাহানার ঝোপের আড়ালে এসে দাঁড়ায়।

মেয়েটি অবসন্ন দেহে উঠে বসে। এবারে অতনু চিনতে পারে তাকে।

যার সুখের জন্য, শান্তির জন্য এই উৎসব—এত আনন্দের আয়োজন, সেই রাজকুমারী বরুণার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে শেফালিকা-জুঁই-বেল ও রজনীগন্ধার দল ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে! ম্রিয়মাণ অতনু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে রাজকুমারী উঠে দাঁড়ায়। শিথিল পদক্ষেপে বাগান থেকে বেরিয়ে যায়। অতনু নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে।

হাতিশালার পেছন দিয়ে, পায়রাঘরের পাশ কাটিয়ে, জুঁবন ছাড়িয়ে, অবশেষে রাণীদীঘির ঘাটে এসে দাঁড়ায় বরুণা। শাড়ীর আঁচলটাকে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বলে ওঠে, "ওগো তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না। পরপারে প্রতীক্ষা করবো।" একবার থামে বরুণা। দু-হাতে চোখ মোছে সে, তারপরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "ঠাকুমা তুমি আমাকে কোলে ঠাঁই দাও। আমিও শান্তির জন্য তোমারই মতো রাণী-দীঘির বুকে আশ্রয় নিলাম।"

লাফ দিতে যায় বরুণা। কিন্তু পারে না, অতনু পেছন থেকে ধরে ফেলে তাকে।

"কে?" বরুণা চিৎকার করে ওঠে।

"এ তুমি কি করছ বোন? আত্মহত্যা করে অরুণের এত বড় আত্মত্যাগকে তুমি কিছুতেই মূল্যহীন করে দিতে পার না। তোমার মৃত্যু অরুণের প্রতিভার অকালমৃত্যু ঘটায়, এই কি তুমি চাও?"

"না। কিন্তু আমি কেমন করে বাঁচব এই জ্বালা বুকে নিয়ে? আমার জন্য সে সম্বলহীন ও নিরাশ্রয়। আর আমি এই সুখে গা ভাসিয়ে দেব?"

"নিজেকে ধ্বংস করলেই কি তুমি অরুণের দুঃখ ঘোচাতে পারবে?"

বরুণা চুপ করে থাকে।

অতনু আবার বলে, "অরুণের জন্যই তোমাকে বাঁচতে হবে বোন! তুমি সুখী হলেই সে সুখী হবে। অরুণ বড় হবেই। তার বড় হবার পথে তোমার মঙ্গলকামনা অপরিহার্য। অরুণের জীবনকে ধ্বংস করার কোন অধিকার তোমার নেই। তোমার ভালোবাসায় তৃপ্ত হয়ে সে বৃহত্তর জীবনের পথ-পরিক্রমায় বেরিয়েছে। তুমিই বা কেন তার প্রেমকে সম্বল করে বেঁচে থাকতে পারবে না?"

"কিন্তু আমি কি নিয়ে বাঁচব বলতে পারো?"

"তার ভালোবাসা নিয়ে। অরুণের ভালোবাসাই তোমার বেঁচে থাকার প্রেরণা হবে বোন!"

পূর্বাঞ্চল ঊষার প্রথম পরশে নবারুণ রাগে রাঙা হয়ে উঠেছে।

॥ পনেরো ॥

বিয়ে বাড়ীর কল-কোলাহল এখনও পুরোমাত্রায় চলেছে। খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা যায় নি মিটে। বাজীর শব্দে কান ঝালাপালা! খানিকবাদেই বরকনে বাসরে যাবে।

সখী-পরিবৃতা হয়ে বসে আছে রাজকুমারী। তার চোখদুটি শুকনো, কিন্তু দৃষ্টিতে যেন কান্না ঝরছে। অতনু জানে, চোখে জল না থাকলেও মানুষ কাঁদতে পারে—বিবাহ-বাসরে বসে বরুণাও বোধহয় কাঁদছে।

মল্লিকাপুরের ভাবী জমিদার অমরপ্রসাদ বীরবেশে বাসরে বসে আছে। চোরাদৃষ্টিতে বরুণাকে দেখতে গিয়ে, তার ছেলে ও মেয়ে-বন্ধুদের নজর এড়াতে পারছে না। তাদের সঙ্গে সুজাতাও হাসি-হাসিতে যোগ দিচ্ছে। তবে মাঝে মাঝেই সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে কাউকে খুঁজছে।

আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না অতনুর। এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চায়। এখানে মন নেই, মান আছে। সুর নেই, গান আছে। প্রাণ নেই, মানুষ আছে।

অতনু উঠে দাঁড়ায়। সে বাগানের দিকে এগিয়ে চলে।

বিয়ের বাড়ির কলকোলাহলের অনেকখানি বাগানে পৌঁছায় না। বাগান থেকে বিবাহ-বাসর দেখাও যায় না। বাগানের নির্জনতায় অতনু নিজের মনো-মুকুরে নিজেকে দেখতে চায়। সে শিউলীতলায় এসে বসে। অরুণের বড় প্রিয় ছিল এ জায়গাটা। আজ অরুণ নেই।

না, সে আছে শিউলীতলার ধূলিকণায়, জুঁই বেল রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ সুবাসে, রাজবাড়ির আনাচে কানাচে, ফুলগঞ্জের পথে ও প্রান্তরে।

চুড়ির শব্দ শুনে পেছনে চাইতে গিয়ে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয় অতনু।

"অরুণ, মাই রোডিন! কার কথা ভাবছ? আমার কথা নিশ্চয়ই।" সুজাতার মুখে হুইস্কির গন্ধ।

জোর করে নিজেকে মুক্ত করে অতনু উঠে দাঁড়ায়! "আপনি ভুল করেছেন। আমি অরুণ নই।"

"কে তুমি?"

"এ বাড়ির একজন কর্মচারী। অরুণ এখান থেকে চলে গেছে।"

"চলে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"জানি না।"

"কবে আসবে ?"

"আর আসবে না।"

একটু চুপ করে থাকে সুজাতা। তারপরে মাতাল কণ্ঠে বলে, "যে যাবার সে যাক্। তবু আমার অভিসার তো ব্যর্থ হতে পারে না। আকাশে চাঁদ, বাতাসে শানাই, মাটিতে ফুল। মাটির তুমি আর মাটির আমি। জমিদার কন্যা ও কর্মচারী নয় পুরুষ ও প্রকৃতি।"

উন্মত্ত আকর্ষণে সুজাতা আবার অতনুকে জড়িয়ে ধরে। অতনু সুজাতার হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করতে থাকে। তার রঙ মাখানো উষ্ণ ঠোঁটদুটি অতনুকে বার বার দংশন করতে থাকে। প্রকৃতি পুরুষকে পিষে ফেলতে চায়।

"তবে রে মিনসে! আমি দোর খোলা রেখে বসে আছি। আর তুই বিয়ে করা ইস্ত্রীকে ফেলে অন্য মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করছিস? আজ তোর বিষদাঁত ভেঙে তবে আমি ছাড়ব।"

তাড়াতাড়ি অতনুকে ছেড়ে দেয় সুজাতা। অক্টোপাসের বন্ধন থেকে মুক্তি পায় সে। মুক্তিদাত্রীর নিখুঁত অভিনয়ে মুগ্ধ হয় অতনু। বুক অবধি ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে বকুলবাঈ।

অতনু নির্বাক।

বকুলবাঈ এবারে সুজাতাকে বলে, "কোন ভয় নেই দিদি! আর ও আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কি করব? আমারই অদিষ্ট। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই ওর জিবে নাল গড়ায়। এই রাস্তা দিয়ে আপনি চলে যান। আমি এখানে দাঁড়িয়ে রইলাম, দেখি ও আপনার কি করে?"

অবিন্যস্ত জামাকাপড় যথাসম্ভব সংযত করে ঘুরে দাঁড়ায় সুজাতা। তার টলায়মান দেহটা মিলিয়ে যেতেই মাটিতে বসে পড়ে বকুলবাঈ। অতনুর পায়ের ওপর মুখ লুকিয়ে বলে, "কসুর মাফ করো।"

অতনুও বসে পড়ে। বকুলবাঈয়ের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বলে, "শূর্পণখার হাত থেকে তুমি আজ আমাকে বাঁচালে জাবেদা! তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। আমার জন্য আজ তুমি যা করলে, তার প্রতিদান দেবার শক্তি আমার নেই।"

"কিন্তু আমি তো বেহেশ্তের হুরী নই, সাধারণ নারী। আমি যে প্রতিদান চাই। বল, তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।"

জাবেদার কথায় অতনু বিস্মিত হয়। গত পাঁচ বছর ধরে সে জাবেদাকে দেখে আসছে সংযমের প্রতিমূর্তিরূপে। আজ এই স্বপ্নময়ী চাঁদনী রাতে কি ওর সব সংযমের বাঁধ গেল ভেঙে?

কিন্তু অতনু সেকথা জিজ্ঞেস করে না জাবেদাকে। সে শুধু বলে, "তুমি তো জানো, তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই। বল, তুমি কি চাও?"

"তোমার মহব্বত।"

আবেশে অতনুর মাথা নত হয়। জাবেদা দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে। তাকে আরও কাছে টেনে নেয়। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস মেলে, অধরে অধর মিলিত হয়। দু'জনে দু'জনের জীবন-সুধাপান করে।

প্রহর বেড়ে চলে। চতুর্দশীর চাঁদ লুকিয়েছে মেঘের আড়ালে। রুপোলী জ্যোৎস্না গিয়েছে মিলিয়ে। আলো আর আঁধারের খেলা চলেছে ফুলগঞ্জের রমণীয় কাননে। কামনার মোহজাল নেমে এসেছে মাটির পৃথিবীতে।

সানাইয়ের মিঠে সুর কখন গিয়েছে থেমে। বিয়ে বাড়ির কলকোলাহল এসেছে কমে। শান্তি নেমে এসেছে ফুলগঞ্জে। শুধু ওরা দু'জনে ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছে।

তবু জাবেদা বলে, "আমার প্রতিদান আমি পেয়ে গেছি। আমি আর কিছু চাই নে।"

কিন্তু অতনু যুবক। অতৃপ্তির বেদনা তার মনে, আকণ্ঠ তৃষ্ণা তার বুকে, যৌবনের ক্ষুধা তার দেহে। কথায় মন মানে না, ছন্দে বুক ভরে না. সুরে ক্ষুধা মেটে না। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় সে আর একবার জাবেদাকে দেখে – মোহময়ী জাবেদা। এত কাছে তবু সে তাকে পেতে চায় আরও কাছে—একান্ত আপন করে।

আজ আর জাবেদার বাহুডোর শিথিল হয় না। আজ সে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয় নিজেকে। বন্ধন আরও নিবিড় হয়। মিলেমিশে দু'জনে এক হয়ে যায়।

॥ ষোল ॥

"ভায়া। চেষ্টাই সার। হিসেব আর মিলবে না। আসল তলিয়ে গেছে। এবারে তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গোটাও। লেখা-পড়া জানো, এখনও বয়স আছে। যাহোক্ একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারবে। আমাদেরই হয়েছে মুস্কিল।"

একবার থামলেন গোপালবাবু। ফতুয়ার পকেট থেকে একটা চুরোট বের করে অতনুর দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করেন, "আমি তোমাকে লিখে দিতে পারি, এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এ যাবেই।"

"কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস কেমন জিনিস জানি না। তবে আপনারা থাকতে আমিও পাততাড়ি গুটাচ্ছি না।" অতনু উত্তর দেয়।

"বেশ নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারো। পরে কিন্তু এই বুড়োটাকে দোষ দিও না যেন। খবর পেলাম রহমতপুর নিলাম হয়ে গেছে। এইভাবে এক এক করে বারোটা মহলের সাতটাই হাতছাড়া হয়ে গেল।"

"কেন এমন হল বলুন তো ?"

"কেন আবার—দেনা। রাজকুমারীর বিয়ের সময় দু'বছরের মেয়াদে পঞ্চাশ হাজার টাকায় বন্ধক রাখা হয়েছিল রহমতপুর। মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা শোধ দেওয়া হয়েছে। আরও সময় চাওয়া হয়েছিল। এস্টেটের অবস্থা দেখে কোর্ট রাজী হয় নি।"

অতনু হতবাক হয়ে যায়। গত সাত বছর যাঁর মুখে শুধু হাসি দেখেছে, আজ কি তাঁর চোখে জল দেখতে হবে ?

বাইরে অশ্বখুরধ্বনি শোনা গেল। সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। একটু বাদেই রসিকলাল ভেতরে ঢোকে। তার কাঁধে একটা বস্তা—বেশ ভারী মনে হচ্ছে।

হন্তদন্ত হয়ে বীরেশ্বরবাবু সেরেস্তায় প্রবেশ করেন। রসিকলাল বস্তাটা নামাতে চায়।

ম্যানেজার বাধা দিয়ে বলেন, "এখানে নয়। একেবারে আমার বাংলোয় নিয়ে যা।"

রসিকলালের পিছনে বীরেশ্বরবাবুও বেরিয়ে যান সেরেস্তা থেকে।

সকলেই নির্বাক। একটু বাদে গোপালবাবু অতর্কিতে গেয়ে উঠলেন—

'পদ-রত্ন ভান্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারী ॥...'

গান থামালেন গোপালবাবু। তারপরে নির্বাক অতনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুঝলে ভায়া। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।"

"বস্তায় কী আছে ?" অতনু প্রশ্ন করে।

"যা না থাকলে পৃথিবীটা গতিহীন হয়ে যেত। দখল দেবার আগেই রহমতপুর কাছারীর সিন্দুক খালি করে আনা হয়েছে। আর সেই খালি করা মাল চলে গেল ম্যানেজারবাবুর খাস কামরায়।"

"কেন ?" অতনু জিজ্ঞেস করে।

গোপালবাবু বিরক্ত হন। বলেন, "না, তোমার আর বুদ্ধি-সুদ্ধি কোন কালে হবে না দেখতে পাচ্ছি। এতকাল ফুলগঞ্জে থেকেও জানতে পারলে না যে আমাদের ম্যানেজারবাবু কামিনী ও কাঞ্চন দু'টোকেই বড় বেশি ভালোবাসেন।"

"কিন্তু এ টাকা তো পাওনাদারের। তাদের না দিয়ে যদি নিয়ে আসাই হয়, তাহলে তা রাজাবাহাদুরকে দিয়ে দেওয়া উচিত।"

"মোটেই উচিত নয়। কারণ পাওনাদারের প্রাপ্য বলে রাজাবাহাদুর যে টাকায় হাত দেন নি, সেই টাকা ম্যানেজারবাবু নিয়ে এসেছেন। সুতরাং এ টাকা তাঁরই প্রাপ্য।"

অতনু উত্তর দেয় না। সে চুপ করে থাকে।

গোপালবাবু আবার বলেন, "তুমি বোধহয় আরেকটা খবর শোনো নি।"

"কি খবর বলুন তো ?"

"এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এ গেলে বীরেশ্বরবাবুই বোধহয় সরকারী ম্যানেজার হবেন।"

"সেকি !" অতনু বিস্মিত। বলে, "তার মতো একটা মাতাল দুশ্চরিত্র ও অসৎলোক হবে সরকারী ম্যানেজার ?"

"ঐ গুণগুলো রয়েছে বলেই তো তিনি কর্তৃপক্ষের মন গলাতে পেরেছেন।'

আলোচনাটা হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলত। কিন্তু বাধা পড়ে। কালী-তারা এসে খবর দেয়, "বল্‌বাবু, রাণীমা আপনাকে ডাকছেন।"

বল খেলা অতনুর বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় দু'বছর। আর্থিক অসুবিধের জন্য রাজাবাহাদুর টিম তুলে দিয়েছেন। তবু অনেকে এখনও তাকে ওই নামেই ডাকে।

কালীতারার সঙ্গে অতনু আসে রাণীমার খাস কামরায়। রাণীমা বলেন, "কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমিই একমাত্র আছ এ পাপ পুরীতে, যাকে ভরসা করে এ কাজটা দিতে পারি।" আদেশ নয়, রাণীমার কন্ঠে অনুরোধ।

"বলুন কী করতে হবে।" অতনু জিজ্ঞেস করে।

"তোমাকে একবার মল্লিকাপুরে যেতে হবে। অনেকদিন মেয়েটাকে দেখি নি। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। তাকে নিয়ে আসবে সঙ্গে করে।" একবার থামলেন রাণীমা। তরেপর একটি কাপড়ের থলি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা অমরের হাতে দিয়ে বলবে, আমার আর কিছু নেই।"

মেয়েকে দেখার জন্য জামাইকে দর্শনী পাঠাচ্ছেন মা।

বিচিত্র এক সমাজে এসে আশ্রয় নিয়েছে অতনু। টাকার ওজনে এখানে স্নেহের ওজন। অর্থহীন মায়া-মমতার কোন মূল্য নেই এ সমাজে। ফুলগঞ্জের অবস্থা পড়ে এসেছে। রাজাবাহাদুর জামাইকে নিয়মিত ভেট পাঠাতে পারছেন না। ফলে মেয়ের বাপের বাড়ি আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই রাণীমা নিজের শেষ সম্বল পাঠাচ্ছেন জামাইকে। মেয়েকে একবারটি দেখার জন্য সর্বস্ব হারাচ্ছেন তিনি।

তবু অতনু তাঁকে বাধা দিতে পারে না! সে নীরবে থলিটা হাতে নেয়। তারপরে নত হয়ে প্রণাম করে রাণীমাকে। তাঁকে ভরসা দেয়, "আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি বরুণাকে নিয়ে আসব সঙ্গে করে।"

কৃতজ্ঞতায় মায়ের চোখদুটি সজল হয়ে ওঠে। অতনু আর সেখানে দাঁড়াতে সাহস করে না। তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসে আস্তাবলে। ঘোড়ার বন্দোবস্ত করে ফিরে চলে নিজের ঘরে।

রাজবাড়িতে নয়, রাজকর্মচারীর কোয়ার্টার্সে—অতনুর নিজের ঘরে, জাবেদার ছোট্ট সংসারে। এক বছরের ওপর হল অতনু সংসারী হয়েছে।

হ্যাঁ, অতনু বিয়ে করেছে। শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু হয়ে, সে একজন অবাঙালী মুসলমান বাঈজীকে বিয়ে করেছে। ফুলগঞ্জের সমাজ ও তার পরিবারের তরফ থেকে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। বন্ধুরা বলেছিল—কি দরকার সামাজিক বন্ধনের মধ্যে গিয়ে। মেয়েটাকে তোমার ভালো লেগেছে, বেশ তো থাকো না তাকে নিয়ে—যতদিন ইচ্ছে হয় 'এনজয়' করো।

অতনু অত্যন্ত ঘৃণায় সঙ্গে তাদের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য বকুলবাঈও প্রায় একই কথা বলেছিল। বলেছিল—আমার কিসমতে অত সইবে না। আমি তোমার পত্নী হবার দুঃসাহস করি না। তুমি আমাকে উপপত্নীর মর্যাদা দিও।

অতনু রাজী হয়নি। কিন্তু এই সঙ্কল্পের জন্য রাজাবাহাদুর তাকে তারিফ করেছিলেন। শেষটায় যখন উভয়ের ধর্ম নিয়ে সমস্যা দেখা দিল, তখনও রাজাবাহাদুরেই সমাধান করে দিয়েছিলেন। পন্ডিত ও পীরদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে তিনি আদেশ দিয়েছিলেন—ওদের দু'জনের কাউকেই ধর্মত্যাগ করতে হবে না। ধর্ম ওদের ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে থাক্। আমি সদর থেকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে ডাকিয়ে আনছি। তিনিই ওদের মিলিত-জীবনের শুভ-সূচনা করে যাবেন।

বীরেশ্বরবাবু প্রশ্ন রেখেছিলেন—ওরা তাহলে কোন সমাজের মানুষ হবে, হিন্দু না মুসলমান?

—কোনটাই নয়। রাজাবাহাদুর বলেছিলেন। হিন্দু বা মুসলমান কোন সমাজেই ওরা আশ্রয় চাইবে না। ওরে গড়ে তুলবে এক নতুন সমাজ—ভবিষ্যতের মানব-সমাজ।

সুতরাং অতনু আজও হিন্দু, জাবেদা আজও মুসলমান তবে ওরা দু'য়ে মিলে এক নতুন জীবন—একটি শান্তির নীড়।

রাণীমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অতনু ফিরে আসে সেই নীড়ে। কড়ানাড়ার শব্দ শুনে জাবেদা দরজা খোলে। অসময়ে অতনুকে দেখে অবাক হয় সে। জিজ্ঞেস করে, "এত তাড়াতাড়ি ওয়াপস এলে যে।"

"তোমাকে না দেখে আর থাকতে পারলাম না।" অতনু সহাস্যে উত্তর দেয় সে ঘরে ঢোকে।

দোর বন্ধ করে দিয়ে জাবেদা জিজ্ঞেস করে, "সাচ্?"

"হ্যাঁ। সত্যি বৈকি! তাই তো তোমাকে দেখার জন্য কাজকর্ম ফেলে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম।"

"খোদা মেহেরবান।" জাবেদা একবার ওপর দিকে তাকায়। বোধহয় খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ দেবার ভান করে। তারপরে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলে, "কেন যেন আমারও আজ অকেলা আচ্ছা লাগছিল না। ভাবছিলাম একটা গল্পের আদমী মিললে আচ্ছা হয়। তাই তো খোদাতাল্লা তোমাকে টেনে

এনেছেন। আজ বহুতদিন বাদ আমরা আবার দিনভর গল্প করব—সিফ' আমাদের দু'জনের গল্প।"

অতনু প্রমাদ গণে। বাধ্য হয়ে সত্যি কথাটা বলতে হল জাবেদাকে। সে হয়তো মনে মনে একটু দুঃখ পায়। কিন্তু মুখে বলে; "তাহলে আর দেরি করো না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, অনেকটা পথ। কি করে যাবে, গাড়িতে?"

"না। ড্রাইভার নেই। ঘোড়ায় যেতে হবে।"

"রাজকুমারী যদি আসেন?"

"পাল্কীতে নিয়ে আসব।"

"কিন্তু ড্রাইভার নেই কেন?"

"ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবারে বোধহয় গাড়িও বেচে দিতে হবে।"

"সত্যি, বহুত খারাপ লাগছে এই দুরবস্থা দেখতে। মামুলি এক মোটর গাড়ি রাখার সামর্থ্য নেই রাজাবাহাদুরের!" জাবেদার কন্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে।

"কি করবে বলো, অতনু বোধহয় স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে চায়, "আমাদের ভাগ্যও যে রাজাবাহাদুরের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।"

"ওকথা বলো না।" জাবেদা যেন সহজ হয়ে উঠতে চাইছে, "আমার মতো কিসমত ক'জনের হয়? জানো মাঝে মাঝে আমার মনে হয় রাজকুমারীর বিয়েতে রাজাবাহাদুর লাখ লাখ টাকা খরচ করলেন, কিন্তু তিনি সুখী হতে পারলেন না। অথচ দেখ, সেই বিয়ের রাতেই আমাদের প্রথম মিলন হল। আজ আমি ··আমার চেয়ে সুখী কেউ নেই।"

"তাই বুঝি তুমি একটি দিনের জন্যও আমাকে চোখের আড়াল করতে পারো না?" অতনু সহাস্যে প্রশ্ন করে।

জাবেদা জবাব দেয় না। কেন যেন সে সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। সে চুপ করে থাকে।

অতনু এগিয়ে আসে তার কাছে। সে জাবেদার একখানি হাত ধরে। স্নিগ্ধ স্বরে বলে, "কথা বলছ না যে?"

জাবেদা আর সামলাতে পারে না নিজেকে। তার দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে।

অতনু তাকে কাছে টেনে নেয়। তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। জাবেদা অতনুর বুকে মুখ লুকোয়।

একটু বাদে অতনু জিজ্ঞেস করে "তুমি কাঁদছ কেন জাবেদা?"

"আনন্দে।"

"সত্যি?"

"হুঁ।" জাবেদা মুখ তোলে।

অতনু চুপ করে থাকে।

জাবেদা স্বাভাবিক স্বরে বলতে শুরু করে, "সত্যি, এমন খুশীর দিন যে আমার জীবনে আসতে পারে, তা দু'বছর আগেও ভাবতে পারি নি। খোদার মেহেরবানী, তিনি আমার বচপনের স্বপ্ন এভাবে সত্যি করে তুললেন। তাই জানো, আজ আমার কারও ওপর আর এতটুকু গুস্সা নেই। বরং আজ সবাই আমার ইমানদার—বিশেষ করে আবদুল, রতন ও কমলবাঈ। তারা আমাকে বাঈজীর জীবনে টেনে নামিয়েছিল বলেই, আমি আজ তোমার কাছে উঠে আসতে পেরেছি!" একবার থামে সে। তারপরে হঠাৎ বলে ওঠে, "মাঝে মাঝে বহুত ডর হয়—এত সুখ, এত শান্তি কি আমার কিস্মতে সইবে?"

"তোমাকে কতটা সুখী করতে পেরেছি, আমি জানি না জাবেদা! তবে একটা কথা তোমাকে আগেও বলেছি, আজও বলছি—আমি তোমার, চিরকাল তোমারই থাকব।"

"আমি তা জানি গো, জানি। তাই তো একটি দিনের তরে তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারি না। রোজ আমি খোদাতাল্লাকে বলি—খোদা ওকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাইনে—বেহেশ্তেও না।" আর কিছু বলতে পারে না জাবেদা। তার চোখ দু'টি আবার অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে—তার কণ্ঠ বুঝি বা বাক্রুদ্ধ।

॥ সতেরো ॥

এই সেই বরুণা? অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। দু'বছরে যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। সেই ছেলেমানুষীর রেশটুকুও আজ আর অবশিষ্ট নেই। অসম্ভব রোগা হয়ে গেছে। কপোলদ্বয় কোটরাগত। চোখ-দু'টি কান্নায় আরক্ত। রাজাবাহাদুর যাকে সোনা দিয়ে মুড়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছিলেন, তার দেহ আজ অলঙ্কার শূন্য।

শুকনো একটু হেসে বরুণা জিজ্ঞেস করে, "বাবা কেমন আছেন?"

"ভালো।"

"মা?"

"তাঁর শরীরটা ভালো নয়, তাই তিনি তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"পারবে কি নিয়ে যেতে?"

"চেষ্টা করব।"

"দেখো।" একবার থামে বরুণা। তারপরে জিজ্ঞেস করে, "অন্য সবাই কে

কেমন আছেন? বামুনপিসী?…" আরও একজনের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চুপ করে যায় সে।

"অন্য সবাই ভালোই আছেন। কিন্তু বামুনপিসী…তিনি আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন।"

"কবে!" প্রায় কেঁদে ওঠে বরুণা।

অতনু শান্ত স্বরে জবাব দেয়, "প্রায় এক বছর আগে।"

"কি হয়েছিল?"

"লিউকোমিয়া। একেবারে শয্যাশায়ী হবার আগে বলেন নি কাউকে। সময় মতো টের পেলে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একটা চেষ্টা করতে পারতাম।"

"সে এসেছিল?"

"না। আমরা তো অরুণের ঠিকানা জানি না।" অতনু কোনমতে জবাব দেয়। "মাঝে মাঝে সে বামুনপিসীকে চিঠি দেয়। কিন্তু কোন চিঠিতেই নিজের ঠিকানা জানায়নি।"

"হতভাগ্য সন্তান!" চোখ মুছে বরুণা বলে, "বাবার সঙ্গে এ জন্মে সাক্ষাৎ হল না, শেষ সময় মায়ের মুখেও একফোঁটা জল দিতে পারলে না।"

অরুণকে ভোলে নি বরুণা। কেমন করে ভুলবে? তাকে কি ভোলা যায়?

অতনু আর কিছু বলার আগেই ঘরে ঢোকে অমর। ছোট ছোট চোখ দুটির কোলে কেউ যেন এক পোঁচ কালি বুলিয়ে দিয়েছে। দেহটা আরও সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। চিৎকার করে ওঠে অমর, "আপনি? তাই তো বলি, বীরেশ্বরকাকা এলে তো রাজকন্যে এতক্ষণ তার কাছে থাকতেন না। আমারই বোঝা উচিত ছিল, এমন কেউ এসেছেন, যার কাছে থাকতে সুন্দরীর ভাল লাগে।"

ইঙ্গিতটা হজম করে স্মিতহাস্যে অতনু বলে, "বাপের বাড়ির কেউ এলে মেয়েরা স্বাভাবিক ভাবেই একটু খুশী হয় অমরসাহেব।"

"সবার বেলায় নয়, বিশেষ কেউ এলে। কিন্তু ছেলে হয়ে জন্মে যে বাপের বাড়ির মর্যাদা বুঝলাম না।"

"ছেলেদের বেলায় সে মর্যাদার অংশীদার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা।" হাসতে হাসতে অতনু বলে, 'আমি আসায় আপনারও আনন্দিত হওয়া উচিত।"

"সেই আশা নিয়েই বুঝি এসেছো?" পরিহাসে অংশ গ্রহণ করতে চায় বরুণা।

"বেশ তো", অমর সঙ্গে সঙ্গে বলে, "চলুন না এক হাত ফ্লাশ হয়ে যাক্। সেই সঙ্গে পরখ করে দেখবেন, হুইস্কির সঙ্গে কতটা রাম পাঞ্চ্ করলে মৌজটা সবচেয়ে জোরালো হয়।"

অতনু বিচলিত হয়। তবু সে ভুলে যায় না, রাণীমা তাকে যে কাজে পাঠিয়েছেন, তা এখনও শেষ হয়নি।

বরুণা নির্বাক।

থলিটি অমরের হাতে দিয়ে অতনু বলে, "এইটে রাণীমা আপনাকে দিয়েছেন। আর বলেছেন, যদি আপনাদের অসুবিধে না হয়, তাহলে বরুণাকে কয়েকদিনের জন্য ফুলগঞ্জে নিয়ে যাব। মায়ের মন! একমাত্র সন্তানকে বহুদিন দেখেন নি। দয়া করে অনুমতি দিলে বাধিত হব।"

শেষের কথাগুলি বোধকরি অমরের কানে ঢোকে না। ওজন পরীক্ষা করে থলিটি খুলে ফেলে। জিজ্ঞেস করে, "কত আছে?"

"বলতে পারি না। যেমনটি দিয়েছেন, তেমনটি আপনার হাতে দিয়েছি।"

"সরান নি কিছু?" অতনুর দিকে আড়চোখে তাকায় অমর।

"আজ্ঞে না।" নীরবে অপমানটা হজম করে অতনু।

"সে কি? সেরেস্তায় কাজ করেন আর তছরূপ করেন নি?"

"এ তো সেরেস্তার তহবিল নয় অমরসাহেব! শাশুড়ী জামাইকে পাঠিয়েছেন এ থেকে তছরূপ করি কেমন করে? কর্মচারী হলেও আমরা মানুষ। নরকের ভয় আমাদেরও আছে।"

"আছে বুঝি?"

অতনু কোন উত্তর দেয় না! আর অমরেরও বোধহয় তার প্রয়োজন নেই। কারণ সে ততক্ষণে টাকা গুনতে আরম্ভ করেছে। অতনু ও বরুণা নিঃশব্দে তাকে দেখতে থাকে।

গোনা শেষ হল। ক্ষেপে যায় অমর, "মোটে সাত হাজার চারশো? আপনার রাণীমাকে তো আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলাম, দশ হাজারের কম হবে না।"

অতনু চুপ করে থাকে।

অমর আবার বলে, "এদের বেলায় দেখছি সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। তবে আপনি দূত। আপনাকে কিছু বলা বৃথা। আপনি খাওয়া-দাওয়া করুন। কাল আপনার সুবিধে মতো ফিরে যান। বরুণা যাবে না। একমাত্র জামাইকে যে শ্বশুর দশ হাজার টাকা দিতে চায় না, তার বাড়িতে আমার স্ত্রী পা দেয় না।"

থলিটা নিয়ে অমর বেরিয়ে যায়। বরুণা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। কান্নায় ভেঙে পড়ে। বলে, "দাদা, একদিন তুমি আমাকে আত্মহত্যার থেকে বাঁচিয়েছিলে, আজ এই আত্মনিগ্রহের হাত থেকে বাঁচাও। আমি যে আর পারছি নে। আমাকে ফুলগঞ্জে নিয়ে চলো। সব সময় টাকা, টাকা আর টাকা। রোজ আমার বাপের বাড়ি থেকে হাজার হাজার টাকা আসবে, এদের মদের বিল শোধ দিতে। বাবার আশীর্বাদী হীরের আংটিটা পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছে। দিতে চাই নি বলে, দেখো কি করেছে।" বরুণা তার কনুইয়ের ঘা-টা অতনুকে দেখায়।

অতনু চমকে ওঠে। কিন্তু কোন কথা বলতে পারে না। কি বলবে? সে শুধু নীরবে ভেবে চলে বরুণার কথা। আড়াই লাখ টাকার বিনিময়ে বাবা মেয়েকে সুখী করতে চেয়েছিলেন। আজ এক বছর তিনি মেয়েকে দেখতে পান নি। সাড়ে সাত হাজার টাকা ভেট পাঠিয়েও শাশুড়ী জামাইয়ের মন ভেজাতে পারেন নি। তবু অতনু ভাবে, মেয়েকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কি করে?

বিকেলে চা খাবার সময় হঠাৎ সুজাতা এসে হাজির হয়। তার দিকে তাকাতে পারে না অতনু। সে লজ্জা পায়। কিন্তু সুজাতার সহজ ও স্বাভাবিক কথাবার্তায় তার আড়ষ্টতা কেটে যায়। তাছাড়া সে জানে সুজাতা বিয়ে করেছে বছর দেড়েক আগে। স্বামী কাঠের ব্যবসা করে। মধ্যপ্রদেশে থাকে। সেখানকার নির্জনতায় সে নাকি হাঁফিয়ে উঠেছিল। একটু দম নিতে এসেছে।

"কেমন আছো?" সুজাতা জিজ্ঞেস করে।

'ভালো। তুমি?" অতনু পাল্টা প্রশ্ন করে। ইচ্ছে করেই 'তুমি' বলে।

সুজাতা খুশি হয়। কিন্তু অতনুর প্রশ্নের উত্তর দেয় না। সে পাল্টা প্রশ্ন করে, "তোমার সেই সতীসাধ্বী স্ত্রী কেমন আছে?"

জাবেদার হাসিভরা মুখখানি অতনুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে উত্তর দেয়—"ভালোই।"

"আমি এখানে রয়েছি শুনেও সে তোমাকে এ বাড়িতে আসতে দিলে?"

"সে জানে, তুমি তোমার স্বামীর কাছে।" একটু হাসতে চায় অতনু।

"বেচারা!" সুজাতার সুরে করুণা। সে অতনুর চেয়ারের হাতলে বসে পড়ে। বলে, "এখন মিস্টার পাকড়াশীর পার্টনার হয়ে টেনিস খেলার কথা ছিল, আমি যাই নি। কেন জানো?"

"হ্যাঁ।"

"বল দেখি।"

"আমি এসেছি বলে!"

সহসা অতনুকে বাহুপাশে বন্দী করে সুজাতা। বলে, "আজ রাতে দাদা স্পেশাল 'বলে'র আয়োজন করেছে। দাদার বন্ধুরা সব এসেছে। কিন্তু ওদের সঙ্গে আমি অনেক নেচেছি। আজ তুমি এসেছ। তোমাকে তো আর রোজ-রোজ পাব না।" একবার থামে সে, "জানো, অনেক চেষ্টা করে দেখেছি সেন্টিমেন্ট জিনিসটাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। দাদার বিয়ের সেই রাতটা কিছুতেই ভুলতে পারি নি। তোমার ওপর আমার সেই 'অ্যাট্রাকশান'টা এখনও রয়ে গেছে। ওদেরও আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু তোমাকে যেন আরও ভালো লাগে।"

অতনুর দম বন্ধ হয়ে আসছে। উগ্র মদের গন্ধে তার মাথা ঝিমঝিম

করছে। তবু ওর শ্যাম্পু করা চুলগুলো নিজের মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে অতনু বলে, "তোমার বৌদিও নাচে ?"

"আগে চাইত না। এখন আর আপত্তি করে না। দাদার চাবুকের চোটে রাজকুমারীর জিদ কমেছে।"

"আজও নাচবে ?"

"হ্যাঁ, দাদার সাহেববন্ধু নিকল্‌সনের সঙ্গে আজ নাচতে হবে ওকে।"

অতনুকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুজাতা। বলে, "এখন যাই। রাতে আসব। দরজা খোলা রেখো কিন্তু।"

"রাখব, যদি তুমি আমার একটা কথা রাখো।" অতনু চেপে ফেলে।

"কী ?" সুজাতা ঘুরে দাঁড়ায়।

"সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বরুণাকে নিয়ে একবার তোমাকে এ ঘরে আসতে হবে। আমি ওর সঙ্গে নিভৃতে কয়েকটা কথা বলতে চাই। কি কথা, তা কিন্তু তোমাকেও বলব না।

"না বললে, আমার বয়েই গেল।" একটু থামে সুজাতা। তারপরে বলে, "কাজটা বড্ড শক্ত। তবে তুমি যখন বললে, চেষ্টা করব বৈকি। দেখি 'বল্‌' থেকে ফিরে এলে, নিয়ে আসতে পারি কি না। তখনই সুবিধে। দাদার কোন হুঁশ থাকবে না।"

সুজাতা বেরিয়ে যায়। অতনু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সে তার কর্তব্য ঠিক করে ফেলে। যেভাবেই হোক বরুণাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করতে হবে। এমন স্বামীর সংসার করার কোন প্রয়োজন নেই তার। আর সুজাতাকে দিয়েই সে কাজটি গোছাতে হবে।

ডিনারের সময় হয়ে গেছে, কারও সাড়াশব্দ নেই। অতনু সেই একই কথা ভেবে চলেছে—আড়াই লাখ টাকা খরচ করে রাজাবাহাদুর তাঁর আদরের মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়েছিলেন। এই সেই শ্বশুর বাড়ি, এই সেই বরুণা।

"বাঁচাও, বাঁচাও। কে আছ ? আমাকে বাঁচাও।"

নারীকণ্ঠের একটা আর্ত চিৎকার। অতনু তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে আসে।

সিঁড়ি দিয়ে বরুণাকে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নামাচ্ছে অমর। তার কপাল কেটে রক্ত ঝরছে। ফুলগঞ্জের রাজকুমারীর রক্তে সিক্ত হচ্ছে মল্লিকাপুরের জমিদারবাড়ি। দু'জন দাসী সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা উপভোগ করছে।

"আজকের দিনটা তুমি আমাকে রেহাই দাও। দাদা এসেছে। সে এসব দেখে যাক্, এ আমি চাই না। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।" বরুণা অমরের পা জড়িয়ে ধরতে চায়।

অমর একটা লাথি মেরে পা সরিয়ে নেয়। তারপরে চিৎকার করে ওঠে,

"অনেক দিন চাবুক পড়ে নি। আজ আবার দেখ্ কেমন লাগে।"

বরুণার হাত ছেড়ে দিয়ে, বাঁ হাত থেকে হাণ্টারটা ডান হাতে নেয় অমর।

"মেরো না, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এমন করে তিলে তিলে মেরো না। তার চেয়ে খানিকটা বিষ এনে দাও। আমি তোমাদের সব জ্বালা জুড়িয়ে দিই!"

আর স্থির থাকতে পারে না অতনু। সে ছুটে অমরের সামনে এসে দাঁড়ায়। কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "এ সব কি করছেন? কোথায় নিয়ে চলেছেন ওকে?"

"সে কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হবে স্কাউণ্ড্রেল!"

অতনু কিছু বলতে পারার আগেই শাড়ীটাকে কোনরকমে গায়ে জড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় বরুণা। মিনতি জানায়, "দাদা, তুমি আমাকে এই পশুর হাত থেকে বাঁচাও। আমি যে আর সইতে পারছি না।"

"কি বললি? পশু?" গর্জে ওঠে অমরপ্রসাদ। সজোরে হাণ্টার চালায় বরুণার পিঠে। চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রাজকুমারী।

অতনু সিংহের মত লাফিয়ে পড়ে অমরের ওপর। খেলোয়াড়ের প্রথম ঘুষিতেই কাহিল হয় পতিদেবতা। সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে একতলায় পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।

দাসী দু'জন চিৎকার শুরু করে দেয়। দ্রুতপায়ে অতনু বরুণার কাছে এসে তাকে হাত ধরে তোলে। ব্যস্তকণ্ঠে বলে, "এই মুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে বোন।" পড়ে থাকা হাণ্টারটা হাতে তুলে নেয় সে।

নিচে নেমে আসতেই কয়েকজন দাস-দাসী তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়।

"আর এগোলেই হাণ্টার চালাব।" অতনু বাঘের মতো গর্জে ওঠে।

ভয় পেয়ে পথ ছেড়ে দেয় ওরা।

নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছিল ঘোড়াটা। বরুণাকে তার পিঠে চাপিয়ে দেয় অতনু। লাগামটা গাছের গুঁড়ি থেকে খুলে নিয়ে নিজে উঠে বসে। দাস-দাসীরা ততক্ষণে মরা-কান্না জুড়ে দিয়েছে। কেউ বোধহয় উত্থানশক্তি-রহিত অসিতপ্রসাদকেও কথাটা জানিয়ে থাকবে। তিনি দোতলায় শুয়েই হাঁক-ডাক শুরু করেছেন।

বিদ্যুৎগতিতে ফুলগঞ্জ রাজবাড়ির আরবী-ঘোড়া মল্লিকাপুর জমিদারবাড়ির ফটক পার হয়। জোর কদমে ছুটতে থাকে। সুগম রাজপথ দিয়ে নয়, দুর্গম সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে।

বরুণা এখনও থরথর করে কাঁপছে। বাঁ হাতে লাগাম নিয়ে ডান হাতে তাকে কাছে টেনে নেয় অতনু। বলে, "ভয় কি বোন? এতদিন তোমাদের নিমক খেয়েছি। আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।"

॥ আঠারো ॥

শেষ পর্যন্ত শেষরক্ষা হলো না। অতনু অনেক চেষ্টা করেছে সময় নেবার। কিন্তু মাড়োয়ারী মহাজন সত্তর হাজার টাকা নিয়ে সময় দিতে সম্মত হন নি।

কেনই বা হবেন? চৌরঙ্গী রোডের ওপরে এত বড় বাড়িটা দু'লাখ টাকার বিনিময়ে বাজেয়াপ্ত করতে পারলে ছেড়ে দেবেন কেন? ভাড়া দিলেও মাসে হাজার পাঁচেক টাকা পাওয়া যাবে।

বাড়িটা অবশ্য রাজাবাহাদুর বড় একটা ব্যবহার করতেন না। তবু কলকাতার এই একমাত্র সম্পত্তি তিনি হাত-ছাড়া করতে চান নি। তাই রাজভাণ্ডারের শেষ সম্বল সত্তর হাজার টাকা দিয়ে অতনুকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন।

কিন্তু মাড়োয়ারী হুন্ডিওয়ালা দয়া করেন নি। ওঁরা তো দয়া করার জন্য লোটা-কম্বল সম্বল করে বাংলা মুলুকে আসেন নি। ওঁরা এসেছেন কারবার করতে। দয়া করতে বসলে যে কারবারে লালবাতি জ্বলবে—যেমন জ্বলেছে ফুলগঞ্জে। অতএব অতনুর দৌত্য বিফল হয়েছে।

ট্রাম-বাসে উঠতে ভাল লাগছে না অতনুর। মনটা ভারী হয়ে উঠেছে। ফুলগঞ্জে গিয়ে সে টাকাটা কেমন করে ফিরিয়ে দেবে রাজাবাহাদুরকে? কেমন করে বলবে যে চৌরঙ্গী-প্রাসাদের দরজা আপনার সামনে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে!

চৌরঙ্গী রোড ধরে ধীরে ধীরে উত্তরে এগিয়ে চলেছে অতনু। অনেকদিন বাদে সে এবার কলকাতায় এসেছে। তবু আজ কলকাতাকে মোটেই ভালো লাগছে না তার। কেবলই মনে হচ্ছে কলকাতা বড় স্বার্থপর।

ফুটপাতে যেন কিসের একটা জটলা। ভিড় এড়াতে নেমে আসে অতনু। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে। সহসা নজর পড়ে জটলার দিকে। চমকে ওঠে অতনু! সে থমকে দাঁড়ায়।

একজন দীর্ঘদেহী যুবক ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে জনৈক পথচারীর ছবি আঁকছে। শিল্পীর মাথার চুল এলোমেলো, মুখ ভর্তি খোঁচাখোঁচা দাড়ি, গায়ের পাঞ্জাবীটা ছেঁড়া।

অতনু ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসে। শিল্পীর সামনে এসে উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করে, "কে?..."

শিল্পীর হাত থেমে যায়। সে মুখ তুলে তাকায়।

"কে?" অতনু আবার প্রশ্ন করে, "অরুণ না?"

"হ্যাঁ!" শিল্পী কাগজ পেন্সিল পাশের লোকের হাতে দিয়ে আনন্দে

চিৎকার করে ওঠে, "অতনুদা' আপনি!" অরুণ জড়িয়ে ধরে অতনুকে। "কেমন আছেন দাদা?"

"ভালো।"

বোধহয় চারিদিকের জনসমাবেশের কথা মনে পড়ে অরুণের। সে ছেড়ে দেয় অতনুকে। তারপরে বলে, "আপনি একটু দাঁড়ান। আমি এই ভদ্রলোকের ছবিটা শেষ করে দিই, এখুনি হয়ে যাবে।"

"বেশ তো। তুমি কাজ শেষ কর।" অতনু অপেক্ষা করার আশ্বাস দেয়।

মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই ছবিটা শেষ হয়ে যায়। ভদ্রলোককে ছবিখানা দিয়ে অরুণ কিছু পয়সা নেয়। তারপরে কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের থলিটায় কাগজ-পেন্সিল ভরে নিয়ে অতনুকে বলে, "চলুন। কোথায় উঠেছেন?"

"বহুবাজারে—আমার সেই পুরনো মেসে।" অতনু উত্তর দেয়।

"চলুন, আমিও যাব।"

"বেশ তো চলো।" অতনু অরুণের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে।

কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরবে পথ চলে। অতনু ভাবে অরুণের কথা। আর অরুণ?

অরুণ সহসা প্রশ্ন করে, "ফুলগঞ্জের খবর কি?"

"ভালো নয়। এস্টেটের অবস্থা খারাপ—যে কোনদিন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস-এ চলে যেতে পারে।"

"কেন?"

"দেনার জন্য।"

অরুণ একটু কাল চুপ করে থাকে। তারপরে আবার প্রশ্ন করে, "মামা, মামী, বকুলদি, ছায়া, মোড়ল, কেষ্টদা···রুণা ও মা—সবাই ভালো আছে তো?" এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে অরুণ।

সে অতনুর দিকে তাকায়।

অতনু উত্তর দিতে পারে না।

অরুণ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। সে চলা বন্ধ করে। বলে ওঠে, "মা··মা কেমন আছে অতনুদা?"

এবারেও অতনু একটু ইতস্তত করে। তারপরে ধীরস্বরে উত্তর দেয়, "বামুনপিসী নেই অরুণ।" সে অরুণকে সামলাবার জন্য প্রস্তুত হয়।

কিন্তু অরুণ কাঁদে না। কোন কথাই বলে না সে।

অতনু আবার বলে, "প্রায় একবছর হয়ে এলো বামুনপিসী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।"

"কি হয়েছিল?" শান্তস্বরে অরুণ জিজ্ঞেস করে।

"লিউকোমিয়া।" একবার থামে অতনু, "কোথা থেকে যে রোগটা এলো!···"

অরুণ নিঃশব্দে পথ চলেছে। কেবল মাঝে মাঝে হাত দিয়ে চোখ দুটি মুছে নিতে হচ্ছে তাকে। অশ্রু যে বড়ই অবাধ্য।

একটু বাদে সে যেন নিজেকেই বলে ওঠে, "ভালোই হলো। মুক্তি চেয়েছিলাম, মা আমাকে মুক্তি দিয়ে গেলেন। আমার আর কোন বন্ধন রইল না।" আকাশের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে মাকে প্রণাম জানায় অরুণ। দুঃখিনী মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে অযোগ্য সন্তান।

অরুণকে নিয়ে মেসে আসে অতনু। ঘরে ঢুকেই অরুণ তার ক্লান্ত দেহটা অতনুর বিছানায় এলিয়ে দেয়। বলে ওঠে, "কতদিন বাদে আবার এমনি নরম বিছানায় গা লাগালাম। সত্যি বড্ড আমার লাগছে। ফুটপাতে আর রেলস্টেশনে শুয়ে শুয়ে গায়ে কড়া পড়ে গিয়েছে।"

"বেশ তো তুমি বিশ্রাম কর। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।"

"ওঃ! আপনার এখানে তো বাথরুম আছে। আমি আজ একটু সাবান মেখে ভালো করে স্নান করব অতনুদা! বহুদিন ভাল করে স্নান করতে পারি না। রাস্তার কলে কি ঠিক স্নান হয়?"

আহত কণ্ঠে অতনু প্রশ্ন করে, "একটা মেস-টেসে থাকার ব্যবস্থা করছ না কেন?"

"সামর্থ্য নেই বলে।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় অরুণ। একটু হেসে বলে, "ছবি আঁকার সরঞ্জামই জোগাড় করে উঠতে পারি না, মেসে থাকব কেমন করে?"

"আমি যদি এই মেসে একটা ব্যবস্থা করে দিই?"

একটু হাসে অরুণ। তারপরে প্রশ্ন করে, "তার মানে আপনি আমার খাওয়া-থাকার খরচ দিতে চাইছেন?"

অতনু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তবু সে বলে, "হ্যাঁ। মানে যতদিন তোমার সামর্থ্য না হয়।"

"তা হয় না অতনুদা'! আমি স্বেচ্ছায় এই জীবন বেছে নিয়েছি। এ আমার জীবনসংগ্রাম, আমাকে এ সংগ্রাম করতে দিন!"

"কিন্তু এই ভাবে পথে পথে ছবি এঁকে, তুমি কি পারবে সে সংগ্রামে জয়লাভ করতে?"

"পারতেই হবে। আমাকে বাঁচতে হবে এবং বড় হতে হবে। রুণাকে কথা দিয়েছি—আমি বড় হব। আমি বড় না হলে যে আমার মায়ের অমর আত্মা শান্তিলাভ করবে না অতনুদা!"

অতনুকে নীরব থাকতে দেখে অরুণ আবার বলতে শুরু করে, "পথে পথে ছবি এঁকে খাওয়া-পরা জোগাড় করা কষ্টকর সন্দেহ নেই, তবে এতে প্রচুর আনন্দও আছে। আমি জীবনকে জানতে পারছি, মানুষকে জানতে পারছি—প্রতিদিন কত বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাচ্ছি।"

"কি রকম ?"

"এই ধরুন মাত্র দিন কয়েক আগে একজন ভারী মজার খদ্দের পেয়েছিলাম। ভদ্রলোক বললেন, পনেরো মিনিটের ভেতর তাঁর একখানি ছবি এঁকে দিতে পারলে তিনি আমাকে পাঁচ টাকা দেবেন! আগে শেষ করতে পারলে প্রতি মিনিটের জন্য এক টাকা করে বেশি দেবেন। ব্যস, আমি জোর হাত চালিয়ে ন' মিনিটেই শেষ করে দিলাম। ছবিখানা ভদ্রলোকের পছন্দও হল। তিনি তাঁর কথা রাখলেন, আমাকে এগারোটি টাকা দিয়ে দিলেন। সাত টাকা দিয়ে আঁকার সাজ-সরঞ্জাম কিনলাম। বাকি চার টাকায় এক মাসের খাওয়া-খরচ হয়ে গেল।"

খেতে বসে অরুণের আর আনন্দ ধরে না। সে ছেলেমানুষের মতো করতে থাকে। বার বার বলে—ফুলগঞ্জ ছাড়ার পর এত ভালো খাবার আমার ভাগ্যে আর জোটে নি।

অতনু ব্যথা পায়। শিল্পীর ভবিষ্যৎ-চিন্তা তাকে আবার বিচলিত করে তোলে। কিন্তু অরুণ যে তার কোন সাহায্যই নেবে না।

অসহায় অতনু তাই বার বার তার জীবন-দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়—ঠাকুর, অরুণের এই সাধনাকে তুমি সার্থক করে তোলো। এতবড় প্রতিভাকে তুমি মাটিতে মিশিয়ে দিও না। মানুষের কাছ থেকে সে যেন তার সৃষ্টির স্বীকৃতি পায়, মানুষকে ভালোবেসেই যে অরুণ আজ পথে নেমে এসেছে।

নরম বিছানায় শুয়েও অরুণ কিন্তু ঘুমোতে পারছে না। তবু অতনু চুপ করে থাকে।

একটু বাদে কথা বলে অরুণ। অতনুকে জিজ্ঞেস করে, "অপনি কি ফুলগঞ্জে ফিরে গিয়ে আমার এই কষ্টের কথা সবাইকে বলবেন ?"

"বলব বৈকি!" অতনু উত্তর দেয়। "তুমি কষ্ট করছ, আর সেকথা বলব না!"

"না, অতনুদা! প্লিজ, আমার কষ্টের কথা কাউকে, বিশেষ করে রুণাকে কখনও বলবেন না। একথা শুনলে, সে যে বড্ড কষ্ট পাবে।"

অতনু চুপ করে থাকে।

অরুণ আবার বলে, "আমাকে এই সামান্য কষ্টটুকু করতে দেখে, আপনি এমন উতলা হচ্ছেন কেন! এই তো ভারতের জীবন-দর্শন।"

অতনু নীরব। অরুণ বলে চলে, "ভারতের জীবন-দর্শন পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শন থেকে পৃথক। তাই ভারতের সন্ন্যাসীরা হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে গিয়ে সাধন-ভজন করেন। ভারতের রাজা বিশাল সাম্রাজ্য ও অগাধ ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হয়েও শিল্পী কবি ও গায়কের চরণ বন্দনা করেন। ভারতের বণিক য়ুরোপের বণিকদের মতো দূর-দূরান্তরে সাম্রাজ্য বিস্তার করেই তুষ্ট থাকেন নি। তাঁরা সেই নতুন দেশের মানুষের কাছে ভারতের ধর্ম ও আদর্শ প্রচার করেছেন।

সেখানকার জন-জীবনে ভারতের সঙ্গীত ও শিল্পকলার বিকাশসাধনার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন।"

আর চুপ করে থাকা ভালো দেখায় না। তাছাড়া আলোচনাটাও অন্য খাতে বইতে শুরু করেছে। তাই অরুণ থামতেই অতনু প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, তুমিও কি হরপ্পা ও মহেনজো-দারোকেই ভারতীয় শিল্পকলার সূতিকাগার মনে কর?"

"নিশ্চয়ই। 'The clear and coherent conceptions of plastic art which confront us for the first time at Harappa and Mohenjo-daro are undoubtedly the culmination of artistic traditions of centuries.' ঐ দুটি স্থানের ভাস্কর্য শিল্প নিঃসন্দেহে ভারতীয় শিল্পকলার জনক। তাই René Grousset যখন মহেনজো-দারোর মৃৎশিল্প নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তখন মন্তব্য করেছেন—"it may well foreshadow the whole art of Indian sculpture, from the *capitals* of Asoka to the *ratha* of Mahavalipuram."

"তুমি এসব কথা জানলে কোথা থেকে?" বিস্মিত অতনু প্রশ্ন করে।

একটু হেসে উত্তর দেয় অরুণ, "এইটেই কলকাতার সুবিধে অতনুদা! কিছু জানার বা শেখার আন্তরিক ইচ্ছে থাকলে এখানে তা অপূর্ণ থাকে না।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "আমি যে সময় পেলেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে চলে যাই। কিন্তু আমার কথা থাক্, মহেনজো-দারোর কথায় ফিরে আসা যাক্। মহেনজো-দারোর শিল্পীদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা সমসাময়িক মিশর বা বেবীলনের শিল্পীদের মতো, 'monumental art' নিয়ে ব্যস্ত থাকেন নি। তাই সেখানে রাজপ্রাসাদ বা স্মৃতিস্তম্ভ আবিষ্কৃত হয় নি। আবিষ্কৃত হয়েছে সাধারণের স্নানাগার, শস্যভাণ্ডার, বাড়ি-ঘর ও রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি। এ থেকেই মনে হয় যে পাঁচ হাজার বছর আগেও ভারতীয় শিল্পকলা জনসেবার বাহন ছিল।"

"এই আদর্শকেই আমি আমার শিল্প-সাধনার ধারক করে তুলতে চাই অতনুদা। কিন্তু এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য আমাকে যেতে হবে ভারতীয় শিল্পকলার সেই সূতিকাগারে। যেতে হবে অজন্তা-ইলোরা সিংগানপুর মিরজাপুর ও হোশাংগাবাদে—দেখতে হবে সেখানকার প্রাগৈতিহাসিক গুহাশিল্প। যেতে হবে আগ্রা দিল্লী খাজুরাহো মাউন্ট-আবু এবং দক্ষিণ ভারত উড়িষ্যা ও বাংলার মন্দিরে মন্দিরে।"

"তার মানে তুমি ভারত পর্যটনে বেরুতে চাইছ?" অতনু প্রশ্ন করে।

অরুণ উত্তর দেয়, "হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে আমাকে গয়া গিয়ে মায়ের শেষ কাজটুকু করে নিতে হবে।"

"টাকা-পয়সা ছাড়া তুমি কেমন করে এ আশা পূর্ণ করবে?"

"অতনুদা!" অরুণ বলে, "স্বামী বিবেকানন্দ তো কপর্দকহীন হয়েও সারা

ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। আমিও তেমনি ভাবেই আমার এ আশা পূর্ণ করব।"

অতনু চুপ করে থাকে।

অরুণ সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "আচ্ছা অতনুদা, আপনি তো রুণার কোন খবরই দিলেন না। সে কেমন আছে?"

অরুণের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই অতনু সভয়ে এই প্রশ্নটির প্রতীক্ষা করেছে। এবারে বিপদে পড়ে সে। কি বলবে অরুণকে? কেমন করে জানাবে, যার শান্তির জন্য অরুণের এই কৃচ্ছ্রসাধনা, শ্বশুরবাড়িতে দু' বছর ক্রমাগত চাবুক খেয়ে, সে এখন বাপের বাড়ি পালিয়ে এসেছে।

অতনুকে নিরুত্তর দেখে অরুণ বলে, "অমরকে আমি মাত্র একদিন কয়েক মিনিটের জন্য দেখেছি। তবু আমার ধারণা রুণার সঙ্গে তার মনের মিল হওয়া কঠিন।"

"তোমার ধারণা মিথ্যে নয়।" এবারে অতনু কথা বলে।

"আমারই হয়তো ভুল হয়ে গেছে।" একবার থামে অরুণ, তারপরে যেন নিজেকেই বলে, "মামাকে কথাটা জানালে হয়তো এ রকম হতো না।"

"কোন্ কথা?"

"আমি জানতাম ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রয়োজনেই বীরেশ্বরবাবু রুণার বিয়ে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তখন কি একটা দুর্বলতা যেন আমার চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তাই অন্য কোন কথা না ভেবে আমার যে ফুলগঞ্জ ছাড়া দরকার, এটাই সেদিন বড় বলে মনে হয়েছিল। কাউকে কিছু না বলে আমি চলে এসেছি ফুলগঞ্জ থেকে।"

"বরুণার থেকে দূরে থাকবে বলেই কি তুমি সেদিন পালিয়ে এসেছিলে?"

"না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে। চেয়ে থাকে নক্ষত্রখচিত কৃষ্ণপক্ষের কালো আকাশের দিকে। তারপর অরুণ আবার বলতে শুরু করে—

লাটসাহেবের থেমটার আসর থেকে বেরিয়ে অরুণকে তার ঘরে পায় না বরুণা। সে বাগানে আসে। শিউলীতলায় বসে অরুণ তখন কেদারা রাগে বাঁশী বাজাচ্ছিল। মাঝে মাঝে বাজীর শব্দে সে সুর মিলিয়ে গেলেও হারিয়ে যাচ্ছিল না। সহসা অরুণের উদাস দৃষ্টিভরা চোখদু'টি দু'খানি কোমল হাতের আবরণে ঢাকা পড়ে যায়।

অতি পরিচিত স্পর্শ। এত রাতে তার কাছে বরুণা?

অরুণের বাঁশী থেমে যায়। মনে পড়ে একদিন ছিল, যখন এমন সময় তারা হাত ধরাধরি করে ছাদে ঘুরে বেড়িয়েছে। ঠাকুরমার ঝুলির রাজকন্যেদের কাহিনী অরুণের গলা থেকে বরুণা গিলেছে। তারপর বছর কেটেছে। বয়স বেড়েছে। পার্থক্য এসেছে। সেদিনের শিশুমন দু'টি আজ অধিকার অনধিকারের প্রশ্নে ভারাক্রান্ত। বীরেশ্বরবাবু রাজকুমারীকে মল্লিকাপুরের

মেমসাহেব করতে বদ্ধপরিকর। পথের কাঁটা অরুণকে তিনি সরিয়ে ফেলতে চান। রাজকুমারীর সম্ভ্রম ও শান্তি রক্ষা করা যে অরুণের নৈতিক কর্তব্য, এ কথা বহুবার বহুজনের মুখে তাকে শুনতে হয়েছে।

বাঁশীটি পাশে রেখে অরুণ বলে—এমন দুঃসাহস তুমি কেন করলে রুণা?

দোলা লাগে শিউলীগাছে। কয়েকটি ফুল ঝরে পড়ে। অরুণের কোলে মাথা রেখে শিউলী ছাওয়া ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে বরুণা। অরুণের একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে—না করে উপায় নেই বলে।

—এজন্য কি মূল্য দিতে হতে পারে জান?

—হ্যাঁ। তবু না এসে পারলাম না। আজ পাঁচ দিন তোমাকে দেখি নি। তুমি তো বাঘ মেরেই খুশি। এদিকে আর একজন যে তোমার কথা ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে, সেদিকে হুঁশ নেই। শিকার থেকে এসে মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত একবার দেখা করলে না। আশা ছিল, তখন দু'চোখ ভরে তাকে একবার দেখবো, সে বয়সে সবচেয়ে ছোট হয়েও সবচেয়ে বড় কাজটি করে এল।

—আমার জন্য তোমার ভারী ভাবনা, না রুণা?

—উঁহুঁ। একটুও না।

—তবে?

—আচ্ছা। তোমার গুলিটা যদি ফস্কে যেত, তাহলে? বরুণা হঠাৎ অন্য প্রশ্ন করে বসে।

হেসে অরুণ বলে—গুলি ফস্কাবে কেন?

—বাঃ। লক্ষ্য বুঝি ভুল হয় না।

—না রুণা। আমি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হই না।

গরবিনী বরুণা সোহাগভরা বাহুযুগল দিয়ে অরুণকে জড়িয়ে ধরে তার কোলে মুখ লুকোয়। অরুণ তার মাথায় স্নেহভরা পরশ বোলাতে থাকে।

খানিকক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তারপর কোমলকণ্ঠে অরুণ বলে—রুণা! ওঠ লক্ষ্মীটি। অনেক রাত হলো।

—হোক্ গে। দূর্বা ছাওয়া, শিশির ভেজা শেফালীভরা, আমার এই বাসর-শয্যা। বিহঙ্গের প্রভাতী কূজন শুরু না হলে, এ শয্যা ছাড়তে নেই, জানো না বুঝি?

কি বলবে ভেবে পায় না অরুণ। তার চিন্তার খেই হারিয়ে যায়।

উৎসব-মত্ত প্রাসাদ। যাত্রা হচ্ছে, বাঈজী নাচছে, বাজী ফুটছে। কিন্তু শিউলীতলা যেন আরেক জগৎ। উৎসবের আলোর এখানে আঁধার কাটে নি। এখানে রাজকন্যা তার দয়িতের কোলে মুখ রেখে পূর্বাচলের দিকে চেয়ে আছে। এক সময় ঊষার আলোয় সব আঁধার ঘুচে যাবে।

সহসা হাস্নাহানার ঝোপের পেছন থেকে একটা আলো জ্বলে উঠেই নিভে যায়। 'ক্লিক' শব্দটা অরুণের কানে আসে। অন্ধকারেও পলায়মান লোকটিকে

চিনতে কষ্ট হয় না অরুণের। বরুণার জন্য দুশ্চিন্তা হয় তার। কিন্তু সে চিন্তাকে আমল না দিয়ে অরুণ নির্মল আকাশের দিকে তাকায়।

ভাবে—সপ্ত ঋষি সাক্ষী রইল তাদের এই মালিন্যহীন অভিসারের। প্রাসাদের চক্রান্ত ওদের স্পর্শ করতে পারবে না। ভুল বোঝাতে পারবে না আকাশের ঐ শুকতারাকে—সে যে ওদের দু'জনকে আশীর্বাদ করছে। ভালোবাসা যে কামনাহীন হতে পারে, হতে পারে নিঃস্বার্থ, পারে মানুষকে মহীয়ান করে তুলতে, তা তারা বহুবার দেখেছে ঐ আকাশের বুক থেকে। আর জানে—হাস্নাহানার মাতাল সুবাস, জানে জবা, জুঁই বেল ও রজনীগন্ধা। আর জানে বিশ্বের বেদনার বোঝা বওয়া এই হলুদবৃন্ত শেফালিকা।

অরুণের কাহিনী শেষ হয়। অতনু চুপ করে থাকে। চারিদিকে অসাড় নীরবতা।

একটু বাদে বরুণই সে নীরবতার অবসান করে। বলে, "আপনার বোধ-হয় মনে আছে, আমি যে রাতে ফুলগঞ্জ ছেড়ে চলে আসি, সেদিন সন্ধ্যের সময় রসিকলালকে দিয়ে বীরেশ্বরবাবু আমাকে তাঁর বাংলোয় ডেকে পাঠান। সামনের চেয়ারটায় বসতে ইশারা করে তিনি অতর্কিতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—

—তুমি বরুণাকে ভালোবাস?

—হ্যাঁ।

—তাকে সুখী করতে চাও?

—চাই বৈ কি।

—সাবাস। এই তো চাই। একেই তো বলে সত্যিকারের ভালোবাসা। আমি জানতাম বরুণার সুখের জন্য, তুমি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। একবার থামেন তিনি। তারপরে বলেন—তোমাকে ফুলগঞ্জ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

—কবে?

—আজ রাতেই—কাউকে কিছু না জানিয়ে। পথ খরচা বাবদ হাজার-খানেক টাকা পাবে। এ ছাড়া কিছু মাসোহারাও পাবে এই এস্টেট থেকে।

—ঘুষ দিচ্ছেন?

—না। বোকা মেয়েটার ভুলের খেসারত দিচ্ছি।

—ভেবে দেখলাম এখন আমার চলে যাওয়াটা উচিত হবে না। অরুণ স্থির কণ্ঠে বলে।—আমি রুণার বিয়ে পর্যন্ত এখানেই থাকব।

এবার মুখোশ খোলেন বীরেশ্বরবাবু। কর্কশ স্বরে বলে ওঠেন—ভেবে-ছিলাম ভাল কথায় রাজী হবে। শোন, সেদিন রাতে তুমি ও রাজনন্দিনী যখন রাসলীলায় ব্যস্ত ছিলে, তখন আমি তোমাদের ফটো তুলে নিয়েছি। তুমি আজ রাতে ফুলগঞ্জ ছেড়ে চলে না গেলে, বিয়ের পর আমি সেই ফটো অমর-

প্রসাদকে দেখাবো। বুঝতে পারছ, তারপরে বরুণার আর এ জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব হবে না ?

চমকে উঠলাম। রুণাকে এই কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করাই আমার একমাত্র কর্তব্য। তাকে সুখী করতে হবে। বললাম—আমি রাজী। আর কোনদিন ফুলগঞ্জের মাটিতে পা দেব না। কিন্তু আমারও একটি দাবী আছে।

—কী ? এক হাজারে হবে না, এই তো ? বেশ কত চাও ?

—টাকা আমি চাই না। আমাকে নেগেটিভ সহ সেই ফটোটা ফিরিয়ে দিতে হবে।

বীরেশ্বরবাবু কড়িকাঠের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর সিন্দুক থেকে দু'খানি প্রিন্টেড কপিসহ নেগেটিভটা বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—তোমার দাবী মেনে নিলাম। এবারে আমার শর্ত তুমি রক্ষা করবে, এটুকু বিশ্বাস তোমাকে আমি করি।

ফটো দু'খানির ওপর চোখ বুলিয়ে বুকপকেটে রেখে দিলাম। সেই থেকে রুণা আমার বুকের মাঝেই বাসা বেঁধে আছে—চিরকাল তাই থাকবে।"

পাশের ঘরের লোকজনের কথাবার্তায় অতনুর ঘুম ভেঙে যায়। সকাল হয়ে গেছে। প্রভাতী সূর্যের মিঠে রোদে ঘর ভরে গিয়েছে! অতনু উঠে বসে।

অরুণ নেই। বাথরুমের দরজা খোলা। গেল কোথায় ? ওর কাপড়ের থলিটা র‍্যাকেটে ঝুলছে না। পরনের পাঞ্জাবি ও পায়জামাটা অতনু কাল সাবান দিয়ে কেচে যেখানে শুকোতে দিয়েছিল, রেলিংয়ের সে অংশটাও ফাঁকা। ওকে পরতে দেওয়া অতনুর ধুতিখানা সযত্নে র‍্যাকেটে রাখা। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একখানি কাগজের দিকে নজর পড়ে অতনুর। সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে কাগজখানি হাতে নেয়। একখানি চিঠি—

"অতনুদা,

না বলে চলে যাওয়ার অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভের এখনও অনেক বাকি। রুণাকে কথা দিয়েছি, আমি বড় হব। আমি বড় হলে সে সুখী হবে। তাকে সুখী করতেই হবে। আমার বিশ্বাস আছে আমি তা পারব। কিন্তু ফুলগঞ্জের কথা মনে হলেই বড় দুর্বল হয়ে পড়ি। ফুলগঞ্জের মাটিতে আর কোন দিন পা দিতে পারব না, একথা ভাবতেও কষ্ট হয়। তা হলেও উপায় নেই। রুণার সুখের জন্য আমার সেখানে যাওয়া বারণ।

আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে সুখ ও দুঃখ দুই-ই এত বেশি পেলাম যে, কিছুদিন বাইরে না ঘুরলে মন শান্ত হবে না। তাছাড়া মায়ের শেষ কাজটুকুও যে করা দরকার। তাই গয়াতে মায়ের কাজ করে বেরিয়ে পড়ব ভারত-পর্যটনে। মৃতপ্রায় ভারতীয় শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার

সাধনায় ভারতদর্শন অপরিহার্য।

ফুলগঞ্জের কেউ আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আমি ভালো আছি। রুণাকে জানাবেন, তার সুখের জন্য আমার জীবন-দেবতার কাছে আমি প্রতিদিন প্রার্থনা জানাই।

ইতি

স্নেহপ্রার্থী অরুণ।"

॥ উনিশ ॥

দোতলায় উঠে চমকে ওঠে অতনু। সে থমকে দাঁড়ায়—অমরপ্রসাদ!

রাজাবাহাদুরের পায়ের কাছে বসে আছে বরুণা। তাঁর সামনে একখানি চেয়ারে অমরপ্রসাদ। পাশে কালো কোট পরে একজন ভদ্রলোক—অনল বাগচী, সদরের নামজাদা উকিল। ফুলগঞ্জের হয়ে তিনি অনেক মামলা লড়েছেন। আজ বোধহয় বিপক্ষে।

অতনু ফিরে চলে। বরুণা বাধা দেয়, "দাদা তুমি চলে যেও না, সেদিন যে তুমিই এই অভাগী বোনকে উদ্ধার করে এনেছিলে। আজ তোমাকেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার এই সমস্যার সমাধান করে দিতে হবে।"

"মিস্টার বাগচী! এই সেই শয়তান। ওর চোখদুটো উপড়ে ফেলতে পারলে আমার জ্বালা মেটে।" অমরপ্রসাদ বলে ওঠে।

"অমর!" রাজাবাহাদুরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তিনি গর্জে ওঠেন।

"জ্বালা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, জানি না অমরসাহেব! তবে আমার চোখের বিনিময়ে আপনি যদি বরুণাকে নিষ্কৃতি দেন, তাহলে এই মুহূর্তে আমার চোখদুটি আপনাকে উপহার দিতে পারি।" অতনু হাসতে হাসতে বলে।

অমর কোন জবাব দেয় না। সে রাগে ফুলতে থাকে। বাগচীমশাইও অস্বস্তি বোধ করছেন।

খানিক বাদে অতনু রাজাবাহাদুরকে বলে, "আপনার অনুমতি পেলে আমি একবার অমরসাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখতাম।"

"বেশ তো। দেখো চেষ্টা করে।" নির্লিপ্তভাবে রাজাবাহাদুর অনুমতি দেন।

"তুমি ভেতরে যাও বোন! দেখি ভাইয়ের কর্তব্য পালন করতে পারি কি না।"

সজল চোখে অতনুর দিকে তাকিয়ে বরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অতনু

এসে অমরের পাশের সোফায় বসে। তারপরে জিজ্ঞেস করে, "বলুন, আপনি কি চান।"

"আমার আইনসম্মত স্ত্রীকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবো।"

"যদি সে না যায় ?" অতনু প্রশ্ন করে।

"আইনের সাহায্য নেব।" অমর উত্তর দেয়।

"কিন্তু তাতে তো আপনার কোন সুবিধা হবে না—বরুণা সাবালিকা। তাছাড়া প্রয়োজন হলে আপনার স্বামিত্বের পরিচয়-পত্রগুলো বরুণা জজসাহেবকে দেখাতে দ্বিধা করবে না। চাবুকের সব দাগগুলো এখনও মিলিয়ে যায় নি।"

"তাহলে আমরা আর সময় নষ্ট করব না। রাজাবাহাদুর!" বাগচীমশাই উঠে দাঁড়ান. "আদালতেই দেখা হবে। অমরসাহেবও আমাকে সেই কথাই বলেছিলেন। তাহলেও ভাবলাম, আপনার মেয়ে—কাঠগড়ায় দাঁড়াবে ? তাই একটা আপোসের আশায় অমরসাহেবকে ধরে এনেছিলাম। তার দাবীও সামান্য। মাত্র এক লাখ টাকা। বাঈজীদের পেছনে লাখো লাখো টাকা ঢেলেছেন। নিজের মেয়েকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে এ ক'টা টাকা দিতে রাজী হবেন না — একথা আমি ভাবতেই পারিনি।"

"বসুন বাগচীমশাই। বহুদিন বাদে এত কষ্ট করে ফুলগঞ্জে পদধূলি দিলেন। একটু মদ মুখে না দিয়েই চলে যাবেন ?" থামলেন রাজাবাহাদুর। তিনি যেন, জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠেছেন। ইশারায় অতনুকে কাছে ডাকেন, তার কানে কানে জিজ্ঞেস করেন, "ওরা টাকা নিয়েছে ?"

"না।" অতনু নতমস্তকে জবাব দেয়।

কিন্তু রাজাবাহাদুর যেন খুশি হন। প্রশ্ন করেন, "টাকাটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

রাজাবাহাদুর অমরের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন "আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পারি অমর।"

"তাই দিন।" অমর যেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সে দরাদরি না করেই অর্ধেক দামে রাজী হয়ে যায়।

"উহুঁ। এখানে নয়।" রাজাবাহাদুর মৃদু হেসে অমরকে নিরস্ত করেন, "আদালতে যেতে হবে তোমাকে। তুমি স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে বরুণাকে ত্যাগ করছ, আর কোনদিন তার ওপর তোমার কোন দাবি থাকবে না—এই কথা এফি-ডেভিট করে দিতে হবে।" একটু থামলেন রাজাবাহাদুর। তিনি তাকালেন মিস্টার বাগচীর দিকে। তারপরে বললেন, "আপনি তো আদালতেরই বাসিন্দা। আপনাকেও একটু কষ্ট করে আপনার মক্কেলের পক্ষে একটা সাপোর্টিং এফি-ডেবিট করতে হবে।"

মিঃ বাগচী মাথা নাড়েন।

"টাকাটা কবে পাবো?" অসহিষ্ণু স্বরে অমর বলে।

"এখুনি হলে সুবিধা হয়, না?" রাজাবাহাদুর আরেকটু হাসেন, "কিন্তু আজ নয়। সোমবার আদালতে এফিডেভিট দু'খানির বদলে অতনু তোমাকে টাকাটা দেবে। কিন্তু একটা শর্ত আছে।"

"কী?" অমর কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

"তুমি আর কোনদিন আমার সামনে আসতে পারবে না। আজ থেকে আমি মনে করব আমার জামাই মরে গেছে।" ক্রোধ নয়, রাজাবাহাদুরের চোখে ঘৃণা।

ঘরে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে আসে।

একটু বাদে রাজাবাহাদুর স্বাভাবিক স্বরে বলেন, "তারপর বাগচীমশাই, আপনার প্র্যাকটিস কেমন চলছে? আজ তো বেশ ভালো দাঁও মারলেন। কতো দেবে?"

"কি যে বলেন রাজাবাহাদুর!" বাগচীর মুখে যেন নববধূর লজ্জা।

"ঠিক কথা।" রাজাবাহাদুর আবার শুরু করেন, "আপনি বলছিলেন আমি বাঈজীদের পেছনে লাখো লাখো টাকা খরচ করেছি। খুব সত্যি কথা। তবে একথা আরও সত্যি, সে খরচ শুধু আপনার মতো সমাজ-সেবী শিক্ষিত চরিত্রবান ও সম্মানিত মহাজনকে উপযুক্ত সম্মান দেবার জন্য। আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে, দেবীগাঁওয়ের সেই চরের মামলায় আমাকে জিতিয়ে আপনি যখন গোপনে আপনার অন্তরের বাসনাটুকু ব্যক্ত করেছিলেন, তখন ঠিক এখানে, এই চেয়ারে বসে আমি মালতীবাঈয়ের নামে একটা চিরকুট লিখে আপনাকে দিয়েছিলাম। সে রাতে গোলাপগঞ্জ প্রাসাদে মালতীবাঈ আপনাকে খুশি করে আমার লাখো-লাখো টাকার সদগতি করেছিল।"

গতকাল বরুণার বিবাহিত জীবনের যতি পড়েছে। অতনু আদলতে গিয়ে দু'খানি এফিডেভিটের বিনিময়ে অমরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে এসেছে।

অতএব আজকের দিনটি আনন্দের দিন। কিন্তু আজও ফুলগঞ্জ বড়ই নিরানন্দ। আজ যে জজকোর্টে বড় মামলাটার শুনানী হচ্ছে। বীরেশ্বরবাবু খুব সকালেই কাগজপত্র নিয়ে সদরে চলে গেছেন। আজ আদালতে ফুলগঞ্জের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। তাই আজ সেরেস্তা বন্ধ।

গভীর উদ্বেগ নিয়ে অতনু সারাদিন ঘরে শুয়ে আছে। জাবেদা এখন রান্নাঘরে। অতনু একা। শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবছিল সে—কলকাতার কথা, ফুলগঞ্জের কথা, তার বাবার কথা, রাজাবাহাদুর, রাণীমা ও বরুণার কথা, জাবেদা ও ছায়ার কথা এবং তার নিজের কথা।

সহসা হন্ত-দন্ত হয়ে জাবেদা ঘরে ঢোকে। চিৎকার করে বলে, "ওদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কি হয়েছে?" অতনু আঁতকে ওঠে।

জাবেদা জানায়, "এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এ চলে গেছে।"

"কে বললে?" অতনু উঠে বসে।

"এইমাত্র গোপালবাবুর ছেলে রাজবাড়ি থেকে এলো।"

"আমি তাহলে একবার যাচ্ছি।" অতনু খাট থেকে নেমে চটি পায়ে দেয়।

"একটু দাঁড়াও।" জাবেদা অনুরোধ করে।

অতনু জাবেদার দিকে তাকায়। সে বলে, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব। চট্ করে শাড়ীটা পালটে নিচ্ছি।"

রাজবাড়ি তো নয়, যেন মৃত্যুপুরী।

পাইক-বরকন্দাজ, আমলা-কর্মচারী, ঝি-চাকর—সবাই এখানে-ওখানে ভিড় করে আছে। চাপা কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। হয়তো বা ভবিষ্যতের ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছে।

জাবেদাকে নিয়ে অতনু দোতলায় উঠে আসে। রাজাবাহাদুর ও বীরেশ্বরবাবু মুখোমুখি বসে আছেন। রাজাবাহাদুরের হাতে একখানি কাগজ। তাঁর পাশে বরুণা।

অতনু সামনে আসতেই রাজাবাহাদুর কাগজখানি তার হাতে দেয়—কোর্টের সই করা মিনিট্। অতনু চোখ বুলোয়—মহামান্য আদালত আজ থেকে ফুলগঞ্জের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন। এবং বীরেশ্বরবাবুকে সরকারী ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেছেন।

কথাটা সেদিন সেরেস্তায় বসে গোপালবাবু বলেছিলেন অতনুকে। তখন সে বিশ্বাস করে নি। আজ অতনুর অবিশ্বাস ঘুচে গেল।

রাজাবাহাদুরই প্রথম কথা বলেন, "তাহলে কাল থেকেই তুমি দখল নিতে শুরু কর।"

"হ্যাঁ।" বীরেশ্বরবাবু উত্তর দেন, "কোর্ট আমাকে সাতদিনের মধ্যে Possession complete করতে বলেছেন।"

"বেশ, নিয়ে নাও। তুমি তো সবই জান।" রাজাবাহাদুর বলেন।

"জানলেও আমি তো আর এস্টেটের হয়ে কাজ করতে পারব না। এস্টেটের তরফ থেকে কাউকে আমার কাছে Possession make-over করতে হবে, আমি সেটা take over করব।"

রাজাবাহাদুর একবার অতনুর দিকে তাকান। তারপর বলেন, "অতনু আমার পক্ষ থেকে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবে।"

"তাহলে কিন্তু অতনু আর সরকারী চাকরি পাবে না।" বীরেশ্বরবাবু ঘোষণা করেন, "মানে কোর্ট আমাকে কয়েকজন অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারীকে সহকারী নিযুক্ত করতে বলেছেন। অতনু যদি এখন এস্টেটের হয়ে কাজ করে, তাহলে তো তাকে আর সরকারী কর্মচারী করা যাবে না।"

"ঠিকই আছে, আমিই তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব।"

"আপনি !" রাজাবাহাদুরের কথা শুনে অতনু বিস্ময়ে ফেটে পড়ে।

রাজাবাহাদুর মৃদু হাসেন! বলেন, "এতেই অবাক হচ্ছ, এর পরে যে আমাকে আরও অনেক কিছু করতে হবে অতনু!"

"সে তখন দেখা যাবে।" অতনু কথাটা অস্বীকার করতে পারে না তবু সে আপত্তি করে, "আপনার হয়ে আমিই সব বুঝিয়ে দেব বীরেশ্বরবাবুকে, আমার সরকারী চাকরির দরকার নেই।"

"খাবে কি ?" রাজাবাহাদুর প্রশ্ন করেন, "আমি এখন মাত্র পাঁচ শ' টাকা করে মাসোহারা পাব, এর পরে হয়তো আরও কমে যাবে। আমার পক্ষে তো এখন কোন লোক-জন রাখা সম্ভব নয়।"

কথাটা খেয়াল ছিল না অতনুর! মাসে বিশ হাজার টাকার কমে যাঁর খরচ চলত না, তিনি এখন মাত্র পাঁচ শ' টাকা মাসোহারা পাবেন। তবু সে বলে, "আমরা দুটো প্রাণী, যেমন করে হোক্ চালিয়ে নেব। কিন্তু তাই বলে আপনি নিজে দখল দেবেন—এ কেমন কথা ?' একটু থেমে অতনু বীরেশ্বরবাবুকে বলে, 'কাল কখন কাজ শুরু করতে চান ?'

"সকালেই। আটটা নাগাদ।" বীরেশ্বর উত্তর দেন।

"বেশ, আমি উপস্থিত থাকব।" রাজাবাহাদুরকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পেছন ফেরে অতনু! জাবেদাকে বলে, "চল, অনেক রাত হলো একবার রাণীমার সঙ্গে দেখা করে কোয়ার্টারে যাই।"

রাজাবাহাদুর চুপ করে থাকেন।

"এক মিনিট !"

বীরেশ্বরবাবুর কথায় অতনুকে ফিরতে হয়। জাবেদাও পেছন ফেরে।

বীরেশ্বর বলেন, "তোমাকে কিন্তু পরশু থেকে কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হবে।"

রাজাবাহাদুর বীরেশ্বরের দিকে তাকান।

বীরেশ্বর বলতে থাকেন, 'মানে সরকারী কর্মচারী না হলে তো আমি ওকে কোয়ার্টারে থাকতে দিতে পারব না।"

অতনু চুপ করে থাকে। রাজাবাহাদুর নীরব।

একটু বাদে বীরেশ্বরবাবু আবার বলেন, 'উপায় অবশ্য একটা আছে।"

"কী ?" অতনু উৎকন্ঠিত।

"মানে কোর্ট আমাকে একজন লেডী পি. এ. দিয়েছেন। শুনেছি তুমি নাকি বকুলবাঈকে বেশ লেখা-পড়া শিখিয়েছো, সে এখন ভাল ইংরেজী ও বাংলা লিখতে পড়তে জানে। তোমার আপত্তি না থাকলে I may appoint her as my P. A."

"না, না, ও-সব চাকরি-টাকরি ও করতে পারবে না। তার চাইতে আমি পরশু আপনার কোয়ার্টার ছেড়ে দেব।" অতনু আপত্তি করে।

কিন্তু হঠাৎ জাবেদা জিজ্ঞেস করে বসে, "আমাকে দিয়ে আপনার পি. এ.-র

কাজ চলবে কি ?"

"কেন চলবে না," বীরেশ্বরবাবু বলেন, "কি আর এমন কাজ। চিঠি-পত্র খোলা, কাগজ-পত্র ফাইল করে রাখা আর অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো নোট করা। এটুকু পারবে না ? পারলে কিন্তু তোমরা কোয়ার্টারেও থাকতে পারতে আর অতনুর পুরো মাইনেটাই আমি তোমাকে দিতে পারতাম।"

"আমি রাজী।"

"জাবেদা !" অতনু প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

কোমল কন্ঠে জাবেদা বলে, "তুমি আপত্তি কোরো না। আমি বলছি এতে আমাদের ভাল হবে।"

"কিন্তু বকুল......" এতক্ষণ পরে কি যেন বলতে যান রাজাবাহাদুর। জাবেদা তাঁকে শেষ করতে দেয় না। বলে, "হুজুর, আপনার বহুৎ নিমক খেয়েছি, আর আপনার গলগ্রহ হতে চাইনে। তাছাড়া মেয়েটা অগলে সাল সিনিয়ার-কেম্ব্রিজ দেবে। একটা সালের জন্য তার লিখাপড়া বন্ধ করে দেব ? আপনি মেহেরবাণী করে আমাকে অনুমতি দিন হুজুর !"

রাজাবাহাদুর চুপ করে আছেন। হয়তো ভাবছেন—জগতে অবিশ্বাস্য বলে কিছু নেই।

রাণীমার সঙ্গে দেখা করে অতনু ও জাবেদা ঘরে ফিরে চলেছে। নীরবে পথ চলেছে। অতনু ভাবছে—কাল আর আজ, কাল যিনি রাজা ছিলেন আজ তিনি ফকির। কাল জাবেদা ছিল অতনুর অধীন আর আজ থেকে অতনু তার অধীন হলো।

"কি ভাবছ ?" জাবেদা জিজ্ঞেস করে।

"কিছু না।" অতনু উত্তর দেয়।

"আমি জানি তুমি কি ভাবছিলে।"

অতনু জাবেদার দিকে তাকায়।

জাবেদা আবার বলে, "আমি বীরেশ্বরকে জানি, আমি জানি সে আমার ইজ্জত নষ্ট করবে।"

"তাহলে তুমি এ চাকরিটা নিলে কেন ?" অতনু রীতিমত উত্তেজিত।

শান্ত স্বরে জাবেদা উত্তর দেয়, "নিয়েছি নয়, নিতে হলো।"

"কেন ?"

"বীরেশ্বর যাতে রাজাবাহাদুরের আর কোন ক্ষতি না করতে পারে।" একবার থামে জাবেদা। তারপরে আবার বলে, "ও কেন আমাকে চাকরি দিয়েছে জানো ?"

"কেন ?"

"একে তো আমার দেহের ওপর ওর চিরকালের লোভ। তার ওপর ও ভেবেছে, তোমার ঘরণী হলেও আমি বাঈজী। আমি দৌলতের দাসী। ওর ধারণা

রাজবাহাদুরের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করলে, আমি ওকে সাহায্য করব !" একবার থামে বকুলবাঈ। তারপরে তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলে, "বীরেশ্বর জানে না—বাঈজীরা রুপেয়ার বদলে ইজ্জত দেয়, কিন্তু জানের বদলেও নিমকহারামী করতে পারে না।"

॥ কুড়ি ॥

থামলেন গোপালবাবু। পকেট থেকে দেশলাই বের করে নিভে যাওয়া বিড়িটাকে আবার ধরালেন। এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এ যাবার পরে মাইনে বেড়েছে কিন্তু আয় কমেছে। চুরুট থেকে বিড়িতে নেমেছেন।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন গোপালবাবু। চারিদিকটা একবার ভাল করে নজর বুলিয়ে আবার শুরু করলেন, "বহুদিন থেকেই টাকা পয়সায় টানাটানি শুরু হয়েছে। সামলে চলা দূরের কথা বীরেশ্বরবাবুর বুদ্ধিতে রাজাবাহাদুর আরও তাড়াতাড়ি এস্টেটের এই অবস্থা ডেকে এনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পরিবার পরিজন নিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছি।" একটু থেমে তিনি আবার বলেন, "টাকা অনেক হাতে পেয়েছি ভাই ! মাইনে পেতাম বিশ টাকা। কিন্তু নজর পেতাম কয়েক গুণ। পুণ্যাহ ও কালী পুজোর সময় তো কথাই নেই। তাছাড়া খাওয়া-পরার কোন জিনিসই কোনদিন কিনতে হতো না, সবই প্রজারা দিয়ে যেত। হয়তো বলবে, সারাজীবন এত রোজগার করলেন, আজ বীরেশ্বর-বাবু নজর বন্ধ করে দেওয়ায় এত হা-হুতাশ করছেন কেন ?"

অতনু চুপ করে থাকে। গোপালবাবু বিড়িটাকে শেষবারের মতো দেখে নিলেন। তারপর সুখটান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরে। বলতে থাকলেন, "আমাদের আদর্শ হলো রাজাবাহাদুর। নিজেদের অজান্তেই স্বভাবটা তাঁর মতো হয়ে গেছে। আমরাও ভবিষ্যৎ ভাবি নি। যা পেয়েছি, খরচ করেছি। কী ভাবে, তা নাইবা শুনলে। শুধু আমি নয়, ফুলগঞ্জ এস্টেটের প্রায় সব কর্মচারী, সারা জীবন রোজগার করে লিভারের ব্যথা ছাড়া আর কিছু সঞ্চয় করতে পারে নি।"

"আপনি এতো ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? আপনার ছেলে তো বড় হয়ে গেছে।" অতনুকে কথা বলতে হয়।

"ছেলে !' গোপালবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। "হ্যাঁ, বয়স বেড়েছে। গতরও বেড়েছে ! শুধু বিদ্যা বুদ্ধিতে ছোট রয়ে গেছে। সেকেন্ড ক্লাশে একটানা তিনবছর কাটাবার পর, স্কুল ছাড়িয়েছি।"

"তাহলেও খাতা লেখার কোনও একটা কাজ-টাজ তো যোগাড় করে দিতে পারেন।"

"কোথায় পাব বলো ? ফুলগঞ্জের বাইরে কে আমাকে চেনে ?" অসহায়

কণ্ঠে গোপালবাবু উত্তর দেন।

"কেন? রাজাবাহাদুরকে বলতে পারেন। তিনি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই একটা কিছু করে দিতে পারেন।" অতনু উপায় দেখায়।

"ভায়া" একটু শুষ্ক হাসি হাসেন গোপালবাবু, "তুমি ছেলেমানুষ। জগৎটা বড় জটিল। যে রাজাবাহাদুরকে সবাই সমীহ করত, আজ তিনি থেকেও নেই। এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এ যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মূল্যহীন হয়ে পড়েছেন। যারা সুখের সময় মজা লুটতে ফুলগঞ্জে ভিড় জমাত, দুঃখের দিনে তারা সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। মদের পার্সেল আসা বন্ধ হয়েছে, বাঈজীরা চলে গেছে—আজ রাজাবাহাদুরের কথাকে কে আমল দেবে?"

অতনু চুপ করে থাকে। কেবল তার বুক চিরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

যথারীতি বিলিয়ার্ডে হেরে গিয়ে হাত পাতলেন সুরেশবাবু। পকেটে হাত ঢুকিয়েই অপ্রস্তুত হলেন রাজাবাহাদুর। অতনুর দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, "সুরেশকে দশটা টাকা দিয়ে দাও। ও হেরে গেছে।"

নোটটা বের করতেই, অতনুর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নেন সুরেশবাবু। এ যেন সেই বুদ্ধিদীপ্ত সুরেশবাবু নন তাঁর প্রেতাত্মা। এ ক-মাসে শরীরটা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। পোশাকে অভাবের ছাপ সুস্পষ্ট। মোসাহেবী করে যা আহরণ করেছিলেন, তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বীরেশ্বরবাবু সরকারী ম্যানেজার হয়েই সুরেশবাবুর দলকে প্রাসাদে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আর কেউ বড় একটা এ মুখো হন না। কিন্তু সুরেশবাবু লুকিয়ে-চুরিয়ে মাঝে-মাঝে আসেন। একদিন তিনি বীরেশ্বরবাবুর মুখোমুখি পড়ে গিয়ে চূড়ান্ত নাজেহাল হয়েছিলেন। তাহলেও আসেন। ফেরার সময় রাজা-বাহাদুরের কাছ থেকে দশ-বিশ টাকা নিয়েও যান।

বীরেশ্বরবাবু বকুলবাঈকে কড়া হুকুম দিয়েছেন—এদের এ বাড়ির ত্রিসীমায় দেখলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিও। তাই দু-একজনকে অতনু তাড়িয়েও দিয়েছে। কিন্তু সুরেশবাবুকে সে কিছুই বলতে পারে না। সুরেশবাবু তাকে যে দরজা খুলে দিয়েছেন, অতনু কি সুরেশবাবুর সামনে সেই দরজা বন্ধ করে দিতে পারে?

সুরেশবাবু চলে গেলে রাজাবাহাদুর বলেন, "এদের জন্য আমার সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় অতনু। এরা বড়ই অসুবিধায় পড়েছে। কিন্তু আমিও যে নিরুপায়।"

অতনু নির্বাক। খানিকক্ষণ নীরবে কেটে যায়। রাজাবাহাদুর আবার বলতে থাকেন, "স্ত্রী মরে বেঁচেছে। ছেলেটা বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই ওর। ভারী লক্ষ্মী মেয়েটি। বাবার বেহিসেবী আচরণকে মেনে নিয়েছে চিরকাল। সুরেশ বলছিল একটা সম্বন্ধ নাকি হাতে

আছে। হাজার পাঁচেক টাকা হলে মেয়েটিকে সংসারী করতে পারে।"

শেষ করতে পারেন না রাজাবাহাদুর। থামলেন তিনি। অতনু উঠে দাঁড়িয়েছে। সে জানে এরপর কি শুনতে হবে? তাই সে পালাতে চায়।

কিন্তু পারে না। বিনা প্রস্তাবনায় প্রস্তাবটা পেশ করে রাজাবাহাদুর, "আমি ভাবছিলাম তোমার ঐ বিশ হাজার থেকে হাজার পাঁচেক টাকা দিলে, মেয়েটির একটা উপায় হতো। আমি ছাড়া সুরেশের আর কে আছে বলো?"

"ঐ ক'টি টাকাই একমাত্র সম্বল। রাণীমার চিকিৎসা—বরুণা · "

"ওঃ।" অসহায় দৃষ্টিতে অতনুর দিকে একবার তাকিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রাজাবাহাদুর।

"দাদা" প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে বরুণা। সে বোধহয় পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ।

"কি?" অতনু উত্তর দেয়।

"তুমি কিন্তু দিন দিন বড় একচোখো হয়ে উঠেছ।"

"যেমন?"

"আমার একটি বোনের পাঁচ হাজার টাকার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না, আর তুমি কিনা তোমার বোনের সুখের জন্য যক্ষের মতো টাকা আগলে রাখছ!"

অতনু কোন জবাব দেয় না। বরুণাও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপরে এগিয়ে এসে অতনুর একখানা হাত ধরে বলে, "দু-লাখ ষাট হাজার টাকায় যার জীবনে সুখ কিনতে পারো নি, বিশ হাজার টাকায় কি তাকে সুখী করতে পারবে?"

অতনু নিরুত্তর।

বরুণা আবার বলে, "তার চেয়ে সেই টাকা যদি আর কারও জীবনে সুখ আনতে পারে, তাহলে তোমার এই অভাগী বোন অন্তত এই ভেবে সুখী হবে যে, সে আর একটি মেয়েকে সুখী করতে পেরেছে।" অতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বরুণা।

অতনু আর নীরব থাকতে পারে না। বলে, "বেশ, তবে তাই হোক্। চল বোন আমরা রাজাবাহাদুরকে খবরটা দিয়ে আসি।"

পরদিন সকালেই অতনু সুরেশবাবুকে খবর পাঠালো। সুরেশবাবু ছুটে আসেন তার কোয়ার্টারে। না, এখন আর এ কোয়ার্টার তার নয়, জাবেদার। জাবেদা দু'বেলাই সেরেস্তায় বসছে। মাঝে মাঝে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে তাকে মহলেও যেতে হচ্ছে। সে নাকি এখন ম্যানেজারের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত কর্মচারী। এ জন্য অতনুকে অনেকে পরোক্ষে উপহাসও করে। সে মুখে কোন প্রতিবাদ করে না। কেবল মনে মনে হাসে।

একগাল হেসে সুরেশবাবু অতনুকে জিজ্ঞেস করেন, "ভায়া নাকি শমন জারী করেছো?"

"আমি নয়, বরুণা আপনাকে ডেকেছে। একটু বসুন তাকে খবর পাঠাচ্ছি।" অতনু বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

সুরেশবাবু বিস্মিত হন। হয়তো বা একটু বিচলিতও। তিনি বসে পড়েন।

অতনু ফিরে আসে। সুরেশবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন, "বরুণা···রাজকুমারী হঠাৎ আমাকে···। কি ব্যাপার ?"

"ব্যাপারটা তার কাছ থেকেই শুনবেন। সে আসছে।" অতনু একটু মজা করতে চায়। হাসি তো বহুদিন বিদায় নিয়েছে ফুলগঞ্জ থেকে। যদি এই উপলক্ষ্যে একটু হেসে নেওয়া যায়—মন্দ কি ?

সুরেশবাবু আরও ভীত হয়ে পড়েন। বলেন, "ভায়া, ব্যাপারটা বোধহয় ভাল নয়। আমি বরং পালিয়ে যাই। আমার পাপের তো আর সীমা-সংখ্যা নেই। তারই কিছু হয়তো রাজকুমারী টের পেয়ে থাকবে। তাই সে আমাকে তলব করেছে।"

সুরেশবাবু প্রস্থানোদ্যত হন। অতনু তাঁকে বাধা দিতে চায়। কিন্তু তার দরকার হয় না। ঠিক তখনই বরুণা এসে দাঁড়ায় দোরগোড়ায়।

সুরেশবাবু পেছিয়ে আসেন—যেন ভূত দেখেছেন।

বরুণা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, "কাকাবাবু, কোথায় যাচ্ছিলেন ?"

সম্বোধন ও কণ্ঠস্বরে কিছুটা আশ্বস্ত হন সুরেশবাবু। তবু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। কোনমতে জবাব দেন, 'না। মানে এই, রাজাবাহাদুরের কাছে·· রাজাবাহাদুরের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাচ্ছিলাম আর কি।" তিনি অতনুর দিকে তাকান।

অতনু একটু হাসে।

বরুণা বলে, "কিন্তু বাবা তো ওপরে। আপনি এসেছেন শুনে, আমি তাঁকে মায়ের কাছে বসিয়ে এসেছি।"

"কেন রাণীমার কি হয়েছে ?" সুরেশবাবু স্বাভাবিক হয়ে উঠতে চান।

"মা আজ তিন মাসের ওপর শয্যাশায়ী। হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ। সবসময়ে একজনকে তাঁর কাছে থাকতে হয়।"

সুরেশবাবু কোন কথা বলতে পারেন না। কি বলবেন ? স্বামী বা কন্যা ছাড়া শিয়রে বসার মতো আপনজন রাণীমার আর নেই ফুলগঞ্জে। এবং রাজাবাহাদুরের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সুরেশবাবুর অবদানও বড় কম নয়।

ঘরের থমথমে আবহাওয়াটা দূর করতে চায় অতনু। সে বরুণাকে বলে, "এবারে সুরেশবাবুকে বলো, কেন তুমি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছ !'

সুরেশবাবু আবার দুশ্চিন্তায় পড়েন। রাজকুমারী কেন তলব করেছে তাকে ?

বরুণা অতনুকে জিজ্ঞেস করে, "কেন, তুমি বলো নি কিছু ?"

"না। তুমি ডেকেছো, তোমারই বলা উচিত হবে।"

সুরেশবাবু ইতিমধ্যে ঘামতে শুরু করেছেন।

"কাকাবাবু !" বরুণা ডাক দেয়।

"এঁ্যা!" এমন ডাক আশা করেন নি সুরেশবাবু।

"বাবা বলছিলেন," বরুণা বলতে শুরু করে, "আপনার মেয়ের নাকি একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে?"

অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গে বিস্মিত হন সুরেশবাবু। ঢোক গিলে কোনমতে জবাব দেন, "হ্যাঁ, ছেলেটি ভালই। আমার মেয়েকে তার পছন্দও হয়েছে কিন্তু আমি এখনও কথা দিতে পারি নি।"

"আপনি কালই কথা দিন। আগামী মাসের প্রথম দিকেই তারিখ ঠিক করুন।"

"কিন্তু "

"আমি জানি, কেন আপনি কথা দিতে পারেন নি।...এ বিয়ের যাবতীয় খরচ আমি দেব। আপনি ব্যবস্থা করুন।"

কৃতজ্ঞ সুরেশবাবুর চোখ দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! তিনি যেন আবেগে অস্থির হয়ে পড়েন। বরুণার সামনে এগিয়ে এসে দু'হাত জড়ো করে অস্ফুট স্বরে বার বার বলতে থাকেন, "তোমার ভাল হোক্ মা! তুমি সুখী হও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!"

বরুণা নির্বাক। সুরেশবাবুর আশীর্বাদ বোধহয় তাকে অভিভূত করতে পারে না। তার কাছে এ আশীর্বাদ অর্থহীন। কাউকে সুখী করলে, নিজের দুঃখ দূর হয়—এ কথা আর বিশ্বাস করে না বরুণা।

নইলে ফুলগঞ্জের এ অবস্থা কেন? রাণীমার এত কষ্ট কেন? রাজাবাহাদুরের এই দুঃসহ দুঃখ কেন? বরুণার জীবনটা এমন হয়ে গেল কেন?

॥ একুশ ॥

রাতের খাওয়া শেষ করে অতনু শোবার ঘরে আসে। মশারী ফেলে শুয়ে পড়ে সে।

জাবেদারও খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এঘরে আসতে দেরি আছে তার। আজ সে মহল থেকে ফিরে এসেছে বলে ঝি খাবার নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেছে। জাবেদাকেই এঁটো বাসন-পত্র গুছিয়ে, খাবার টেবিল পরিষ্কার করতে হবে। তারপর দোর বন্ধ করে পান খেয়ে সে এঘরে আসবে।

আর অতনুকে ততক্ষণ জেগে থাকতে হবে। দু'দিন বাদে ঘরে ফিরেছে জাবেদা। আজ যদি সে শুতে এসে অতনুকে ঘুমোতে দেখে, তাহলে আর রক্ষে রাখবে না। কাঁচা-ঘুম তো ভাঙবেই, তারপরে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হবে অতনুর।

সুতরাং অতনু চোখ মেলে শুয়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে—তার

বাড়ির কথা, বাবার কথা আর ফুলগঞ্জের কথা। সে ভেবে চলে—রাজাবাহাদুর রাণীমা অরুণ আর বরুণার কথা। ভাবে বীরেশ্বরবাবুর কথা। নিজের ও জাবেদার কথা।

জাবেদা এসে গেছে। সে মাথার দিকের জানালা দুটো ভাল করে খুলে দেয়। একটু হাওয়া এলে ভালই হয়। আজ বড্ড গুমট। তার ওপরে যা মশার উৎপাত। মশারী না টাঙিয়ে ঘুমোবার উপায় নেই।

জাবেদা আলো নেবায়। বিছানায় আসে! মশারী গুঁজে সে অতনুর পাশে শুয়ে পড়ে। অতনু তাকে বুকে টেনে নেয়।

নীরব কিছুক্ষণ। তারপর জাবেদা বলে, "আজ খুব 'টায়ারড' লাগছে। মৌকা পেয়ে বীরেশ্বরটা আজকাল বড় বেশি জুলুম শুরু করেছে। বাইরে গেলেই রাতভর পরেশান করে। গত দু'রাত একদম ঘুমোতে দেয় নি। এত মদ খাইয়েছি কিন্তু কিছুতেই লোকটাকে কাহিল করতে পারি নি। এই বুড়ো বয়সেও গায়ে যেন জানোয়ারের তাকত। একেবারে ছিঁড়ে খেতে চায়।"

জাবেদা চুপ করে। অসহায় অতনু কি বলবে ভেবে পায় না। নিজের স্ত্রীর ওপর একটা লোক পাশবিক অত্যাচার করছে জেনেও রাজাবাহাদুরের কথা ভেবে তাকে চুপ করে থাকতে হচ্ছে।

জাবেদা আবার বলে, "যেদিন তোমার ঘরনী হলাম, ভাবলাম আমার বাঈজীর জীবন খতম হয়ে গেল। কিন্তু কি নসীব দেখ, আবার সেই জীবনে ফিরে আসতে হলো। তবে·" একবার থামে সে। তারপরে তৃপ্তকণ্ঠে বলে, "তবে শয়তানটার মেয়াদ প্রায় খতম করে এনেছি।"

"কেন নীলামওয়ালার সেই চিঠিটা পেয়ে গেছ বুঝি?"

উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে জাবেদা। একটু বাদে হাসি থামিয়ে বলে, "আজ নিয়ে এসেছি! জজসাহেবের হাতে পড়লেই ব্যাটার নির্ঘাৎ জেল। শুধু কি তাই," জাবেদা বলে চলে, "আজ আর একখানা কাগজ হাতিয়েছি। বেইমানটা রাজাবাহাদুরকে একটা ঝুঠা মামলায় ফাঁসাবার মতলবে ছিল। তার ওপর কাল রাতে মৌজের মাথায় সেফ্ ডিপজিট্ ভল্টয়ের নাম্বারটাও বলে দিয়েছে আমাকে। কেবল বেনামী ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টটার এখনও হদিশ পাই নি। পেয়ে যাব কিছুদিনের মধ্যে। তারপরেই দুশমনকে হাজতে ঢোকাতে হবে।"

"কাগজপত্রগুলো রেখেছো কোথায়?" অতনু জিজ্ঞেস করে।

জাবেদা জবাব দেয়, "কেন, আমাদের আলমারীর লকারে।"

"চাবিটা সাবধানে রেখো। ঝি-চাকরকে বিশ্বাস নেই।"

"সে ভয় কোরো না, আলমারীর চাবি সবসময় আমি কোমরে রাখি।"

"রাত একটা বাজে।" অতনু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "কাল সকালেই তো তোমাকে আবার সেরেস্তায় ছুটতে হবে। এবারে ঘুমিয়ে পড়ো।"

"উঁহুঁ।" সোহাগভরা স্বরে জাবেদা আপত্তি জানায়। সে আরও জোরে

জড়িয়ে ধরে অতনুকে।

অতনু হেসে বলে, "তাহলে কি সারারাত জেগে থাকবে?"

"জী।"

"এই যে বলছিলে বীরেশ্বর গত দু'রাত একদম ঘুমোতে দেয় নি।—আজ খুব টায়ারড লাগছে।"

"তাই বলে দু · রাত বাদে তোমাকে কাছে পেয়েছি, আর এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব?"

"আজ তোমার শরীরটা ভাল নয় বলেই ঘুমোতে বলছি, কাল দেখা যাবে।"

"না।"

"অতনু চুপ করে থাকে।

একটু বাদে জাবেদা আবার কথা বলে, "এই!"

"কি?"

"জানি না যাও।"

"বেশ, তবে ঘুমোও।"

"না।"

"তাহলে?"

একটুকাল চুপ করে থাকে জাবেদা। তারপরে হঠাৎ নিজের সমস্ত শরীরটাকে অতনুর গায়ের ওপরে টেনে এনে মৃদু কন্ঠে বলে, "তুমি একবার বীরেশ্বরের মতো জানোয়ার হও।"

কিন্তু অতনু জাবেদার সে সাধ পূর্ণ করতে পারে না। হঠাৎ বাইরের দরজায় একটা কড়া নাড়ার শব্দ হয়। কে যেন ডাকছে।

জাবেদা তাড়াতাড়ি উঠে বসে। অতনু আলো জ্বালায়। জাবেদা শাড়ীটা ঠিক করে নেয়। অতনু ঘড়ি দেখে—রাত দেড়টা। বাইরে সমানে কড়া নাড়ার শব্দ হয়ে চলেছে।

অতনু জিজ্ঞেস করে, "এত রাতে কে ডাকছে আবার!"

"রাণীমার তবিয়ৎ খারাপ। তাঁর কিছু হলো না তো!"

কথাটা মনে পড়ে অতনুর! সে জাবেদার সঙ্গে সামনের ঘরে আসে। আলো জ্বালিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কে?"

"আমি··আমি বীরেশ্বর।"

অতনু জাবেদার দিকে তাকায়। তার চোখেও জিজ্ঞাসা। অতনু আবার জিজ্ঞেস করে, "এত রাতে আপনি?"

"কি করব বলো? চাকর-বাকরগুলো তো সবাই নবাব। তোমাদের রাণীমা হঠাৎ খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তোমার এখুনি একবার রাজবাড়িতে যাওয়া দরকার।"

জাবেদা চিৎকার করে ওঠে, "রাণীমা এখন কেমন আছেন?"

"ভাল নয়, দরজা খোলো। বলছি সব।"

তবু জাবেদা দ্বিধা করে। অতনু অবাক হয়। বলে, "দরজা খোলো।"

"খুলব?" জাবেদা ক্ষীণকন্ঠে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ! খুলবে বৈকি।"

জাবেদা অতনুর কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলে, "বীরেশ্বরকে বিশ্বাস নেই। কি মতলবে এসেছে কে জানে!"

অতনু একটু হাসে। বলে, "কি মতলবে আসবে আবার? রাণীমা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দেখে নিজেই ছুটে এসেছেন আমাকে ডাকতে।"

"বকুলবাঈ, অতনু! তোমরা চুপ করে রয়েছো কেন? দেরি করলে কিন্তু রাণীমাকে আর দেখতে পাবে না। দরজা খোল, শিগ্গীর দরজা খোল।"

অতনু এগিয়ে যায় দরজার কাছে। সে দরজা খোলে।

বীরেশ্বর ভেতরে ঢোকে।

অতনু জিজ্ঞেস করে "কি ব্যাপার বলুন?"

"বলছি।" বীরেশ্বর নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দেন। তারপরে আবার বলেন, "ভেতরে চল, সব বলছি।"

অতনু ও জাবেদা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারপরে অতনু বলে "এই যে বলছিলেন, দেরি করলে আর রাণীমাকে দেখতে পাব না।"

"হুঁ্যা। ওঘরে চল বলছি সব।"

অগত্যা অতনু ও জাবেদা শয়নকক্ষের দিকে এগোয়। বীরেশ্বর তাদের অনুসরণ করেন।

"হ্যাণ্ডস্ আপ্। সাবধান, হাত না তুলে পেছনে ফিরলেই গুলি করব।"

বীরেশ্বরের কর্কশ আদেশে অতনু ও জাবেদা বিচলিত হয়। তারা দু'হাত উঁচু করে পেছনে তাকায়। সত্যই বীরেশ্বরের হাতে একটা রিভলবার।

অতনু ঘাবড়ে যায়। কি বলবে, কি করবে—কিছুই বুঝতে পারে না সে। শুধু মনে মনে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে। জাবেদার অমতে সে দরজা খুলে দিয়েছে। খাল কেটে কুমীর নিয়ে এসেছে।

অতনু বীরেশ্বরের দিকে তাকায়। তাঁর দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে।

জাবেদা হাসে, স্নিগ্ধ ও মধুর হাসি। বীরেশ্বর বোধহয় বিস্মিত হন।

মধুক্ষরা কণ্ঠে বাঈজী বলে, "বাবুজী, তোমার নিশ্চয়ই দুপুর রাতে আমার কথা মনে পড়েছে। পড়তেই তো পারে, গত দু'রাত তুমি আমাকে কত আদর করেছো। আমি যে এতক্ষণ সে-সব কথাই বলছিলাম অতনুকে। বলছিলাম—আমার বাবুজীর মতো মরদ হয় না।"

"চুপ কর শয়তানী!" বীরেশ্বর গর্জে ওঠেন।

কিন্তু জাবেদা চুপ করে না। সে তেমনি হাসিমুখে বলতে থাকে, "তা তুমি বুঝি ভাবলে বাবুজী, রিভলবার না নিয়ে এলে, অতনু আমাকে ছেড়ে দেবে না।

এটা তুমি কিন্তু ভুল ভেবেছ বাবুজী, তুমি ডেকে পাঠালেই আমি অতনুকে ছেড়ে চলে যেতাম তোমার মহলে।" একটু থেমে সে আবার বলে, "বাবুজী! তোমার সেই কথাটা আমি আজ বলেছি অতনুকে।"

"কোন কথা?" বীরেশ্বর প্রশ্ন করেন।

"সেই যে, তুমি কাল রাতে বলেছিলে, আমি অতনুকে তালাক দিলে তুমি আমাকে নিকা করবে। অতনু রাজী হচ্ছে না, কিন্তু আমি মন ঠিক করে ফেলেছি।" আবার একটু থামে বকুলবাঈ। তারপরে মোহভরা স্বরে বলে, "দার্জিলিংয়ের সেই কোঠিটা তুমি আমাকে দিয়ে দেবে তো? এদিককার কাজ খতম হলেই আমরা চলে যাব সেখানে। সে কোঠিতে কিন্তু আর কেউ থাকতে পারবে না বাবুজী! শুধু আমরা দু'জনে থাকব—তুমি আর আমি।"

কায়দা করে একটু কাত হয় জাবেদা। তার কাঁধের আঁচলটা খসে পড়ে মাটিতে। তখন তাড়াতাড়িতে সে জামার বোতামগুলো বন্ধ করতে পারে নি। বাঈজীর যৌবনদীপ্ত পয়োধরের দিকে বীরেশ্বরের নজর পড়ে।

অতনু বুঝতে পারে বকুলবাঈ মোহিনী মূর্তিতে মোহিত করতে চাইছে আততায়ীকে। নিরুপায় অতনু নীরব থাকে।

বীরেশ্বরের চোখের পলক পড়ে। তিনি অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলেন, "আমি জানি তুই তেমন নয়।" তারপরেই তিনি অতনুর দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন, "এই কুত্তাটা তোকে দিয়ে এ-সব করিয়েছে। তুই যদি আমার দলে থাকিস, তবে আমি তোর কিছুই করব না। কিন্তু তার আগে আমি এই কুত্তাটাকে শেষ করব আর তোকে সেই নীলামওয়ালার চিঠি ও অন্যান্য কাগজপত্রগুলো আমাকে দিয়ে দিতে হবে।"

"নীলামওয়ালার চিঠি!" জাবেদা যেন আকাশ থেকে পড়ে, "সে তো তুমি নিজে সিন্দুকে রেখে দিলে বাবুজী!"

"হ্যাঁ, তারপরে তুই সেটা হাতিয়েছিস।" একবার থামেন বীরেশ্বর। ধমক দিয়ে বলেন, "বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করিস না। আমি অনেকক্ষণ থেকে এই জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তোদের সব কথা শুনেছি। শিগ্‌গীর আলমারীর চাবি বের কর। কাগজপত্র আমাকে দে। তারপরে তোর এই নয়া নাগরকে আমি কুকুরের মতো গুলি করে মারব। আর তোকে সে কথা চেপে যেতে হবে। বলতে হবে ডাকাতের হাতে খুন হয়েছে অতনু।"

অতনু অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। একবার সে ভাবে কিছু বলে। কিন্তু তারপরেই মনে হয়, বীরেশ্বর অত্যন্ত ধূর্ত। কথা দিয়ে তাকে ভোলানো যাবে না। সে চুপ করে থাকে।

জাবেদাও চুপ করে আছে। কি যেন ভাবছে। কি ভাবছে বকুলবাঈ? সে কি বীরেশ্বরের শর্তে সম্মত হবে?

বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, "কি ভাবছিস?" একটু থেমে কোমল কণ্ঠে তিনি

আবার বলেন, "নে, সময় নষ্ট করিস নে। চাবিটা আমাকে দে। আমার দলে থাকলে তুই সুখে থাকবি।"

জাবেদা হাসে। বলে, "চাবি দিতে হলে তো হাত নামাতে হবে। তুমি যে আমাকে হ্যান্ডস্ আপ্ করতে বলেছো বাবুজী!"

"তোকে কে হ্যান্ডস্ আপ্ করে থাকতে বলেছে! তুই হাত নামিয়ে চাবি বের কর।" তারপরে অতনুর দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুই হাত তুলে থাক্। সাবধান, অন্য কিছু করার চেষ্টা করলেই গুলি করব।"

জাবেদা হাত নামায়। কিন্তু কোমর থেকে চাবি বের করে না। সে মাটিতে খসে পড়া আঁচলটাকে তুলে কাঁধের ওপর দিয়ে কোমরে জড়ায়।

"নে, চাবিটা বের কর।" বীরেশ্বর যেন বাঈজীকে অনুরোধ করেন।

জাবেদা আবার হাসে। সে একবার অতনুর দিকে তাকায়। তারপরে কোমরে হাতে দেবার ভান করেই বিদ্যুৎবেগে ল্যাফিয়ে পড়ে বীরেশ্বরের গায়ের ওপর—চিৎকার করে ওঠে, "শয়তানকে সাবাড় করো।"

বীরেশ্বরের রিভলবার গর্জে ওঠে। কিন্তু সে নিজেও জাবেদার দেহের ভারে মাটিতে পড়ে যায়। রিভলবারটা তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে দূরে।

জাবেদার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে রিভলবারটা নিতে চাইছেন বীরেশ্বর। পারছেন না। জাবেদা অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরেছে তাকে। সে ক্লান্ত-কণ্ঠে কোনমতে বলে ওঠে, "অতনু, রিভলবার নাও।"

বিভ্রান্ত অতনু যেন সম্বিত ফিরে পায়। সে তাড়াতাড়ি রিভলবারটা হাতে তুলে নেয়। তারপরেই বীরেশ্বরের কাছে ছুটে এসে চিৎকার করে ওঠে, 'হ্যান্ডস আপ্!"

কিন্তু কিসের বিনিময়ে অতনু বন্দী করতে পারল বীরেশ্বরকে? বাঁচাতে পারল নিজেকে? বাঁচাতে পারল রাজাবাহাদুরকে?

না। উত্তেজিত অতনুর তখন সে মূল্য যাচাই করার অবকাশ ছিল না। সে সুযোগ হলো কয়েক মিনিট বাদে।

বীরেশ্বরকে বাথরুমে বন্দী করে অতনু ফিরে এল ঘরে—জাবেদার কাছে। দেখতে পেল. সে মেঝেতে পড়ে আছে। রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে।

না, বীরেশ্বর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। গুলিটা জাবেদার ঠিক বুকে লেগেছে।

"জাবেদা!" অতনু পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠে। সর্বশক্তি দিয়ে সে তাকে টেনে নেয় কাছে। বার বার আকুল কণ্ঠে ডাকতে থাকে তার প্রাণের প্রিয়তমাকে।

॥ বাইশ ॥

বাইসিক্লে করে সদর থেকে ফুলগঞ্জে ফিরে চলেছে অতনু। সে আদালতে গিয়েছিল। আজকাল আর গাড়ি-ঘোড়া নেই। তাই কেষ্টদাসের সাইকেলই একমাত্র সম্বল।

বিচারে বীরেশ্বরের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। নিজের জীবন দিয়ে বকুলবাঈ শয়তানকে সাবাড় করে গেল।

বকুলবাঈ ··জাবেদা। না, তার কথা আর ভাবতে পারছে না অতনু। সেদিন রাতে সে দরজা খুলতে চায় নি। বলেছিল—বীরেশ্বরকে বিশ্বাস নেই।

অথচ অতনু দরজা খুলে দিয়েছিল। জাবেদার ঘাতককে ঘরে নিয়ে এসেছিল।

জাবেদা হয়তো বেঁচে যেতে পারত। কাগজপত্র ও অতনুর জীবনের বিনিময়ে জাবেদা সম্ভবত সন্ধি করতে পারত বীরেশ্বরের সঙ্গে। বাঁচতে পারত নিজে। তা না করে সে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে গেল অতনুকে, নিঃশত্রু করে গেল রাজাবাহাদুরকে।

কিন্তু জাবেদাকে ছাড়া অতনু বাঁচবে কেমন করে? এই অন্তর্দাহ নিয়ে সে কেমন করে বেঁচে থাকবে?

তাকে যে বাঁচতেই হবে। যাবার সময় জাবেদা বলে গেছে—ছায়াকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। আমার মতো তার জীবনটা যেন বরবাদ না হয়ে যায়।

ছায়ার জন্যই বাঁচতে হবে অতনুকে। সে ছায়ার-কেম্ব্রিজ পাস করার পরেই অতনু তার বিয়ে দেবে। তারপরে ছুটি নেবে।

পারবে কি? রাজাবাহাদুরের যে এখন সে ছাড়া আর কেউ নেই। অতনু ও রাজাবাহাদুর দু'জনের জন্যই তো প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে জাবেদা। রাজা-বাহাদুর ছুটি না দিলে যে ছুটি পাবে না অতনু।

গোলাপগঞ্জ প্রাসাদের সামনে আপনা থেকেই পা থেমে যায় অতনুর। সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে।

জাবেদা থাকত এখানে। তারই অনুরোধে একদিন এমনি সদর থেকে ফেরার পথে অতনু প্রথম এসেছিল এ বাড়িতে। সেদিন ঐখানে দাঁড়িয়ে জাবেদা তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। আর আজ?

আজ জাবেদা নেই। এমন কি দরোয়ান মাহাতো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নেই দেউড়িতে। ওখানে দাঁড়িয়ে আর কোনদিন সে সেলাম করবে না অতনুকে। সে চলে গেছে দেশে।

যেদিন গুজরাটি মহাজনকে গোলাপগঞ্জ প্রাসাদ দখল দেওয়া হলো, মাহাতোর সেদিনকার সেই করুণ মুখখানি আজও অতনুর চোখে ভাসছে।

বীরেশ্বরবাবুর নির্দেশে তালা খুলতে গিয়ে অত বড় শক্তিশালী পালোয়ানেরও হাত কাঁপছিল। দরজা খুলে পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল সে। তারপর কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছিল রাজবাড়িতে। রাজাবাহাদুরের পা দুটি জড়িয়ে ধরে সে অঝোরে কাঁদতে শুরু করেছিল।

রাজাবাহাদুর তাকে বুঝিয়েছিলেন—চিরকাল একভাবে যায় না মাহাতো। নসীব নবাবকে ফকির করে। গোলাপগঞ্জ আমার ছিল, আজ সুরাইয়াজীর। রাজদণ্ড গেল, মানদণ্ড এল। যেখানে দরবার বসত, সেখানে কারবার চলবে। সুরাইয়াজী ওখানে কারখানা বসাবেন। তুমি বিশ্বাসী লোক। আমি তাঁকে বলেছি তোমার কথা। তিনি তোমাকে রাখতে রাজী হয়েছেন। তুমি গোলাপ গঞ্জে ফিরে যাও।

—আপনাকে ছেড়ে আমি সেখানে যাব না হুজুর। আমাকে এখানেই থাকতে দিন। নইলে আমি দেশে চলে যাব।

রাজাবাহাদুর কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। প্রভুভক্ত ভৃত্যের কথায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তবু তিনি নিরুপায়। রাজবাড়িতে লোক ছাঁটাই শুরু হয়েছে। তখন। নতুন লোক নেওয়া আর সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। তাই তিনি হাত থেকে তাঁর একমাত্র আংটিটি খুলে ফেলেছিলেন। বাকিগুলো আগেই গেছে। প্রথম মহাল পরিদর্শন করতে বেরোবার সময় মহারাজা বজ্রনারায়ণ হীরের আংটিটি তাঁকে দিয়েছিলেন। পিতার আশীর্বাদ বলেই শত প্রয়োজনেও এটিকে তিনি হাতছাড়া করেন নি। আংটিটি মাহাতোর দিকে এগিয়ে দিয়ে রাজা-বাহাদুর বলেছিলেন—এইটে নাও। দেশে যাবার পথে কলকাতায় বেচে দিও!

—এ আপনি কি বলছেন হুজুর! আপনার হাতের আংটি বেচে আমি রোটি যোগাড় করব? এতবড় নমকহারামী আমি করতে পারব না।

অশিক্ষিত মাহাতোর মধ্যে মনুষ্যত্বের যে মহান প্রকাশ সেদিন রাজাবাহাদুর প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা তিনি বহুবার বর্ণনা করেছেন অতনুর কাছে। অনেকেই তাঁর নিমক খেয়েছে। কিন্তু কই, তারা তো কেউ এসে এমন করে বলে নি—আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না। যারা তার ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে তহবিল সাফ করেছে, তারা কেউ কখনও এসে একটা সান্ত্বনার কথা পর্যন্ত শোনায় নি তাঁকে। অথচ নতুন সরকারী ম্যানেজার সেদিন যখন তাঁদের অভিযুক্ত করবার জন্য রাজাবাহাদুরের সাহায্য চেয়েছিলেন, তখন রাজাবাহাদুর বলেছেন—আমি যদি জানতাম ওরা কিভাবে আমার টাকা সরাচ্ছে, তবে তো তখনই ওদের তাড়িয়ে দিতাম। আমাকে মাপ করবেন, এ সব ব্যাপারে আমি আপনাকে কোন সাহায্যই করতে পারব না।

সরকারী ম্যানেজার নিরুপায় হয়ে তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন।

মাহাতোকে বসতে বলে রাজাবাহাদুর গিয়েছিলেন রাণীমার কাছে। কয়েকদিন থেকেই রাণীমা অসুস্থ। বরুণা তখন তাঁকে রামায়ণ শোনাচ্ছিল।

লজ্জিতকণ্ঠে রাজাবাহাদুর বলেছিলেন—মাহাতোকে ছাড়িয়ে দিতে হচ্ছে। ওকে কিছু টাকা দিতে চাই।

—আমার হাত যে একেবারেই খালি। ক্লান্ত কণ্ঠে রাণীমা বলেছিলেন।

—ওঃ।

নিয়তির সঙ্গে নিষ্পত্তি করেছিলেন রাজাবাহাদুর। কঠিন বাস্তবকে তিনি মেনে নিতে চেয়েছিলেন। মন তবু মানে নি। তাঁর মনে পড়ছে নিজের শৈশবের কথা—

তখন তাঁর বয়স দশ এগারো। একদিন খাজাঞ্চী তাঁকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন মহারাজা বজ্রনারায়ণের কাছে। তাঁর হাতভর্তি টাকাগুলো দেখিয়ে খাজাঞ্চী অভিযোগ করেছিলেন, কোষাখানা খুললে রোজই কুমার মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে গিয়ে মাঠে ছড়িয়ে দেন আরও হয়তো কিছু বলতেন তিনি। কিন্তু মহারাজা তাঁকে চুপ করতে ইশারা করেছিলেন। গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে পরিহাস করেছিলেন বজ্রনারায়ণ—খাজাঞ্চী তোমাদের কুমারের মুঠো বড্ড ছোট। ওতে ফুলগঞ্জের রাজভাণ্ডার খালি হবে না।

—বাবা। বরুণার ডাকে পেছন ফিরেছিলেন রাজাবাহাদুর। আমার কাছে কিছু টাকা আছে। অরুদা চলে যাবার কয়েকদিন পর বামুনপিসী তাঁর সারাজীবনেরসঞ্চয় তিন হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আমার নামে লিখে দেন। বলেন, আমার বিয়েতে তাঁর আশীর্বাদ। আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি। মল্লিকাপুরে যাবার সময় কাগজগুলো এখানে রেখে গিয়েছিলাম। তাই ওগুলো তোমার জামাইয়ের হাতে পড়ে নি। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।

হাতুড়ির শব্দে বাস্তবে ফিরে আসে অতনু। কারখানার যন্ত্র বসছে গোলাপগঞ্জের দরবারকক্ষে। সুপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়িটা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ওখানে লিফ্‌ট বসবে। জীর্ণ আস্তাবলের জায়গায় সারি সারি গ্যারেজ তৈরি হয়েছে। সেই ঘরখানিতে!

যে ঘরে জাবেদা থাকত! যে ঘরে সেদিন খেমটার আসর থেকে বকুলবাঈ তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল—সে ঘরখানিতে সুরাইয়াজী কি করবেন?

অতনু আর ভাবতে পারে না। সে তাড়াতাড়ি সাইকেলে উঠে পড়ে। এগিয়ে চলে ফুলগঞ্জের পথে—যে ফুলগঞ্জ ছেড়ে জাবেদা চলে গেছে চিরকালের মতো।

॥ তেইশ ॥

আজ সুরেশবাবুর মেয়ের বিয়ে। রাণীমার অবস্থা ভাল নয়। অতনু তাই বিয়েতে যায় নি। বরুণা তো নয়ই। চাকরমহল ফাঁকা। কেষ্টদাস ও কালীতারা ছাড়া আর সবাইকে নতুন সরকারী ম্যানেজার ছাড়িয়ে দিয়েছেন। এই

অবস্থায় রাণীমাকে একা রেখে বরুণা ও অতনুর বিয়েতে যাওয়া সম্ভব নয়। সুরেশবাবু এসে রাজাবাহাদুরকে নিয়ে গেছেন। অতনু ও বরুণা যেতে পারল না বলে অনেক দুঃখ করে গেছেন তিনি।

এতক্ষণ রাণীমার কাছে বসে ছিল অতনু। বরুণার তাগিদে তাকে এসে শুয়ে পড়তে হয়েছে খানিক আগে। অতনু কোয়ার্টার ছেড়ে আবার রাজবাড়িতে তার পুরনো ঘরে ফিরে এসেছে। আজ কিন্তু ঘুম আসছে না অতনুর। সুরেশবাবুর মেয়েকে সে দেখে নি কোনদিন। তবু তাকে মনে মনে আশীর্বাদ করে—মেয়েটি সুখী হোক্। সে নিজে সুখী নয়। কিন্তু কেউ সুখে থাকলে সে সুখী হয়।

"দাদা।" বরুণা ডাকছে।

অতনুর ভাবনা মিলিয়ে যায়। সে উঠে বসে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। উৎকণ্ঠিত কন্ঠে জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েছে? রাণীমা কেমন আছেন?"

"তাড়াতাড়ি এসো। একটু আগে বাবা ফিরেছে। তাকে দেখে মা অজ্ঞান হয়ে গেছে। কি রকম একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে।"

অতনু বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। তাহলেও কোন প্রশ্ন করে না। সে বরুণার সঙ্গে ছুটে আসে রাণীমার ঘরে।

নীল আলোর অনুজ্জ্বল আভায় আচ্ছন্ন কক্ষ। মেহগনি কাঠের পালঙ্কে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শায়িতা মহারাণী—ফুলগঞ্জের গৃহলক্ষী। রোগবিধ্বস্ত মুখখানি রক্তহীন ও পাণ্ডুর। তীব্র একটা আতঙ্কের জ্বালা সে মুখে। যেন ভয় পেয়ে চোখ বুজেছেন। অলঙ্কারশূন্য বাহুযুগল বিছানার ওপর পড়েছে লুটিয়ে। শাঁখা দু'গাছিকে বড় বেশি অসহায় বলে মনে হচ্ছে। সিঁদুরের টিপ মুছে গিয়ে বালিশটা লাল হয়ে গেছে—যেন খানিকটা রক্ত দানা বেঁধে আছে।

রাজাবাহাদুর ঝুঁকে পড়ে রাণীমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। অদ্ভুত একটা দৃষ্টি তাঁর চোখে।

অতনুকে ঘরে ঢুকতে দেখেই রাজাবাহাদুর ঘুরে দাঁড়ালেন। নেশাজড়ানো স্বরে বলে উঠলেন, "দেখতো কি হলো? কিছুই যে বুঝতে পারছি না ছাই। একবার হেঁচকী তুললেন তিনি। তারপরে আবার বললেন, "এ জানলে কে সুরেশদের কথায় মদ খেতো? আমার কি দোষ? ওরাই তো বললে, আমি নাকি শুধু খাওয়াতেই পারি, খেতে পারি না। তাইতো একটু চেষ্টা করলাম। এই—এতটুকু।" আবার হেঁচকী উঠল। তা সত্ত্বেও দু'আঙুল দিয়ে তিনি মদের পরিমাণটা দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। টলতে টলতে বললেন, "পাছে হেঁটে ফিরতে অসুবিধে হয়, তাই সুরেশ একটা গাড়ি করে আমাকে পাঠিয়ে দিলে। আর এদিকে আমাকে দেখেই কিনা শান্তি একেবারে অজ্ঞান?"

রাজাবাহাদুর শান্তি নামেই ডাকতেন রাণীমাকে।

বিনামেঘে বজ্রপাত হলেও বোধহয় এর চেয়ে বেশি আশ্চর্য হতো না অতনু।

এতকাল মদের বিল জুগিয়েও যিনি মদ স্পর্শ করেন নি, আজ পুরানো মোসা-হেবের বাড়ি থেকে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছেন তিনি! মাতাল হয়ে রুগ্না স্ত্রীর শয্যাপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন গভীর নিশীথে!

অতনু এগিয়ে যায় রাণীমার কাছে। রাণীমা নিশ্চল নিরুদ্বিগ্ন ও নিথর। তবে কি · ?

আর ভাবতে পারে না অতনু। উত্তেজিতভাবে রাণীমার একখানি হাত হাতে তুলে নেয়। তাঁর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করতে চায়—নিস্পন্দ ও অচঞ্চল।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। তিনি চলে গেছেন ফুলগঞ্জ ছেড়ে। চলে গেছেন অদৃশ্যা-লোকে, হাসি কান্নার বৈতরণী পার হয়ে—যেখান থেকে আর ফেরার খেয়া মেলে না।

পঁচিশ বছর আগে যে অগ্নিকে সাক্ষী করে রাজাবাহাদুর একদিন গ্রহণ করেছিলেন রাণীমাকে, সেই অগ্নিতেই আজ তিনি আহুতি দিলেন তাঁর শান্তিকে মুখাগ্নি করে তিনি শ্মশানের সীমারেখায় বটের ছায়ায় সেই যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, আর এ মুখো হন নি।

ফুলগঞ্জের রাজলক্ষ্মীর নশ্বর দেহ মিলিয়ে গেল। মিশে গেল জলে-স্থলে আর অন্তরীক্ষে। এবার চিতাগ্নি নেভাতে হবে। ঢালতে হবে শান্তিবারি।

ফিরে এল কেষ্টদাস। রাজাবাহাদুর সেখানে নেই। কোথায় গেলেন? এখন খোঁজ করাও সম্ভব নয়। সময়ও নেই। ঈশান-কোণে একফালি কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়েছে। এখুনি হয়তো ঝড় উঠবে।

বরুণা নির্বাক। সে অপলক নয়নে চেয়ে আছে আগুনের দিকে।

ওকে বলা বৃথা। কেঁদে কেটে আকুল হবে। অতনু নিজেই একঘড়া জল এনে রাণীমার চিতায় ঢেলে দেয়। রাণীমার ছেলে নেই। কিন্তু অতনুকে তিনি ছেলের মতই স্নেহ করতেন। শ্মশানবন্ধুরাও হাত লাগায়। করতোয়ার স্নিগ্ধ শীতল বারিধারায় চিতাগ্নি নিভে যায়।

রাণীমা চলে গেলেন সকল আড়ম্বরের ঊর্ধ্বে—চরম অনাড়ম্বরে।

অতনু শুনেছে রাজাবাহাদুরের মা মারা গেলে এ মহকুমায় সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। তাঁর মৃতদেহকে পুরোভাগে নিয়ে নীরব শোকযাত্রা ফুলগঞ্জ পরিক্রমা করেছিল। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ উপেক্ষা করে কাতারে কাতারে নর-নারী, পথের দুধারে নতমস্তকে অপেক্ষা করেছিল সেদিন।

আজ সেই ভাগ্যবতী মহারাণীর একমাত্র পুত্রবধূর শেষযাত্রায় ব্যান্ড বাজল না, তোপ ফুটল না, টাকা উড়ল না। জনকয়েক সরকারী কর্মচারী একখানি খাটিয়াতে করে নিঃশব্দে রাণীমাকে শ্মশানে এনেছে। হৃত-যৌবন রাজোদ্যানের কয়েকটি রজনীগন্ধা গন্ধ বিলিয়েছে জনবিরল পথে। পেছনে অতনুর হাত ধরে বরুণা আর মর্মাহত রাজাবাহাদুরের সঙ্গে কেষ্টদাস ও কালীতারা শুধু শবযাত্রায়

অংশ নিয়েছে। আজ আর কেউ আসে নি শ্মশানে।

বরুণাকে নিয়ে দোতলায় উঠে আসে অতনু। যা ভেবেছে, ঠিক তাই—শ্মশান থেকে এসেই রাজাবাহাদুর আবার মদ নিয়ে বসেছেন। তাঁর চোখদুটি ঘোলাটে। চুলগুলো অবিন্যস্ত। ঘর্মাক্ত দেহ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তিনি।

বরুণা আর এগোতে সাহস পায় না। সে দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে থাকে।

অতনু কাছে এসে দাঁড়াতেই, হো হো করে হেসে উঠলেন রাজাবাহাদুর।

অদৃষ্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তিনি। মাতাল হয়ে বর্তমানকে অস্বীকার করতে চাইছেন। দুর্ভাগ্যকে অবজ্ঞা করছেন। ডেকে আনছেন ধ্বংস। ধ্বংস?

ধ্বংসের আর বাকি কি আছে?

প্রথম দিন অতনুকে মদ আনতে দেখে বরুণা আপত্তি করেছিল। অতনু তখন জবাব দিয়েছিল, "তোমার কি পিতৃহীন হবার ইচ্ছে হয়েছে বরুণা? অজ্ঞান করেই ওঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। জ্ঞান হলে যে উনি আত্মহত্যা করে বসবেন।"

সেদিন বরুণা কোন প্রতিবাদ করে নি। আজও সে বলে না কিছু। কেবল তার দু'চোখের কোল বেয়ে অবাধ্য অশ্রু ঝরে পড়ে।

অতনু ফিরে আসে বরুণার কাছে। শান্তস্বরে বলে, "চল আমরা ঘরে যাই। উনি কিছুক্ষণ একা থাকুন। কেঁদো না বোন! তোমাকে যে এখন শক্ত হতে হবে।"

বরুণা চোখ মোছে।

॥ চব্বিশ ॥

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাবার পরেই খবরটা প্রকাশ করলেন সরকারী ম্যানেজার: রাজাবাহাদুরকে আজকাল কিছু বলা বৃথা। কোন কথাই তিনি শুনতে চান না। শুনলেও মনে রাখতে পারেন না। উপরন্তু তিনি কখন কি অবস্থায় থাকবেন, তা কেউ জানে না। সুতরাং নতুন সরকারী ম্যানেজারও তাঁর সামনে বড় একটা আসেন না। তিনি তাই অতনুকেই সেরেস্তায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

খবরটা শুনেই অতনু বরুণার ঘরে আসে। বরুণা নিজের একখানা ছেঁড়া শাড়ী সেলাই করছিল। অতনুর আকস্মিক আগমনে সে একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি শাড়ীখানা লুকোতে চায় কিন্তু পেরে ওঠে না। বাধ্য হয়ে শুষ্ক হাসি মুখে টেনে জিজ্ঞেস করে, "ভোর না হতেই হাজির। কি সংবাদ?"

"সংবাদ একটা আছে, তবে শুভ নয়।" একটু থামে অতনু, "ফুলগঞ্জের মায়া কাটাতে হবে এবারে।"

"কি বলছো তুমি ?" আঁতকে ওঠে বরুণা।

"নতুন ম্যানেজার রাজবাড়ি খালি করে দেবার পরোয়ানা জারী করেছেন। এত বড় একটা বাড়ি অযথা ফেলে রাখার কোন মানেই হয় না। তাই প্রাসাদ বিক্রী করে দেনার অঙ্ক কমিয়ে ফেলার আদেশ এসেছে কোর্ট থেকে।"

"আমরা তাহলে যাব কোথায় ?" বরুণা কেঁদে ফেলে।

অতনুরও কান্না পাচ্ছে। তবু সে স্বাভাবিক স্বরেই বলে, "সরকার থেকে চল্লিশ টাকা বাড়ি ভাড়া দেবে। এবং মাসোহারাটা নাকি আপাতত আর কমবে না, দু'শ টাকাই থাকবে।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে অতনু আবার বলে, "আমি আপত্তি করাতে নতুন ম্যানেজার বললেন যে তাঁর ব্যক্তিগত সুপারিশের ফলেই নাকি কোর্ট এই ভাড়া মঞ্জুর করেছেন। সাধারণভাবে কুড়ি টাকার বেশি হাউস্-এ্যালাউন্স হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া ভারতের পনেরো আনা লোকের মাসিক আয়ই নাকি এর চেয়ে কম।"

রাণীমার ছবিখানার সামনে ধীর পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়ায় বরুণা। তারপরে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, "মা, তুমি আমাকে শক্তি দাও। আমি যে আর সইতে পারছি না।"

অতনু পালিয়ে আসে নিজের ঘরে। সে কিছুক্ষণ একা থাকতে চায়।

কিন্তু তা হয়ে উঠল না। কালীতারা এসে খবর দিল, "দু'জন বাবু এসেছেন। তাঁরা রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে চান।"

কে এল আবার ? অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতনুকে উঠতে হয়।

হলঘরে ঘুরে ঘুরে তৈলচিত্রগুলি দেখে বেড়াচ্ছিলেন দু'জন ভদ্রলোক। একজন বৃদ্ধ, আরেকজন অতনুর বয়সী—যৌবন বিগতপ্রায়।

অতনুকে দেখতে পেয়ে তাঁরা কাছে এলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক জানালেন, "আমরা কার্শিয়াং স্বাস্থ্যনিবাস থেকে আসছি, রাজাবাহাদুরের ডোনেশনটার জন্য।"

"ডোনেশন !" এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পায় অতনুর।

"আজ্ঞে হ্যাঁ! ফি বছর রাজাবাহাদুর দু'হাজার টাকা করে দিতেন—উনি আমাদের পেট্রন কি না। গত পাঁচ বছর আপনারা টাকা পাঠান নি। তাইতো সরাসরি রাজাবাহাদুরের কাছে দরবার করতে এলাম। না এসেই বা উপায় কি ? চিঠি লিখলেও আপনারা জবাব দেন না। চিঠি হয়তো তাঁর হাতেই পৌঁছয় না। যাক্‌গে, দয়া করে তাঁকে একবার খবর দিন। যা বলার আমরা তাঁকেই বলব।" ভদ্রলোক এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন কথাগুলো।

কিন্তু কাকে খবর দেবে অতনু ? রাজাবাহাদুর এতক্ষণে বোধহয় বোতল খুলে বসেছেন। হয়তো বেহুঁশ হয়ে গেছেন। হুঁশ থাকলেই বা কি হতো ? এক আধ হাজার নয়, দশ হাজার টাকা।

"লজ্জা করলেও বলতে হচ্ছে···" অতনু আরম্ভ করে।

কিন্তু তাকে শেষ করতে দেন না ভদ্রলোক, "আরে না, না, লজ্জার কি আছে ? আপনাদেরই কে একজন বলছিল বটে, রাজাবাহাদুর নাকি আজকাল প্রায় মাতাল

হয়ে থাকেন।" একটু থামেন তিনি, "তাতে কি হয়েছে, আপনি গেস্ট-হাউসে আমাদের একবেলার মতো থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন উনি সামলে উঠলে আমরা বিকেলের দিকে দেখা করব।"

"আমি ঠিক ··সেজন্য বলছি না।" অতনু ঢোক গেলে। "আমি বলছিলাম সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে।"

"তা যা বলেছেন মশাই। দিনকাল বড়ই খারাপ। আপনাদের এখানেও তো তার আভাস দেখতে পাচ্ছি। সত্যি বলতে কি আমার তো মশাই আজ ভয়ই হয়েছিল। ঐ একটি ঝি ছাড়া তো কোন চাকর-বাকরের দেখাই পেলাম না। আগে যখুনি এসেছি, দেখেছি লোক গিস-গিস করছে। অথচ আজ দেউড়ীতে দরোয়ান নেই। নহবত খালি। গাড়ি ঘোড়া যাতায়াত করছে না। আমি তো ভেবেছিলাম, রাজাবাহাদুর বোধহয় এখানে নেই।"

"রাজাবাহাদুর আছেন। কিন্তু এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এ গেছে।"

"কি যা তা বলছেন মশাই! ফুলগঞ্জ এস্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এ গেছে! ভদ্রলোক প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন।

শান্ত স্বরে অতনু বলে, "অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্যি। তাই বলছিলাম রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আপনারা শুধু কষ্টই দেবেন। এখন তাঁর পক্ষে আপনাদের কোন সাহায্য করাই সম্ভব নয়।"

"বড়ই দুঃখ পেলাম মশাই। এই দুনিয়ায় সবই সম্ভব। কিন্তু বিপদ কি জানেন? একটা নতুন অপারেশন থিয়েটার করছি। যন্ত্রপাতি এসে পড়েছে। টাকার অভাবে মালগুলো ছাড়াতে পারছি না।" ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন।

ঠিক কি করা উচিত অতনু ভেবে উঠতে পারে না। নিজের দায়িত্বে ওঁদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। অথচ রাজাবাহাদুর এখন কি অবস্থায় আছেন, কে জানে?

আর কিছু ভাবতে হলো না তাকে। রাজাবাহাদুর নিজেই হঠাৎ এসে ঢুকলেন হলঘরে।

নাঃ! সজ্ঞানেই আছেন। হয়তো কালীতারার কাছে খবর পেয়ে থাকবেন। আগন্তুকদ্বয় উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার বিনিময় করে রাজাবাহাদুর জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার? ওঃ! আপনাদের চাঁদাটা বোধহয় দেয়া হয় নি কয়েক বছর।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঁচ বছর।" বৃদ্ধ ভদ্রলোক মুখ খুললেন।

"কত করে দিতাম যেন?" রাজাবাহাদুর মনে করার চেষ্টা করেন।

"দু, হাজার।" ভদ্রলোক তাঁকে মনে করিয়ে দেন।

"দশ হাজার।" থামলেন রাজাবাহাদুর। একবার তাকালেন অতনুর দিকে। তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, "কোনরকমে দেয়া যায় না?"

"না।" অতনু বিরক্ত হয়। কি আশ্চর্য অবুঝ? এমনি করেই নিজেকে

টেনে এনেছেন এ অবস্থার মধ্যে। সে নির্ভীকভাবে উত্তর দেয়, "দশ হাজার দূরের কথা, দেবার মতো কিছুই নেই। তবু আপনি যখন বলেছেন, আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু।" অতনু থামে। তারপরে সে ভদ্রলোকদের দিকে তাকায়। বলে, "আমি আপনাদের হাজার-দুয়েক টাকা দিয়ে দিচ্ছি—তবে একটি শর্তে!"

"কী?" বৃদ্ধ ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন।

"আপনাদের খাতা থেকে রাজাবাহাদুরের নামটি কেটে দিতে হবে।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন রাজাবাহাদুর।

সবাই বিস্মিত হয় তাঁর আচরণে।

হাসি থামলে রাজাবাহাদুর অতনুকে বললেন, "আর কয়েকটা দিন সবুর কর। দুনিয়ার খাতা থেকেই আমার নাম কাটার সময় হয়ে এল বলে!"

॥ পঁচিশ ॥

মানুষ মরণশীল। কেউ চিরকাল থাকে না এ পৃথিবীতে। তবু অতনু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। বাবার মৃত্যু সংবাদের জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। এই তো সেদিন চিঠিতে লিখেছিলেন, ভালোই আছেন।

টেলিগ্রামটা এসেছিল বিকেলে। অতনু তখন বাসায় ছিল না। ফিরে আসার পরে বরুণা খবরটা দিয়েছে। শুনে শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠেছিল অতনু।

বরুণা তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। শক্ত হতে বলেছে। সারারাত তার শিয়রে বসে থেকেছে। পরের দিন সকালে তর্পণ করাতে গঙ্গায় নিয়ে গেছে। হবিষ্য করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। গতকাল স্টেশনে এসে তাকে গাড়িতে তুলে দিয়েছে।

আশ্চর্য মেয়ে। কে বলবে সে রাজার দুলালী। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম না করে, রাজকুমারী দুঃখের সঙ্গে করেছে মিতালী। অতনুকেও তাই করতে হবে। সব জ্বালা সইতে হবে।

দশ বছর বয়সে অতনু মাতৃহীন হয়েছে। মায়ের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এসেছে অতনুর। শুধু মনে পড়ে—একবার বৃষ্টি মাথায় করে ফুটবল খেলে তার খুব জ্বর হয়েছিল। মা সারারাত শিয়রে বসেছিলেন। তাঁর সেই দুশ্চিন্তা-ভরা সকরুণ মুখচ্ছবি অতনুর মনের মুকুরে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আর একদিন—ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাবার খবরটা ছুটে এসে দিতেই, মা তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। একটু একটু লজ্জা করছিল তার। তাহলেও বেশ ভাল লাগছিল। তাই কোল থেকে নামতেও চায় নি সে। কিন্তু ওদের ক্লাসের ভোলাটা আবার তখন এসে দাঁড়িয়েছিল উঠোনে। পরদিন স্কুলে ব্যাপারটা সে সবার কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল। রেগে ভোলার সঙ্গে আড়ি করেছিল অতনু। সে অভিমান অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

মায়ের অবর্তমানে, পিতা-মাতার যৌথ স্নেহে বাবা তাকে মানুষ করেছেন। স্নেহ করার জন তার এখনও আছে। আছে দাদা ও দিদিরা। তবে বাবার সঙ্গে তাদের কোন তুলনাই হয় না। বহুকাল থেকেই বাড়িতে তার একমাত্র আকর্ষণ বাবা।

অতনুর সেই স্নেহপ্রবণ পিতা আজ ইহজগতে নেই। এবারে আর তিনি লাঠি হাতে স্টীমার ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। স্টীমার থেকে নেমে প্রণাম করলে তার দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করবেন না—তোর কি অসুখ করেছিল নাকি? অতনু 'না' বললে, বলবেন না - তাহলে নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া করিস না ঠিকমতো। ভীষণ রোগা হয়ে গেছিস্। এবারে এক মাসের আগে তোকে যেতে দিচ্ছি না। দেখ না এরই মধ্যে আমি তোর শরীর কি করে দিই।

আজ বাবা নেই। জাবেদার মতো তিনিও অতনুকে ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁকে একবার শেষ-দেখাও দেখতে পেলো না সে।

ব্যাগ ও বিছানা কুলির মাথায় চাপিয়ে, স্টীমার কোম্পানীর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে, অতনু নেমে আসে মাটিতে—যে মাটির কাছ থেকে সে বিদায় নিয়েছিল বারো বছর আগে।

আজ আবার সে এসেছে সেই মাটির বুকে। কিন্তু আজ দেশের মাটির প্রতি কেন যেন সে আর আগের মতো আকর্ষণ অনুভব করছে না। তাহলে কি আপনজন না থাকলে, আপন দেশের প্রতি কোন মমতাবোধ জাগে না অন্তরে?

ছি ছি একি ভাবছে অতনু! জন্মভূমি চির-আরাধ্য, চির-চেনা, চির-আপন। আপনা থেকেই তার মাথা নত হয়ে আসে। সে মনে মনে প্রণাম করে তার দেশের মাটিকে।

তার পরে এগিয়ে চলে রাস্তার দিকে। কুলির ভাড়া মিটিয়ে একখানি সাইকেল রিক্শায় উঠে বসে। ত্রি-চক্রযান চলতে শুরু করে।

একফালি রুপোর পাতের মত কংক্রিটের রাস্তা। নদীর কূল ঘেঁষে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত—স্টীমার-স্টেশন থেকে চাঁদমারী-হিল পর্যন্ত। তারপরে বাঁক নিয়েছে ডাইনে। পথের দু'পাশে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে ঝাউয়ের সারি। ঝাউয়ের ফাঁকে ফাঁকে বেঞ্চিগুলো এখনো খালি। সূর্য যখন ঢলে পড়বে ঐ নারিকেল আর সুপারী বাগানের আড়ালে, শান্ত স্নিগ্ধ সোনালী রোদ ছড়িয়ে দেবে অশান্ত কীর্তনখোলার বুকে - বেঞ্চিগুলো তখন উঠবে ভরে। অশান্ত নদীর মতো উচ্ছল হয়ে উঠবে এ পথ। আনন্দ আর হাসি, প্রেম আর মিলন, চাওয়া আর পাওয়ার জগতে পরিণত হবে ঐ জনবিরল বেলাভূমি। ঢেউয়ের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে ধানের শীষ তাদের জানাবে অভিনন্দন। স্টীমারের হুইস্‌ল্ হবে তাদের মিলনের উলুধ্বনি।

অতনুর বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস। তার বড় আশা

ছিল জাবেদাকে নিয়ে সে একবার আসবে বরিশালে—তার জন্মভূমিতে। একদিন গোধূলি বেলায় দু'জনে এসে বসবে কীর্তনখোলার বেলাভূমিতে।

কিন্তু জাবেদা যে মুসলমান। কুলীন কায়েতের বাড়িতে সে পা ফেলবে কেমন করে? বাবার মোটেই আপত্তি ছিল না। কিন্তু দাদা-দিদিদের জন্যই অতনুর সে আশা পূর্ণ হয় নি। বিরহীর দীর্ঘশ্বাস মিশে যায় ঝাউয়ের শোঁ শোঁ শব্দে।

অবসন্ন দেহে বাবার ইজিচেয়ারখানার ওপর বসে অতনু। শ্রাদ্ধ শান্তি মিটে গেছে। এ'কদিন বিশ্রামের অবকাশ পায় নি। আজ বাড়িটা বড় শান্ত।

ছোড়দি এসে ঘরে ঢোকে। অতনু তাকে বসতে বলে। সামনের চেয়ারটার ওপর বসে ছোড়দি। একটু বাদে সে কথাটা পাড়ে, "সকলেব ইচ্ছে তুই এখানেই থেকে যা। দাদার অফিসে হিসেবের কাজ জানা একজন লোক নেবে। বড়বাবুকে ধরে দাদা সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে। ঘরের খেয়ে চাকরি করতে পারলে কে যায় বিদেশে? আর তাছাড়া তোর তো শুনলাম আজকাল চাকরি নেই।"

অতনু নিরুত্তর।

ছোড়দি আবার শুরু করে, "আর একটা কথা, বয়স তো পেরিয়ে গেল। এখনও সংসারী হবি না?" চেয়ার ছেড়ে কাছে এগিয়ে আসে ছোড়দি, আস্তে আস্তে বলে, "দাদা একটা মতলব ঠাউরেছে। তার বড়বাবুর একটি মেয়ে মাত্র। ডানাকাটা পরী নয়। বয়সটাও একটু বেশি। কিন্তু তাতে আর ক্ষতি কি? ভদ্রলোক বেশ দু-পয়সা জমিয়েছেন। সবই এই মেয়ে পাবে। তুই আর অমত করিস না।"

"সবাইকেই যে সংসারী হতে হবে, এমন তো কোন নিয়ম নেই।" অতনু শান্ত স্বরে জবাব দেয়।

"নিশ্চয়ই আছে। সারাটা জীবন মাতাল, অসচ্চরিত্র জমিদারের মোসাহেবী করবি?" ছোড়দি ক্ষেপে গেছে।

"আমাকে যা খুশি বলতে পারো, অন্যকে এর মধ্যে টানছ কেন? তিনি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করেন নি ছোড়দি।"

"একশো বার করেছে। তোকে ঘরছাড়া করেছে।"

দাদা ঘরে ঢোকেন। এতক্ষণ আড়াল থেকে শুনছিলেন। এখন একেবারে আসরে নেমে এসেছেন।

অতনু তবু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, "যদি জেনেই থাকো যে ঘরছাড়া করেছে তাহলে আমাকে আর ঘরে বাঁধবার চেষ্টা করছ কেন? তোমার তো আরও ভাই আছে। বাবার বংশ রক্ষার কোন অসুবিধে হবে না।"

ছোড়দিকে থামিয়ে দিয়ে দাদা গর্জে ওঠেন, "না, তা হবে না। তবে বিপুল তোর ছোট ভাই। তোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করে আমি বিপুলের বিয়ে দিতে পারছি না। শুধু তাই নয়। তোর ঐ বাঈজীর গর্ভজাত সন্তান আমার

বাপের ভিটে মাড়াতে পারবে না, একথা আমি আজই বলে দিলাম।"

বহুকণ্টে নিজেকে সামলে নেয় অতনু। তারপরে বলে, "তুমি আমার চেয়ে বড়। এ কথার জবাব দিয়ে · " শেষ করে না সে। একটু থেমে আবার বলে, "বেশ তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। কালই আমার অংশ তোমাদের দু' ভাইয়ের নামে রেজিস্ট্রি করে দেব। মনে ক'রো অতনু বলে তোমাদের যে ভাই ছিল, সে মরে গেছে।"

দাদা ও ছোড়দি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। অতনু বসে থাকে একা। বসে বসে ভাবতে থাকে – প্রথম যৌবনের ইতিহাস যতই মসিলিপ্ত হোক্, দাদা আজ সমাজের একজন। কাজেই তার বড় ভয়, পাছে ছায়া এসে তার বাবার সম্পত্তির ভাগীদার হয়।

বাঈজীর মেয়ে তার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে এক ভিটেতে বাস করতে পারে না। তাহলে তার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। যতদিন অতনু নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছে, ততদিন এ-সব প্রশ্ন ওঠে নি। এস্টেট বোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্-এ যাবার পর, বিশেষ করে জাবেদা চলে যাবার পর থেকে, সে আর বাড়িতে কোন সাহায্য করতে পারছে না। দাদা তাই তার বড়বাবুর কুরূপা অশিক্ষিতা ও বিগত-যৌবনা অরক্ষণীয়া কন্যার পাত্র হিসেবে তাকেই নির্বাচিত করেছে। এক ঢিলে তিন পাখী। বাঈজীর মেয়ের ভীতি কাটবে, নিজের পদোন্নতি হবে এবং সংসারে আয় বাড়বে।

বাঈজী! অতনু ভেবে চলে—জাবেদা সমাজের চোখে অসতী। কিন্তু সে যে অতনুর জনম-জনমের সতী-সাধ্বী স্ত্রী। পার্থিব কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে, নিস্কলুষ নির্মাল্য হাতে, যুগ যুগান্ত ধরে বসে থাকবে তারই পথ চেয়ে। সে-ও পাড়ি দিত সেই পথে। কিন্তু ছায়া?

তার মায়াময়ী জাবেদার ছায়া। অবিকল তেমনি টানা টানা দু'টি চোখ, তেমনি মাথাভর্তি কালো কোঁকড়ানো চুল। ঠিক তেমনি কণ্ঠস্বর।

ছায়াই তার বাধা। অতনুর তাকে কথা দিতে হয়েছে—রাজাবাহাদুর ছুটি দিলে, সে তার কাছে গিয়ে থাকবে। ছায়া ছুটি না দিলে তার ছুটি নেই।

কিন্তু ছায়া নয়, জাবেদার মুখখানি ভেসে ওঠে অতনুর চোখের সামনে। সেই শিউলীতলার আনন্দোচ্ছল মুখ নয়। অনিচ্ছায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার বিষাদে ভরা একখানি মুখ। মৃত্যুর কালো ছায়া যেন নেমে এসেছিল তার মুখে।

একসময় অতনুর ডাকে সাড়া দিল জাবেদা। সে চোখ মেলে তাকালো।

অতনু চিৎকার করে উঠল—এ তুমি কি করলে জাবেদা?

—খোদার মর্জি।

সত্যই তাই। খোদা বড় নিষ্ঠুর। নিরপরাধ জাবেদা সামান্য একটা ভুলের জন্য সারাজীবন ধরে শুধু সমাজের শিকার হয়েছিল। যখন সে সবে একটু সুখের মুখ দেখতে শুরু করেছিল, তখুনি খোদা তার সব সুখ কেড়ে নিলেন।

খোদা এত বড় অবিচার করলেন কেন ?

অতনুর দু'চোখ ছাপিয়ে জল নেমে এল।

—তুমি কাঁদছ ? যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠে জাবেদা প্রশ্ন করেছিল।

অতনু কোন উত্তর দেয় নি। সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে একটা বালিশ এনে তার মাথার নিচে দিতে চেয়েছিল।

জাবেদা ক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি করল—বালিশ নয়, আমার মাথাটা তুমি কোলে নিয়ে বসো। আমি তোমার কোলে শুয়ে শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি।

—জাবেদা ! অতনু চিৎকার করে ওঠে।

জাবেদা একটু হাসল। বড় করুণ হাসি। তারপরে বলল—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। গুলি আমার কলিজায় লেগেছে। আমি আর বাঁচব না। কিন্তু বড় আনন্দ নিয়ে আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ঐ শয়তান বীরেশ্বরটা আর কোনদিন কারও ক্ষতি করতে পারবে না। আমাকে মেরে ফেলার জন্যই ওর ফাঁসি হবে।

—না, না, না। আমি তোমাকে ভালো করে তুলবই। তুমি একটু একা থাকো। আমি লোকজন ডাকছি।

জাবেদাকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অতনু সেদিন ছুটে গিয়েছে গোপালবাবুর কোয়ার্টারে। তাঁর ছেলে খবর দিয়েছে রাজবাড়িতে। ছুটে এসেছে কালীতারা ও বরুণা। এসেছে কেষ্টদাস, গোপালবাবু ও সুরেশবাবু। এসেছেন রাজাবাহাদুর ও ডাক্তারবাবু। আরও অনেকে।

কিন্তু ডাক্তারবাবু কোন আশাই দিতে পারলেন না। পরদিন সকালে সদর থেকে সাজ-সরঞ্জাম আনিয়ে তিনি অপারেশন করলেন। কিন্তু গুলিটা বের করা গেল না।

সেদিনই গোপালবাবু ছায়াকে আনতে দার্জিলিং চলে গেলেন। পরদিন বিকেলে ছায়া এলো। তখন যমে মানুষে লড়াই চলেছে। আগের রাতে জাবেদা আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

সকালে সে চোখ মেলে তাকালো। ছায়া 'মা' বলে ঝুঁকে পড়ল তার মুখের সামনে।

ছায়াকে চিনতে পারল জাবেদা। মাকে জড়িয়ে ধরতে গেল ছায়া। ডাক্তারবাবু বাধা দিলেন।

জাবেদার দু'চোখ বেয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় অশ্রু ঝরতে থাকল।

অতনু তার চোখ মুছিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব, তারপরে জাবেদা তার শীর্ণ হাত দু'খানি দিয়ে অতনু ও ছায়ার দু'খানি হাত ধরল। ক্ষীণ ও অস্পষ্ট স্বরে কোনমতে অতনুকে বলল —তোমার মেয়েকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। দেখো, আমার মতো তার জীবনটা যেন বরবাদ না হয়ে যায়। একবার থেমে দম নিল জাবেদা। তার সারা শরীরটা তখন অসম্ভব দুলছে। তবু সে ধুঁকতে ধুঁকতে বলল—

এবারে তোমরা আমাকে ছুটি দাও।

অতনু বুঝতে পারল জাবেদার কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। দেখতে পেল—সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তার জীবনীশক্তি কমে আসছে। সে করুণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে তাদের দিকে।

অতনু ছায়াকে বুকের কাছে টেনে নিল। জাবেদার দৃষ্টিতে ঝরে পড়ল পরম প্রশান্তি। সে হয়তো আরও কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না। কেবল তার বুকের ভেতর থেকে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার শব্দ জেগে উঠল। তারপরেই সব নীরব।

—মা! ছায়া কেঁদে উঠল।

—জাবেদা! অতনুও ঝুঁকে পড়ল তার মুখের ওপরে।

—বকুল! রাজাবাহাদুর চিৎকার করে উঠলেন।

নেই। মা নেই, জাবেদা নেই, বকুল নেই। গোলাপগঞ্জ-প্রমোদকাননের শেষ ফুলটি তখন পড়েছে ঝরে।

লখনউয়ের জাবেদা খাতুনের জীবন-প্রদীপ নিভে গেল ফুলগঞ্জের রাজবাড়িতে। তার মধুক্ষরা কন্ঠ স্তব্ধ হলো চিরতরে! মোহভরা দৃষ্টি হলো অন্ধ। যে ছন্দ জড়ানো পায়ের নূপুরধ্বনি ঝিল্লিকে লজ্জা দিত, সেই পা দু'খানি হলো অসাড়। যে হাতের মধুর স্পর্শ পাবার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো, সেই হাত হলো নিথর।

মানুষের সমাজ দেহায়তনের বাইরে যাকে কোন মূল্য দেয় নি, বকুলবাঈয়ের সেই সুন্দর নারী-দেহটা কিন্তু তখনও পড়ে ছিল সবার সামনে। অথচ বীরেশ্বরবাবুরা সেদিন ভিড় জমায় নি সেখানে।

॥ ছাব্বিশ ॥

বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে অতনু ফিরে চলেছে কলকাতায়। চলেছে রাজাবাহাদুরের কাছে। নিজের বাড়িতে আজ তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তার প্রয়োজন ফুরোয় নি বরুণা ও রাজাবাহাদুরের কাছে। সে ছাড়া আর সবাই যে তাঁদের ছেড়ে চলে গেছে।

স্টীমার ছেড়েছে অনেকক্ষণ। বরিশাল শহর গেছে মিলিয়ে। হারিয়ে গেছে বেল্‌স পার্ক, চাঁদমারী হিল আর সেই সারি সারি ঝাউ গাছে ছাওয়া মসৃণ পথটি। জন্মভূমিকে পেছনে ফেলে অতনু চলেছে এগিয়ে। কে জানে, এই হয়তো জন্মভূমির কাছ থেকে তার শেষ বিদায়—যেমন অরুণ একদিন বিদায় নিয়েছে ফুলগঞ্জ থেকে।

নলছিটি এসে গেল। স্টীমার ঘাটে ভিড়তেই অতনু রেলিংয়ের পাশে এসে

দাঁড়ায়। যাত্রীদের ওঠানামা, কুলিদের ছুটোছুটি, খালাসীদের ব্যস্ততা—দেখতে ভালো লাগে তার। বৃদ্ধ সারেং মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। খালাসীরা যন্ত্রের মতো তাঁর নির্দেশ মেনে চলেছে। অতনু তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। ভুলে গিয়েছে তার বিশ্রামের প্রয়োজন। গত দু'রাত সে একদম ঘুমোতে পারে নি। সম্পত্তির অংশ লিখে দেবার পর, আপনজনেরা তার বিদায়ের প্রতীক্ষা করছিল।

সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে পেরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। তবে মনটা এখনও ভারী হয়ে আছে।

বহুদিন দেশছাড়া হলেও দেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি এতকাল। বাবা ছিলেন, বাড়ি ছিল। এখন আর কেউ নেই, কিছু নেই—এবারে অগস্ত্য যাত্রা।

হঠাৎ অতনু কাঁধে একটা সবল স্পর্শ অনুভব করে। সে বাস্তবে ফিরে আসে।

পেছন ফেরে অতনু। কে? সে চমকে ওঠে।

"কে?" অতনু চেঁচিয়ে ওঠে, "অরুণ!"

"হ্যাঁ অতনুদা! আমি আপনাদেরই অরুণ।" সে জড়িয়ে ধরে অতনুকে।

একসময় ওরা আলিঙ্গন মুক্ত হয়। তবু আনন্দ ও উত্তেজনায় অতনু কোন কথা বলতে পারে না। সে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে অরুণকে দেখে। তার পরনে রঙীন খদ্দরের পায়জামা ও গায়ে আজানুলম্বিত পাঞ্জাবী, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। চোখে পুরু কাচের মোটা ফ্রেমের কালো চশমা। পকেট-ঘড়ির সোনার চেনটা বুকের ওপর জ্বলজ্বল করছে। সামনের চুল উঠে গিয়ে কপালটা আরো প্রশস্ত হয়েছে। বিচিত্র পোশাক কিন্তু আশ্চর্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা।

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তারপরে অতনু বিস্ময় কাটিয়ে জিজ্ঞেস করে "কেমন আছ? কোথায় যাচ্ছ?"

"ভালোই।" অরুণ উত্তর দেয়, "বরিশালে এসেছিলাম সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে, এখন কর্মস্থল বাঙ্গালোরে ফিরে যাচ্ছি।"

অতনুর মনে পড়ে, সে কাগজে দেখেছে শিল্পাচার্য অরুণ লাহিড়ী এখানকার এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছেন। কিন্তু সেই সভাপতি যে তার বামুনপিসীর অপদার্থ সন্তান, তা সে ধারণাই করতে পারে নি। অতনু আবার আলিঙ্গন করে অরুণকে। বাঙ্গালোর আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ও নিখিল ভারত শিল্পী সংসদের সভাপতির মাথাটি অতনুর কাঁধের ওপর আশ্রয় নেয়।

ডিনারের পর ডেক চেয়ারে বসে অরুণ বলতে থাকে তার জীবন কাহিনী—একদিন বিকেলে চৌরঙ্গীর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছিল সে। তখন ঘটনাচক্রে বাঙ্গালোর আর্টস এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দলবলসহ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কথায় কথায় অরুণ তার ঝুলি থেকে তাঁকে কয়েকখানি অবিক্রিত ছবি দেখায়। ভদ্রলোক অরুণকে পরদিন দেখা করতে বলেন তাঁর সঙ্গে।

যে-সব ছবিগুলো তখন পর্যন্ত কোন খদ্দেরকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, পরদিন তিনি সেগুলো কল্পনাতীত দাম দিয়ে কিনে নিলেন। অরুণকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন বাঙ্গালোর যাবার জন্যে। অরুণ সে সুযোগ অবহেলা করে নি।

তারপর গত সাত বছর শুধু সুযোগের সদ্‌ব্যবহার। সোপানের পর সোপান বেয়ে অরুণ আজ উন্নতির প্রায় শিখরে উঠেছে। উপন্যাসের মতই চমকপ্রদ সে কাহিনী। প্রতিভার সোনার-কাঠির পরশে বাধা বিপত্তির প্রাচীর পড়েছে ধসে। যশ আর প্রতিষ্ঠা তাকে বিজয়মাল্য দিয়েছে পরিয়ে। বাঙ্গালোর আর্টস কলেজের অধ্যাপক থেকে অধ্যক্ষ। দক্ষিণ ভারত শিল্পী সংঘের সভ্য থেকে নিখিল ভারত শিল্পী সংসদের সভাপতি। ইতিমধ্যে য়ুরোপ আমেরিকা চীন ও জাপান ঘুরে এসেছে। আজ সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের অন্যতম। শিল্পীর স্বপ্ন হয়েছে সফল। ফুলগঞ্জ সেদিন যাকে নির্বাসিত করেছিল, আজ বিশ্ব তাকে করেছে বরণ।

"একবার চলুন না।" উচ্ছ্বসিত অরুণ অতনুকে বলে, "বাঙ্গালোর থেকে বেড়িয়ে আসবেন। দেখবেন কি সুন্দর স্টুডিও বানিয়েছি। কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়াল, কাঠের সিলিং আর খড়ের চাল। শীতে গরম, গরমে ঠান্ডা। জায়গাটাও আপনার খুব ভালো লাগবে। জানালা দিয়ে তাকালে দেখবেন, নীল আকাশের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ধূসর পাহাড়। সারাদিন সেখানে চলেছে রঙের খেলা। পাশে বয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণা। বাঙ্গালোর হচ্ছে পূর্ব আর উত্তরবঙ্গের সংমিশ্রণ। বরিশালের নদী-নালার সঙ্গে দার্জিলিংয়ের পাহাড় মেশালে যা হয়। দেখবেন ·" একবার থামে অরুণ। তারপর বলে, "দেখবেন বাংলাদেশে যার দু'মুঠো অন্ন জোটে নি, সেই অরুণকে কত ভালোবাসে ওখানকার জনসাধারণ।" ডেক-চেয়ারের হাতলের ওপর রাখা টিন থেকে একটা সিগ্রেট তুলে নেয় সে।

অতনু জিজ্ঞেস করে, "খুব সিগ্রেট খাও বুঝি?"

"শুধু সিগ্রেট কেন? বড়টাও না হলে চলে না। সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে অরুণ আবার বলতে থাকে, "জ্ঞানলাভের পর থেকে দেখছি মানুষ মদ খায় স্ফূর্তির জন্যে। আমি কিন্তু মদ ধরেছি দুঃখের হাত থেকে রেহাই পেতে। মা ও রুণার অভাব ভুলতে।" একবার থামে অরুণ। তারপরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলতে থাকে। "ডাক্তাররা নিষেধ করেন। আমি শুনি না। ওঁরা ভয় দেখান, আমি হাসি। কেন জানেন?"

"কেন?" অতনু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

অরুণ একটু হাসে। বলে, হৃদয় নিয়ে আমার কারবার। চোখ আর হাত দু'খানি আমার মূলধন। লিভার পচে গেলে আমার ক্ষতি কি? লিভারের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অনুভূতিও হবে শেষ, চোখ আর হাতের খেলাও যে ফুরোবে, তা আমি জানি। কিন্তু আমি শিল্পী। সেই ভয়ে আমি হৃদয়ের দাবীকে

অস্বীকার করি কেমন করে ?"

যাত্রীদের কলগুঞ্জন থেমে গেছে। সবাই সুপ্তিমগ্ন। মাঝে মাঝে সারেংয়ের ঘন্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। উত্তাল জলরাশি ভেদ করে এগিয়ে চলেছে স্টীমার। ঝালকাঠি ও হুলারহাট চলে গেছে। স্টীমার আর কোথাও থামবে না। কাল খুব সকালে একেবারে—সোজা খুলনা। সেখানে রেলে চেপে দুপুরে শেয়ালদা। মাত্র ২১৩ মাইল পথ যেতে আঠারো ঘন্টা সময় লাগছে। তাহলেও অতনুর এই যাত্রাপথকে বড় ভালো লাগে। সে সোচ্চার স্বরে সবাইকে বলে বেড়ায়—এমন বৈচিত্র্যময় আনন্দ-ভ্রমণ খুব কমই আছে।

নদীর বুকে ঘন অন্ধকার। সার্চলাইট শুধু খানিকটা জায়গা আলোময় করে তুলেছে। অরুণ অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে।

অরুণ আবার বলতে থাকে, "অতনুদা, জীবনে চেয়েছিলাম শান্তি, পেলাম প্রতিষ্ঠা। চেয়েছিলাম প্রেম, পেলাম ঐশ্বর্য। অথচ যে পরিবেশে আমাকে মানুষ হতে হয়েছে, সেখানে ঐশ্বর্য ছাড়া যে আর কিছু জীবনের কাম্য হতে পারে—এ ধারণা হবারই সুযোগ মেলে নি। মাকে মনে পড়ে, দাসীবৃত্তি করে আমাকে বড় করেছেন। একবার তাঁর খুব শখ হয়েছিল যাত্রা শোনার। তখন শীতকাল। একখানা আলোয়ানের অভাবে যেতে পারেন নি। আর এখন এক একটি মূর্তি তৈরি করে আমি এককাঁড়ি করে টাকা পাচ্ছি। আজ ···" অরুণ একবার থামে, "আজ মা নেই। রুণা থেকেও নেই। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস!"

অরুণের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই অতনুরও বার বার এই কথাটা মনে হচ্ছিল। তারও মনে পড়ছে বরুণা ও বামুনপিসীর কথা। অলক্ষ্যে তার বুক চিরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে যথাসম্ভব স্বাভাবিক কন্ঠে বলে, "ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্তি বামুনপিসীর তো কোনকালেই ছিল না ভাই! তোমাকে মানুষ করবার জন্যই তিনি সারাজীবন কস্ট সয়েছেন। আজ তুমি বড় হয়েছ, তাঁর স্বর্গগত আত্মা শান্তি লাভ করেছে।"

অরুণ কিন্তু নিজের কথাই বলে চলে। বলে, 'কি আশ্চর্য দেখুন, আজ আমার এত টাকা অথচ সেদিন অর্থাভাবই আমাকে ফুলগঞ্জ থেকে বিতাড়িত করেছে। মাকে ছেড়ে, রুণাকে ছেড়ে, আপনাদের ছেড়ে আমাকে অজানা পথে পাড়ি দিতে হয়েছে। সেদিন ফুলগঞ্জের কেউ বোধহয় জানত না যে ঐশ্বর্য চিরস্থায়ী নয়—আর তাই ঐশ্বর্যশালী অমরপ্রসাদ, আজ হোটেলের দালাল।'

"সেকি? তুমি কেমন করে জানলে?" অতনু অবাক হয়।

"বরিশাল আসার পথে সেদিন যখন বাঙ্গালোর থেকে হাওড়ায় পেঁছিলাম, তখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আমাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। প্ল্যাটফর্ম ভর্তি কৌতূহলী জনতা। তার মধ্যেও আমার দৃষ্টি এড়ায় না। চেহারাটা অনেক পালটে গেছে। তবুও আমার সন্দেহ হলো। লোকটিকে কাছে ডাকলাম। দেখলাম আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়। সেই আপনাদের অমর সাহেব

—ফুলগঞ্জের আদর্শ জামাই। কলকাতায় এক হোটেলের এজেন্ট—খদ্দের জোগাড় করতে হাওড়া স্টেশনে কর্মরত।

"আমি তার হোটেলেই উঠলাম! স্টেশন থেকে সে-ও আমার সঙ্গে এলো। অনেক কান্নাকাটি করল—অনুতাপ করল। অকপটে সব কথা বলল আমাকে—রুণার প্রতি দুর্ব্যবহার থেকে নিজের বর্তমান দুরবস্থার কথা। জমিদারী নিলাম হয়ে গেছে। অসিতপ্রসাদ মারা গেছেন। স্বামীপরিত্যক্তা সুজাতা কলকাতার একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সেলস্‌গার্ল। অমর আমাকে অনুরোধ করল একটা স্থায়ী চাকরি জোগাড় করে দিতে। দুঃখ হলো দেখে। লোকটা সত্যই বদলে গেছে।"

"বদলে গেছে?" অতনু প্রতিবাদ করতে চায়।

"হ্যাঁ অতনুদা, বদলে গেছে।"

"কেমন করে বুঝলে?"

"হোটেলের ঘরে আমাকে মদের বোতলের ছিপি খুলতে দেখে, অমর ছোঁ মেরে বোতলটা নিয়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিল। রেগে কিছু বলতে যাবো, দেখি সে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল—অপরাধ নেবেন না। মদ আমাকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে। তাই আমি কাউকে এখন মদ খেতে দেখতে পারি না। আপনাকে উপদেশ দেবার সাহস আমার নেই। তবু বলব, মদ খাবেন না। ওর মত সর্বনাশী আর নেই। হেসে জবাব দিয়েছিলাম—সর্বহারার তো সর্বনাশীকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই অমরসাহেব।"

অতনু জিজ্ঞেস করে, "তুমি আবার তাকে বলেছো নাকি, কবে কলকাতায় ফিরবে?"

অরুণ একটু হাসে। বলে, "ঠিক কবে ফিরব জানতাম না বলে তারিখটা বলতে পারি নি। তবে আমি এবারেও সেই হোটেলেই উঠছি।"

"না!" অতনু আপত্তি করে। তুমি জান না অরুণ, লোকটা কত বড় ব্রুট্?"

"আমি জানি অতনুদা। সে নিজেই আমাকে সেকথা বলেছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, রুণার কথা জিজ্ঞেস করতেই সে কেঁদে ফেলেছে। বলেছে রুণার দেখা পেলে, সে তার কাছে ক্ষমা চাইবে। রুণা ক্ষমা না করলে তার নাকি নরকেও ঠাঁই হবে না। সে শুনেছে রুণা এখন কলকাতায়। অনেক খুঁজেছে তাকে, কিন্তু খোঁজ পায় নি।" একটু থামে অরুণ। একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস তার বুক চিরে বেরিয়ে আসে। তারপরে বলে, "ভালোই হলো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আরেকবার চেষ্টা করে দেখি রুণাকে সুখী করা যায় কিনা।"

তুমি কি বলছ! বরুণাকে সুখী করার জন্যে তুমি অমরকে চাকরি দেবে!' অতনু বিস্মিত।

"অমর ছাড়া আর কে তাকে সুখী করতে পারে অতনুদা ?"

অতনু বোধহয় বিরক্ত হয় তার উক্তিতে। সে অরুণের প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না। চুপ করে থাকে। ডেকে আর কোন যাত্রী নেই। সবাই যে যার কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। এতক্ষণে নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। কেবল ওরা দু'জনে নিদ্রাহীন।

একটু বাদে অরুণ আবার বলে, "আমি জানি অতনুদা, রুণার ওপরে অমরের কোন আইন-সঙ্গত অধিকার নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তো আইনের অপেক্ষা রাখে না। অগ্নি সাক্ষী করে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা যে জন্ম-জন্মান্তরের। এ্যাফিডেবিট্ করে সে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না। অমরকে দেখলেই আপনি তা বুঝতে পারবেন।"

"কিন্তু বরুণা যে কোনদিন তাকে চায় নি অরুণ! সে চেয়েছে তোমাকে।"

অরুণ বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্য। একটু বাদে সে বলতে থাকে, "রুণা তো আমাকে পেয়েছে অতনুদা। আমি প্রতি সন্ধ্যায় বাঙ্গালোরে বসে আমাদের বাসর রচনা করি। আমার শিল্প সৃষ্টির মধ্যে আমি তার সঙ্গে মিলিত হই। আমি প্রমাণ করতে পেরেছি, যে মিলন মানে মনের সঙ্গে মনের সমন্বয়, আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ সাধন।"

"কিন্তু বরুণা তো তোমার মতো শিল্পী নয় অরুণ, সে সাধারণ নারী। এমন পাওয়ায় যে তার মন মানবে না ভাই!" অতনু আহতকণ্ঠে বলে।

"তার অবাধ্য মনকে শান্ত করাতে হবে। আর তাই তো আমি চলেছি আপনার সঙ্গে।"

"সে কি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হবে ?" অতনু চিন্তিত।

"তাকে সম্মত করাবার দায়িত্ব আমার।" অরুণের কণ্ঠস্বরে গভীর আত্ম-বিশ্বাস। "কেবল আপনি আমাকে বাধা দেবেন না অতনুদা!"

নির্দিষ্ট সময়ে স্টীমার গন্তব্যস্থলে এসেছে। ওরা জল থেকে ডাঙায় উঠেছে —স্টীমার ছেড়ে ট্রেনে চেপেছে।

ট্রেন চলেছে এগিয়ে। অরুণ অতনুর টিকেট পালটে নিয়েছে। সে-ও অরুণের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীতে চলেছে। একটা ক্যুপে রিজার্ভ করে নিয়েছে। তার কথা ফুরোতেই চায় না। বহুদিনের সযত্নে সঞ্চিত প্রশ্নরাশি একসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে।

কথার মাঝে ফুলগঞ্জের প্রসঙ্গ উঠলেই অরুণের কণ্ঠস্বরটা বড় বেশি ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসে, "বকুলদি কেমন আছে ?"

অতনু চট করে কোন উত্তর দিতে পারে না। একটু বাদে করুণকণ্ঠে বলে, "স্বর্গে।"

"সেকি!" আঁতকে ওঠে অরুণ, "বকুলদি মারা গেছে!"

"না। তাকে মেরে ফেলেছে।"

"কে ?"

"বীরেশ্বর।" অতনু উত্তর দেয়। তারপরে সে শান্তস্বরে সেই মর্মান্তিক কাহিনী বলে। বলে সেই সমাজ-পরিত্যক্তা রমণীর আশ্চর্য আত্মত্যাগের কাহিনী।

অরুণ শুধু শোনে। সে কোন মন্তব্য করে না। কেবল কিছুক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো বা জগৎকে দেখে। পৃথিবী বড় সুন্দর। কিন্তু সেই সুন্দর পৃথিবীটা অন্ধকারে ঢেকে আছে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। তারপরে অরুণ জিজ্ঞেস করে, "বকুলদির মেয়েটি এখন কোথায় ?"

"স্বামীর ঘরে।" অতনু উত্তর দেয়, "গাড়োয়ালের উত্তরকাশী জেলায় নৈটয়ার বলে একটা জায়গায়। জামাই ওখানকার ফরেস্ট রেঞ্জার।"

"আপনাকে যেতে বলে না ?"

"বলে না আবার ? প্রতি মাসেই তাগিদ আসে। সেই সঙ্গে প্রলোভন —তমসার তীরে ছবির মতো সুন্দর পাহাড়ী গ্রাম নৈটয়ার। জানলা দিয়ে তাকালেই বারোমাস তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যায়। আর শীতকালে ওখানেই বরফ পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কেমন করে যাই বল ? রাজাবাহাদুর অসুস্থ।"

"অসুস্থ ? কি হয়েছে তাঁর ?" অরুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

"আর কি ? লিভারের ব্যাধি। বেশি মদ খেলে যা হয়।"

"মদ ? মামা মদ খান !" অরুণ বিস্মিত।

"হ্যাঁ ভাই। তাঁর শান্তিকে হারিয়ে—সর্বস্বান্ত হয়ে, মদের মধ্যেই তিনি শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। এখন একেবারে উত্থানশক্তিরহিত। টাকার অভাবে ভালো করে চিকিৎসা করাতে পারছি না। বরুণাকে একা রেখে কোথাও যেতে সাহস হয় না। এই ক'দিনের জন্যে বাড়ি আসতেই ভরসা পাচ্ছিলাম না। নেহাৎ বরুণা জোর করে পাঠালে, নইলে গঙ্গার ঘাটে বসেই বাবার শেষ কাজ করতে হতো। তবে বরুণার যদি একটা ব্যবস্থা হয় আর রাজাবাহাদুরের আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তবে নিশ্চয়ই যাব ছায়ার কাছে—আমার মেয়ের কাছে। সেই তো আমার শেষ আশ্রয়।"

॥ সাতাশ ॥

ট্যাক্সি থেকে নেমে অতনু বলে, "এসো। এখানেই নামতে হবে, গলির ভেতর গাড়ি ঢুকবে না।"

"চলুন।" অরুণ গাড়ি থেকে নামে। সে যেন একটু অন্যমনস্ক।

সংকীর্ণ স্যাঁতসেঁতে একটা গলি দিয়ে অতনুর পেছনে হেঁটে চলে অরুণ। দু-পাশে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো বাড়ি-ঘর —মাঝে মাঝে খোলার

চাল। ফুলগঞ্জের রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে অরুণকে এমন একটা গলিতে ঢুকতে হয়েছে, তা যেন এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

একটা খোলার ঘরের সামনে এসেই দাঁড়ায় অতনু। সে টিনের দরজায় করাঘাত করে। ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের সাড়া আসে, "আসছি।"

অরুণ হঠাৎ বলে ওঠে, "আমি বরং আজ চলে যাই অতনুদা! হোটেলে হয়তো অনেক জরুরী চিঠিপত্র এসে পড়ে আছে। রাত আটটায় আবার একটা মিটিং আছে। বাড়ি তো দেখেই গেলাম, কলকাতায় থাকতেও হবে কয়েকদিন। কাল একেবারে অমরকে সঙ্গে নিয়ে আসব'খন।"

একটা আর্তনাদ করে দরজাটা খুলে যায়। ফুলগঞ্জের রাজকুমারী নয়, নিঃসম্বল সংসারের স্বামী-পরিত্যক্তা অভাগিনী এক নারী। বরুণা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। অতনু থমকে দাঁড়ায়। সে বরুণার দিকে তাকায়।

"কে?" বিস্ময়ে ও আনন্দে চীৎকার করে ওঠে।

"আমি অরু।" স্নিগ্ধ কণ্ঠে জবাব দেয় অরুণ।

অরুণ ফিরে এসেছে। তবু হাসতে পারে না বরুণা। অথবা সে এমন হাসি হাসছে, যে হাসির শব্দ শুধু নিজের বুকের মধ্যেই ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হয়।

"কি? চুপ করে রইলে কেন?" আবহাওয়াটাকে হালকা করে তুলতে অতনু বরুণাকে বলে, "দেশবরেণ্য ভাস্কর অরুণ লাহিড়ী তোমার দর্শনপ্রার্থী।"

কিন্তু কোন ফল হয় না। নিজেকে সামলাতে পারে না বরুণা। সে ছুটে ভেতরে চলে যায়। অরুণকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে আসে অতনু।

আস্তরবিহীন তিন ইঞ্চি দেয়ালের দুখানি ছোট ছোট ঘর। মেঝেটা বাঁধানো। পেছনে খোলা বারান্দা—সেখানেই বরুণার রান্নার পাট। একফালি উঠোন আর একটা কুয়ো নিয়ে এই বাসা—ফুলগঞ্জের রাজাবাহাদুরের বর্তমান বাসগৃহ।

অতনু অরুণকে নিয়ে সামনের ঘরে আসে। সে এঘরেই থাকে। পাশের ঘরে রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কে এল রে?" সিংহের গর্জন নয়, মুমূর্ষের আর্তনাদ।

জবাব দিতে যেন একটু দেরি হয় বরুণার। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে সে বলে, "দাদা এসেছে।"

"এসে গেছে। যাক্, নিশ্চিন্ত। কোথায়? তাকে এখানে ডাক।" রাজাবাহাদুর যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। অতনু ছাড়া যে আজ আর কেউ নেই তাঁর।

ডাকার দরকার হয় না। অরুণকে নিয়ে অতনু সে ঘরে ঢোকে। রাজাবাহাদুরের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মোসাহেবের ভিড়ে যিনি কোনদিন মানুষের অভাব বোধ করেন নি, আজ তিনি বড় একা। অতনু আজ তাঁর কাছে অপরিহার্য।

"ওদিকে সব মিটে গেছে ভালোভাবে ?" রাজাবাহাদুর জিজ্ঞেস করেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

অরুণের দিকে নজর পড়ে রাজাবাহাদুরের। জিজ্ঞেস করেন, "তোমার বন্ধু বুঝি ?"

"হ্যাঁ। শুধু আমার নয়, আমাদের সবার। অরুণ। ও এখন মস্তবড় লোক হয়েছে। শিল্পীভূষণ উপাধি পেয়েছে!"

"অরুণ ? অরু ? কে ? বামুনদি'র সেই স্কুল পালানো, বাঁশবাজ, কুস্তিগির, পটুয়া-ছেলেটা ?" একবার থামলেন তিনি। তারপর ডাকলেন, "এই ডানপিটে, এদিকে আয়। আমার কাছে আয়, আরও কাছে।"

বহুদিন পরে আবার শাসন করার জন পেয়েছেন রাজাবাহাদুর। অরুণ এগিয়ে আসে। দুর্বল হাত দুখানি দিয়ে রাজাবাহাদুর তাকে কাছে টেনে নেন। বলেন, "তুই বড় হয়েছিস ? মস্ত বড় ? আর আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিস নি ?" একবার থামেন তিনি। তারপরে আবার বলেন, "সেদিন তোর ওপর আমি কিন্তু ভয়ানক রেগে গিয়েছিলাম। তোর এতবড় সাহস, আমাকে না বলে ফুলগঞ্জ থেকে চলে এসেছিস। কিন্তু আজ সে রাগ আর নেই, আজ তুই মানুষ হয়েছিস, তুই বড় হয়েছিস। তবু তোকে আমার শাস্তি দিতেই হবে। জানিস তো হাকিম নড়ে তবু হুকুম নড়ে না।"

অপরাধী অরুণ রাজাবাহাদুরের বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে বলে, "বেশ শাস্তি দিন, আমি মাথা পেতে নেব।"

"তুই আর আমাকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারবি না। এবং বরুণাকে তোর সুখী করতে হবে। আমার ভুলের জন্য সে অনেক কষ্ট পেয়েছে, আর নয়।" অরুণ চুপ করে থাকে। রাজাবাহাদুর তার মাথায় হাত বুলোতে থাকেন।

নীরব কিছুক্ষণ। তারপরে ক্লান্তকণ্ঠে রাজাবাহাদুর আবার বলেন, "ফুলগঞ্জ রাজবাড়ির অন্নে পশু সৃষ্টি হয় বলে যে প্রবাদ ছিল, তুই তার ব্যতিক্রম। তুই মানুষ হয়েছিস, এ খবরটা আগে পেলে স্বেচ্ছায় নিজেকে এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতাম না। আরও কিছুদিন বাঁচার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন যে বড্ড দেরি হয়ে গেছে রে!"

রাজাবাহাদুরের বুকের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে। অরুণ মাথা তুলে বসে।

পেছনে তাকায় অতনু। বরুণা এঘরে নেই। টেবিলের ওপর থেকে শিশিটা এনে অতনু কয়েক ফোঁটা কোরামিন খাইয়ে দেয় রাজাবাহাদুরকে। বলে, "আপনি আর কথা বলবেন না। আমি এসে গেছি, অরুণ এসেছে—আমরা আপনাকে ভালো করে তুলব। এখন আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

"ঘুমোব ?" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে রাজাবাহাদুর। "হ্যাঁ। আর কীই বা আমি করতে পারি ?" তাঁর কণ্ঠে হতাশা, "অরু মানুষ হয়েছে। আর

আমাকে ঘুমোতে হবে। সম্বলহীনের একমাত্র শান্তি ঘুম। কিন্তু আজ যে আমার ঘুম আসবে না অতনু! কেমন করে ঘুমোব বল? অরু বড় হয়েছে—মস্ত বড়। আগের দিন হলে ...” বোধহয় ভাবতে চেষ্টা করেন তিনি। “হ্যাঁ। আমি বাবার আমলের সেই সোনার কাজ করা রুপোর হাওদায় বসিয়ে, হাতীতে চড়িয়ে অরুকে সদর থেকে ফুলগঞ্জে নিয়ে আসতাম। আগে-পেছনে পাগড়ী মাথায় সঙীন উঁচিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে সেপাইরা চলত। দেওয়ালীর মত আলো দিয়ে রাজবাড়ি সাজানো হতো। মেলা বসত গোবিন্দমন্দিরের চত্বরে। চার দেউড়িতে সানাই বাজত অহোরাত্র। সামনের ময়দানে চলত যাত্রা, ভেতরে খেমটা। হাতী এসে প্রাসাদের সামনে দাঁড়াতো। রাজপুরোহিত অরুর ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দিতেন। বাঈজীরা তাকে বরণ করত। কতরকমের বাজী ফুটত। সেপাইরা কুচকাওয়াজ শেষ করে তিনবার তোপ দেগে অরুর আগমন ঘোষণা করত। ঘোষণা করত—ফুলগঞ্জ রাজবাড়ির তৈরি প্রথম মানুষ ফুলগঞ্জের মাটিতে পা দিয়েছে।” থামলেন তিনি। তাঁর দু'চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

রাজাবাহাদুরের চোখ মুছিয়ে দেয় অরুণ। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, “আপনি আর কথা বলবেন না। বিশ্রাম করুন। আমরা পাশের ঘরে আছি। দরকার হলে ডাক দেবেন।”

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দু'জনে পাশের ঘরে আসে। খাটের ওপর হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে বরুণা ফুলে ফুলে কাঁদছে। ঠিক এমনি ভাবে অতনু তাকে কাঁদতে দেখেছে এক নিশুতি রাতে—সেই শিউলীতলায়।

“তুমি তাহলে একটু বোস অরুণ। আমি স্নানটা সেরে আসি।” অরুণকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই অতনু কুয়োতলার দিকে চলে যায়। একবার মাথা তোলে বরুণা। তারপরে শয্যাপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে—মুখ লুকোয়।

শিল্পী এগিয়ে আসে, তার মানসীকে স্পর্শ করে। বিরহী রাজকন্যার মিলনানুভূতি শব্দময় কান্নায় মুখরিত হয়। বস্তীময় বেলেঘাটা মধুময়ী নন্দন-কাননে রূপান্তরিত হয়।

খানিকক্ষণ নীরবে কেটে যায়। জলে ভেজা চোখ দু'টি বরুণের হাতের ওপর রেখে রাজকুমারী বলে, “কেমন আছ?”

“ভালো।”

“তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আদর যত্ন করার কেউ নেই না।” বরুণা স্বাভাবিক হতে চায়।

“বাঃ! থাকবে না কেন? তিন-তিনজন চাকর রয়েছে।”

“তারা যে কি রকম যত্ন-আত্তি করে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। যেমন হয়েছে চেহারা, তেমনি বানিয়েছ পোশাক। বামুনের ছেলে মৌলবীর বেশ ধরেছ কেন?” প্রিয়া প্রিয়-সাজে সাজাতে চায় প্রিয়তমকে।

অরুণের পাঞ্জাবীটা সত্যই আলখাল্লার মতো, একেবারে হাঁটু অবধি লম্বা। সে চুপ করে থাকে।

রাজকুমারী চোখ মেলে। বিমুগ্ধ অরুণ নীরবে চেয়ে থাকে। সে যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

রাজকুমারী আবার বলে, "পাছে তোমার বরুণার সম্পদকে আর কেউ বেদখল করে, তাই বুঝি এই ভূতের পোশাকে নিজেকে ঢেকে রেখেছো?" অরুণের হাতখানি ছেড়ে দিয়ে সে উঠে বসে। উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "দাদা তোমার স্নান হল?"

"হ্যাঁ। এই আসছি।" অতনু কুয়োতলা থেকে জবাব দেয়।

ভিজে কাপড়েই ঘরে ঢোকে অতনু। বলে, "কি রে? কি ব্যাপার?"

"তোমার সুটকেসের চাবিটা একবার দাও তো।" বরুণা উঠে আসে কাছে।

ব্র্যাকেটে ঝোলানো জামাটা দেখিয়ে অতনু বলে, "ঐ পকেটে আছে। কিন্তু চাবি দিয়ে কি করবে?"

"আমাকে সাজাবে।" হাসতে হাসতে অরুণ বলে।

"সাজাবো না, ভদ্রলোক বানাব। কি পোশাকের ছিরি দেখো না একবার! বিশ্ববরেণ্য শিল্পী হয়েছেন।"

"কিন্তু আমার পাঞ্জাবী ঐ পেশোয়ারী দেহে উঠলে ভদ্রতা রক্ষা করতে পারবে কি? তার চেয়ে রাজাবাহাদুরের একটা জামা দাও না!"

অতনুর কথায় অরুণ হেসে ফেলে।

বরুণা রেগে যায়, "দাদার বোধহয় চোখ খারাপ হয়েছে। শরীরে আছে তো মাত্র কয়েকখানা হাড়। তুমি ওর পেশোয়ারী চেহারাটা দেখলে কোথায়? তোমার পাঞ্জাবী ঝুলে একটু খাটো হবে—হলোই বা। যা পরে আছে, তার চেয়ে অনেক ভালো হতো। যাক্‌গে, আমি বাবার জামা-ই দিচ্ছি।" বরুণা ত্রস্ত-পায়ে পাশের ঘরে চলে যায়।

লজ্জা পায় অতনু। সত্যিই অরুণ আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে।

রাজাবাহাদুরের জামা ও গেঞ্জি নিয়ে ফিরে আসে বরুণা। এসেই অরুণকে তাগিদ দেয়, "তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না। যাও স্নান করে এসো। গায়ে সাবান দিও। ফুলগঞ্জ ছাড়ার পর বোধহয় আর ও জিনিসটা ব্যবহার করনি। আর এই ভূতের বেশটাও কলতলাতে রেখে এস। জমাদার এলে তাকে দিয়ে দেব।"

এ যেন স্বামী-পরিত্যক্তা সর্বহারা বরুণা নয়, রাণীদীঘির পাড়ে জবাবনে দেখা সেই চঞ্চলা রাজকুমারী।

॥ আঠাশ ॥

পাশাপাশি খেতে বসেছে অরুণ ও অতনু। বরুণা দাঁড়িয়ে বাতাস করছে দু'জনকে। হঠাৎ খেয়াল হয় অতনুর। সে বরুণাকে বলে "তোমার খাবার

রেখেছ ? না সবই দিয়ে দিয়েছ আমাদের।"

"তাই তো, আমি যে অনিমন্ত্রিত। আমার খাবার কোথায় পেলে ? নিশ্চয়ই তোমারটা দিয়ে দিয়েছো আমাকে!" অরুণের খেয়াল হয়।

"দিয়েছি তো বেশ করেছি। কথা না বলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও দেখি।" বরুণা ধমক লাগায় অরুণকে। বহু বছর সে এমন ধমক দেবার সুযোগ পায়নি।

"কিন্তু তুমি কি না খেয়ে থাকবে ?" তবু অরুণ জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ।" বরুণা গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়।

"কেন ?"

"আমার ইচ্ছে।'

"তা হয় না রুণা। তার চেয়ে বরং বসো, যা আছে তিনজনে ভাগ করে নিই।"

সহসা বরুণার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। সে আকুলকণ্ঠে বলে ওঠে, "নিজে রেঁধে, সামনে বসে তোমাকে পেট ভরে খাওয়াব, এ আমার অনেক দিনের আশা অরুদা ..." সে আর কিছু বলতে পারে না।

অরুণ নিঃশব্দে খেতে শুরু করে।

মুখ ধুয়ে ওরা রাজাবাহাদুরের ঘরে ঢোকে। তিনি চোখ বুজে শুয়ে আছেন। হয়তো বা একটু তন্দ্রার মতো এসেছে। তাঁকে বিরক্ত না করে, ওরা, সামনের ঘরে আসে। ইতিমধ্যে বরুণা কখন যেন ঘরদোর গুছিয়ে বিছানা পেতে রেখে গেছে। দু'জনে বিছানায় বসে। অরুণ বলে, "আপনি বিশ্রাম করুন অতনুদা, আমাকে একবার হোটেল হয়ে ব্যাঙ্কে যেতে হবে। ফেরার পথে ডাক্তার ব্যানার্জিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। আমি আজ থেকেই রাজা-বাহাদুরের চিকিৎসা শুরু করে দিতে চাই।"

"তুমি আবার বেরুবে ? তুমি বরং বিশ্রাম কর। আমি তোমার ব্যাঙ্ক হয়ে ডাক্তার ব্যানার্জিকে নিয়ে আসছি।"

অরুণ আপত্তি করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আপত্তি টেঁকে না। অতনু পোশাক পালটে চেক্ নিয়ে বেরিয়ে যায়। অরুণ তার বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। কিন্তু ঘুম আসে না। নানা চিন্তা এসে ভিড় করে। ভাবতে থাকে— ফুলগঞ্জের কথা, তার অভাগিনী মায়ের কথা। রাণীমা ও রাজাবাহাদুরের কথা, বকুলবাঈ ও অতনুর কথা, বরুণা ও নিজের কথা।

হঠাৎ একটা কোমল স্পর্শে তার চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। বরুণা এসে বসেছে পাশে। কখন এসেছে টের পায়নি সে

অরুণ বলে, "খেয়েছ কিছু ?"

"না।"

"কেন ?"

"আজ আমার উপোস।"

"উপলক্ষ ?"

"ব্যক্তিগত।"

কি বলবে অরুণ? সে সবই জানে। কাজেই চুপ করে থাকে।

বরুণা সহসা নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হয় সেখান থেকে। সে চলে যায় পাশের ঘরে। কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই আবার ফিরে আসে। তার হাতে একটা কাগজের মোড়ক।

অরুণ জিজ্ঞেস করে, "ওটা কি?"

"তোমার সেই সোয়েটার।" বরুণা মোড়ক খোলে।

অরুণের মনে পড়ে ফুলগঞ্জ থেকে চলে আসার কয়েকদিন আগে একটা সোয়েটার বানিয়ে দেবে বলে বরুণা তার গায়ের মাপ নিয়েছিল। সে সোয়েটারটা হাতে নেয়। হেসে বলে, "আজও রেখে দিয়েছো?"

"হ্যাঁ অরুদা! সব ফেলে এসেছি সেখানে কিন্তু তোমার এই সোয়েটারটা নিয়ে এসেছি।"

"কেন?"

"তোমাকে দেব বলে।" একবার থামে বরুণা। তারপর বলে, "আমি যে জানতাম, তুমি আসবে—আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হবে না।"

বিমুগ্ধ অরুণ নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকে বরুণার দিকে।

বরুণা আবার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "দেখলে তো? কত কাজ শিখেছি আমি? তোমাদের খাইয়ে, বাসন মেজে, রান্নার জায়গা ধুয়ে, বাবাকে ওষুধ খাইয়েছি। তারপর স্নান করে পুজো সেরে তোমার কাছে এসে বসেছি।"

"অসময়ে এত পুজোর ঘটা?" অরুণের স্বরে উপহাস।

"অসময় নয় অরুদা, এর থেকে বড় সুসময় আর আসে নি আমার জীবনে। আজ তুমি ফিরে এসেছ—বড় হয়ে ফিরে এসেছ। ঠাকুর আমার প্রার্থনা পূরণ করেছেন। আমি তাঁকে প্রণাম জানাবো না?" বরুণা পাখা হাতে নেয়।

বাধা দিয়ে অরুণ বলে, "বাতাস করার দরকার নেই। আমার গরম লাগছে না।"

"কিন্তু আমার দরকার আছে। আমাকে তোমার একটু সেবা করার সুযোগ দাও অরুদা! এ যে আমার বহুকালের আশা।"

কি বলবে অরুণ? সে চুপ করে থাকে। সময় বয়ে চলে।

কিছুক্ষণ বাদে মমতা মাখানো কণ্ঠে বরুণা বলে, "তোমার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে কেন?"

হেসে অরুণ বলে, "হবে না? চেহারা কি চিরকাল এক রকম থাকবে? বয়স বাড়ছে না!"

"তা বৈকি। তবে তোমার বয়সটা একটু বেশি বেড়েছে।" বরুণা একবার থামে তারপর জেরা করে, "নিশ্চয়ই ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া কর না।"

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। অরুণ চুপ করে থাকে।

বরুণা আবার বলে, "আর আমি তোমাকে একা ছেড়ে দেব না।" সে অরুণের

আরও কাছে এগিয়ে আসে। পাখাখানি পাশে রেখে অরুণের একখানি হাত হাতে তুলে নেয়। "বলো, তুমি আমাকে ফেলে আর কোথাও পালিয়ে যাবে না।"

"পালাব কেন?" একটু ম্লান হাসি হাসে অরুণ। "কিন্তু নিজের সংসার দেখে, আমাকে দেখার মতো সময় তুমি পাবে কি?"

"আমার সংসার!" একটু থামে বরুণা, "ও, তুমি বাবার কথা বলছ। তিনি তো আমাদের কাছেই থাকবেন। আমাদের সেবা ও যত্নে বাবা ভালো হয়ে উঠবেন।"

"আমি অমরের কথা বলতে চাইছি রুণা!"

"অমর! বরুণা অরুণের হাত ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যায়।। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে, "কেন বলতে চাইছ সেই অমানুষটার কথা?"

"ছিঃ! সে তোমার স্বামী রুণা!"

"না না, না। সে আমার কেউ নয়। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

"সম্পর্ক নেই বললেই তো সম্পর্ক চুকে যায় না রুণা। আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। একটা এ্যাফিডেবিট করেই সে সম্পর্ক শেষ করে দেয়া যায় না।"

"ও—। তাহলে তুমি সবই জান। জেনেশুনেও এ কথা বলছ। বেশ, তবে এও জেনে রাখো নিজের সুখের জন্য নয়, তোমাকে সুখী করার জনাই · "

'আমি তা জানি রুণা। কিন্তু নিজের সুখের চেয়ে তোমার সুখ আমার কাছে বড় বলেই তোমার এত বড় দান আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি অমরকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধো। আমার বিশ্বাস, এবারে তোমরা সুখী হবে।"

"তার মানে তোমার জীবনে তুমি আমাকে জড়াতে চাও না, এই তো?" বরুণা একবার থামে, "বেশ তাই হবে, জীবনের অর্ধেক যার কেঁদে কেটেছে, বাকি অর্ধেকও সে কাঁদতে পারবে অরুদা! তবে অমরকে নিয়ে তুমি আমাকে ঘর বাঁধতে বলো না, সে আমি কিছুতেই পারব না।" বরুণা উঠে দাঁড়ায়, চলে যেতে চায় সেখান থেকে।

কিন্তু অরুণ তার একখানি হাত ধরে ফেলে। তাকে পাশে বসায়। তবে বলে না কিছুই। বরুণাই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার বলে ওঠে, "সেবারে কলকাতায় বসে দাদাকে লিখেছিলে, রুণার সুখের জন্যে আমার জীবন দেবতার কাছে প্রতিদিন প্রার্থনা জানাই।" একবার থামে সে। তারপরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "এই তার নমুনা? নিজের জীবন বিপন্ন করে দাদা সেদিন যার হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে এনেছিল, তুমি তারই হাতে আবার আমাকে সঁপে দিতে চাইছো। আর তাও নাকি আমার সুখের জন্যে। আমি সে সুখ চাইনে অরুদা। আমি তোমাকে চাই!"

"তুমি তো আমাকে পেয়েছ রুণা।" অরুণ শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়।

"আমি এমন পাওয়া চাইনে। আমি তোমাকে পেতে চাই আমার মনে, আমার প্রাণে, আমার সমস্ত সত্তায়।" বরুণা বোধ করি তার সব সংযম হারিয়ে ফেলেছে। সে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।

অরুণ চুপ করে থাকে।

বরুণা মরীয়া হয়ে বলে ওঠে, "কথা কইছো না কেন? বল বল, আমি তেমন করে তোমাকে পাবো কি না?"

"যদি বলি, না?"

"আমি শুনব না। সংসারে কারও সাধ্য নেই আর, আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।" বরুণা অরুণের পায়ের ওপর মাথা রাখে। তার অশ্রুজলে শিল্পীর চরণ সিক্ত হতে থাকে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে অরুণ বলে, "রুণা, ওঠো লক্ষ্মীটি! বেশ তো। তুমি আমার সব কথা শোনো, তারপরে তুমি যা বলবে, তাই হবে।"

বরুণা মাথা তোলে। চোখ মুছে বলে, "কি কথা?"

"অমর এখন খুব ভালো হয়ে গেছে।"

"হোক্ গে। তার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। সে আমার কেউ নয়।"

অরুণ একটু চুপ করে থাকে। তারপরে বলে, "আমাদের সমাজ কোন মেয়ের দ্বিতীয় স্বামীকে স্বাভাবিক স্বীকৃতি দেয় না, তাদের সন্তান সামাজিক মর্যাদা পায় না।"

বরুণা অরুণের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, "আমি সমাজ চাইনে, আমি সন্তান চাইনে—আমি শুধু তোমাকে চাই।"

"তা হয় না বরুণা, আমরা মানুষ।"

"তাই তো বলছি অরুদা।" বরুণা যেন উৎসাহিত। "আমরা থাকব নিজেদের মধ্যে। দু'জনে দু'জনকে নিয়ে। সমাজ আমাদের সম্পর্ক স্বীকার না করলেও আমার কিছু এসে যাবে না।"

"কিন্তু আমার এসে যাবে। আমি শিল্পী, সমাজকে পরিত্যাগ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

বরুণা কোন জবাব দিতে পারে না। কেউ যেন অদৃশ্য হাত দিয়ে তার কণ্ঠরোধ করেছে।

অরুণ কিন্তু থামে না। সে আবার আঘাত করে বরুণাকে—চরম আঘাত, "একটা কথা তোমার ভুলে গেলে চলবে না বরুণা—তুমি বিবাহিতা। আমার কাছে তুমি পর-স্ত্রী। তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে, আমার সমস্ত প্রতিষ্ঠা মাটিতে মিশে যাবে।"

বরুণা আর থাকতে পারে না সেখানে। কেমন একটা অবসাদ তার সারা দেহে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সে কি অজ্ঞান হয়ে যাবে? তাড়াতাড়ি কোন রকমে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। এগিয়ে চলে কুয়োতলার দিকে। এবার অরুণ আর বাধা দেয় না তাকে।

সামনের খোলা জানলা দিয়ে অরুণ বাইরে তাকায়। সেখানে বসন্তের সন্ধ্যা

সমাগত। সহসা চারিদিক আলোড়িত করে মত্ত পবন গর্জে ওঠে। পথের ধূলি ওড়ে, গাছের শাখায় শাখায় মাতন লাগে—শুকনো পাতা ঝরে পড়ে।

আর অরুণ? সে অচল, অটল, অনড়। সে যেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি—শোক-হীন, তাপহীন, হৃদয়হীন।

কিন্তু তার দু-চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু কেন পড়ল গড়িয়ে?

॥ ঊনত্রিশ ॥

শেষ রাত থেকেই রাজাবাহাদুরের অবস্থা খারাপের দিকে। অজ্ঞানের মতো পড়ে আছেন তিনি। সুদীর্ঘ কঙ্কালসার দেহখানি বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। চোখ দু'টি ঘোলাটে। গায়ের রংটাও যেন কি রকম হলদে হয়ে গেছে। তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। নিশ্বাসের সঙ্গে পাঁজর বের করা বুকখানি দুলে দুলে উঠছে। কয়েকদিন থেকেই কিছু খেতে পারছেন না। ডাক্তার ব্যানার্জী আজও একবার এসে দেখে গেছেন। যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ফল হয় নি কিছুই। অতনুর ইচ্ছে কোন নার্সিংহোমে দিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখে। অন্তত এ সান্ত্বনাটুকু থাকবে, ফুলগঞ্জের শেষ মহারাজা বিনা চিকিৎসায় মারা যান নি।

অতনু ভাবছে অরুণের কথা। সে আজ সকালে আসে নি। কাল রাতে বলেই গেছে কাজের ভিড়ে আজ সকালে আসতে পারবে না, বিকেলে আসবে। কিন্তু বিকেলে আর সময় পাওয়া যাবে কি?

বরুণাও অতনুর চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। আজ সে কেবলই রাজা-বাহাদুরকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। সুযোগ পেলেই পাশের ঘরে গিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে। বরুণাকে সামলাবার জন্যও এখন অরুণের প্রয়োজন।

না। অরুণের প্রতীক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। তাকে খবর দিতে হবে।

বরুণাকে বাবার কাছে বসিয়ে অতনু পোস্ট অফিসে আসে। অরুণের হোটেলে ফোন করে।

"হ্যালো! কে? অরুণ নাকি?"

"আজ্ঞে না। তিনি একটু বেরিয়েছেন।" অপর দিক থেকে উত্তর আসে। গলাটা অতনুর চেনা-চেনা মনে হয়।

"কখন ফিরবে?" সে জিজ্ঞেস করে।

"ঠিক বলতে পারি না, তবে লাঞ্চের আগে ফিরে আসবেন মনে হচ্ছে। খেয়ে যান নি। কিছু বলতে হবে?

"আপনি কে?"

"আমি শিল্পীভূষণের বন্ধু · আত্মীয়ও বলতে পারেন। আমি এখানে ওনার সঙ্গেই থাকি।"

এবারে অতনু চিনতে পারে তাকে। তার হাসি পায়। ফুলগঞ্জের জামাই অমরসাহেব, রাঁধুনীর অনাথ সন্তান অরুণকে স্বীকার করছে বন্ধুরূপে, পরিচয় দিচ্ছে আত্মীয় বলে।

কিন্তু অতনু আত্মপরিচয় দেয় না। শুধু বলে, "অরুণ এলে তাকে বলবেন, বেলেঘাটা থেকে ফোন এসেছিল। যিনি অসুস্থ ছিলেন, তাঁর অবস্থা ভালো নয়।"

"আপনি কে বলছেন? অতনুদা নাকি? হ্যালো · "

কোন জবাব না দিয়ে অতনু ফোন ছেড়ে দেয়।

উন্নতি দূরের কথা—রাজাবাহাদুরের অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটছে। বিকেলের রোদ পড়ে এল। অরুণ এখনও আসছে না। বরুণা অস্থির—অতনু ধৈর্যহীন। তবে কি অরুণ আসবে না? না, না, তা হতে পারে না। অরুণ আসবে। নিশ্চয়ই আসবে।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। বরুণা ছুটে যায়। ক্ষিপ্রহস্তে দোর খোলে। অরুণ এসেছে। কি আনন্দ!

কিন্তু তার পেছনে কে? নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না বরুণা। তার হাসি যায় মিলিয়ে। সমস্ত মুখখানি মুহূর্তে কঠিন হয়ে ওঠে।

"কেমন আছো বরুণা?" অমর কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

বরুণা কোন উত্তর দেয় না। সে নীরবে দোরগোড়া থেকে সরে দাঁড়ায়। ওরা ঘরে ঢোকে। উৎকণ্ঠিত অরুণ জিজ্ঞেস করে, "মামা কেমন আছেন?"

"ভালো নয়।" কোন রকমে উত্তর দিয়ে বরুণা প্রায় ছুটে পাশের ঘরে চলে যায়।

"দরজাটা বন্ধ করে ওঘরে আসুন।" অরুণ এগিয়ে যায়।

অমর তার নির্দেশ পালন করে।

অরুণের পেছনে পেছনে অমর এসে দাঁড়ায় রাজাবাহাদুরের শয্যাপাশে। বহুকষ্টে মুখে একটুখানি হাসির পরশ ফুটিয়ে তুলতে চান রাজাবাহাদুর। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, "আমার দুর্ভাগ্য, দেখে যেতে পারলাম না কিন্তু জেনে গেলাম—আমি না থাকলেও রুণা সুখে থাকবে। তাকে তুই সুখী···।" হঠাৎ অমরের দিকে নজর পড়ে তাঁর। তিনি থেমে যান। অরুণের দিকে তাকান। তাঁর চোখে জিজ্ঞাসা।

রাজাবাহাদুরের কানের কাছে মুখ এনে অরুণ বলে, "আমাদের অমরসাহেব। উনি এখন অনুতপ্ত। কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আপনার ক্ষমাপ্রার্থী। জমিদারী নীলাম হয়ে গেছে। আমি ওনার একটা চাকরি ঠিক করেছি। মাইনে বেশি না হলেও ওদের দু'জনের বেশ চলে যাবে। আপনাকে তো আমি নিয়েই

যাচ্ছি সঙ্গে করে। অতনুদাও গাড়োয়ালে চলে যাচ্ছেন, তাঁর মেয়ের কাছে।" অরুণ থামে। বড় আশা নিয়ে সে রাজাবাহাদুরের মুখের দিকে তাকায়।

না। কোন উৎসাহের চিহ্ন নেই তাঁর মুখমণ্ডলে। কিন্তু অরুণ আশাবাদী, সে হতাশ হয় না। আবার বলতে থাকে, "আপনি শুনে খুশি হবেন, অমরবাবু নেশা করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। এমন কি ওনার সামনে পর্যন্ত কারও মদ ছোঁবার উপায় নেই।" অরুণ অমরকে ইসারায় এগিয়ে যেতে বলে। অমর নতমস্তকে এগিয়ে যায় রাজাবাহাদুরের শয্যাপ্রান্তে। রাজাবাহাদুর মুখ ঘুরিয়ে নেন।

অরুণ আবার মিনতি জানায়, "আপনি ওনাকে ক্ষমা করুন। আপনার আশীর্বাদ ও আমাদের শুভেচ্ছায়, অমরবাবু ও রুণার পুনর্মিলন সার্থক হোক্, ওদের মিলিত জীবন সুন্দর হোক্।"

"না।" সহসা রাজাবাহাদুর বলে ওঠেন, "আমি পারব না ওকে ক্ষমা করতে। তুই কেন ওকে আমার সামনে নিয়ে এলি?" তারপরে তিনি অমরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, "তুমি আমার সামনে এসেছো কেন? আমার জামাই মরে গেছে। বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও · আই সে গেট্ আউট · " আর কিছু বলতে পারেন না রাজাবাহাদুর। তিনি উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকেন।

অমর কোন কথা বলে না। সে অরুণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অতনু এগিয়ে এসে রাজাবাহাদুরকে কয়েক ফোঁটা ওষুধ খাইয়ে দেয়।

রাজাবাহাদুর একটু সুস্থ হলে অরুণ আবার বলে, "মামা, আপনি তো জানেন, আমি রুণাকে কতখানি ভালোবাসি। আমি বলছি মামা, এতে রুণার ভালো হবে, সে সুখী হবে। আমি অমরকে চাকরি যোগাড় করে দিয়েছি।" একবার থামে সে। তারপরে অমরকে আদেশ করে, "এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? যান মামার পা ধরে ক্ষমা চান · যান।"

"না।" বরুণা বাধা দেয়। "ও যেন আমার বাবাকে স্পর্শ না করে। বেরিয়ে যাও · তুমি বেরিয়ে যাও এ বাড়ি থেকে।" বরুণা আর দাঁড়ায় না সেখানে। সে নিজেই বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

অমর তবু নিঃশব্দে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

অরুণ সামনের ঘরে আসে। দেখে বরুণা এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের দরজা না খুললে এ ঘরটা দিনের বেলাতেও প্রায় অন্ধকার। তবুও অরুণ দেখতে পায় বরুণার দু'চোখে ক্ষমাহীন প্রতিহিংসা! স্থির পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে সে।

অরুণকে দেখেই বরুণা ক্ষেপে ওঠে, "ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে দাদা তোমাকে এখানে ডাকে নি। কেন তুমি ওকে নিয়ে এসেছ? বাবাকে মেরে ফেলতে?"

"না। তাঁকে ভালো করে তুলতে। তুমি সুখী হয়েছ জানলে তিনি ভালো হয়ে উঠবেন।"

"আমি সুখী হব ! ও আমাকে সুখী করবে? তুমি কি পাগল হলে?"

"না রুণা। পাগল আমি হই নি। আর তাই বলছি অমরকে তোমার ক্ষমা করতেই হবে। তোমরা সুখী হলে রাজাবাহাদুর ভালো হয়ে উঠবেন। আমি তাকে ভালো করে তুলবই।" অরুণের কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়।

কিন্তু বরুণার উত্তেজনা কিছুমাত্র প্রশমিত হয় না। সে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

অরুণ এগিয়ে আসে। বরুণার একখানি হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে তুলে নেয়। খানিকক্ষণ নীরবে কেটে যায়। তারপরে অরুণ ধীর কণ্ঠে বলতে থাকে, "তোমার মনে আছে রুণা, কলকাতায় এসে মামার যেবারে বসন্ত হলো! মামীমা তাঁর সেবা করতে চলে এলেন। তুমি আর আমি রইলাম মায়ের কাছে। রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে মা আমাদের দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প বলতেন -- বলতেন, দস্যু রত্নাকর কেমন করে বাল্মীকি হলেন! মানুষ হত্যা করতে যার কোনদিন হাত কাঁপে নি, একটি ক্রৌঞ্চীর বিরহ-বেদনায় তার অন্তর হলো উদ্বেলিত, আর সেই শোক থেকেই জন্ম নিল বিশ্বের প্রথম শ্লোক—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম-মোহিতম্।।'

একবার থামে অরুণ। তারপরে আবার বলে, "অনুতাপের অনলে জ্বলেপুড়ে অমরের পশুত্ব ছাই হয়ে গেছে রুণা! তুমি ওকে ক্ষমা কর—ভালোবাসো। তোমাকে সুখী দেখতে পেলে সেই হবে তোমার অরুর সবচেয়ে বড় সুখ। তুমি আমাকে দুঃখ দিও না। আমার সঙ্গে এস। চলো, আমরা ও ঘরে যাই।"

॥ ত্রিশ ॥

গম্ভীরমুখে ডাক্তার ব্যানার্জি বেরিয়ে এলেন রাজাবাহাদুরের ঘর থেকে। বললেন, "লেট হিম ডাই ইন পিস্।"

"নো। উই কান্ট্ গিভ্ আপ উইদাউট এ ফাইট্।" অরুণ চীৎকার করে ওঠে।

ডাক্তার ব্যানার্জি অরুণের উত্তরে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

অবস্থাটা সামলে নিতে অতনু বলে, "শুনেছি আজকাল না কি অপারেশান…"

"করা যেতে পারে, তবে জাস্ট-এ চান্স…। কিন্তু সে-সব কথা এখানে অবান্তর।"

"কেন?" অরুণ প্রশ্ন করে।

"পেসেন্টের যা কন্ডিশন, তাতে এঁকে হসপিটালে রিমুভ করা সম্ভব নয়।"

"এখানে অপারেশান হতে পারে না?"

হেসে ফেলেন ডাঃ ব্যানার্জি। বলেন, "হবে না কেন? তবে ইট্ ইনভল্‌ভস্

এ ফরচুন। যাই হোক্, আমি একটা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। একটু রিলিফ পাবেন এই যা। আর কিছু করবার নেই।"

"এখানে অপারেশান করতে হলে কত খরচ পড়বে ডাক্তার ব্যানার্জি ?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অরুণ জিজ্ঞেস করে।

মৃদু হেসে উত্তর দেন ডাক্তার, "অন্তত হাজার পাঁচেক।"

"ডক্টর ! আপনার রোগী আনফরচুনেট। কিন্তু এখনও তাঁর জীবনের দাম পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে বেশি।"

ডাক্তার ব্যানার্জি লজ্জা পেলেন। অবশ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে রোগীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর অনুমান মোটেই অমূলক নয়। তিনি বলেন, "কিছু মনে করবেন না মিস্টার লাহিড়ী, অ্যাপারেটাস আনালে এখানেই অপারেশান হতে পারে। তবে এখন টাইম ফ্যাক্টরটাই আসল। আজ রাতের ভেতরেই অপারেশান করতে হবে। আমি চেম্বার যাচ্ছি। আপনি টাকা দিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দিন।"

ডাঃ ব্যানার্জিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে অরুণ ফিরে আসে। বরুণা চুপচাপ সামনের ঘরে বসে আছে। অরুণ বলে, "সে কি ? তুমি এরকম মুষড়ে পড়লে কেন ? কি হয়েছে ? তোমার বাবাকে আমি ভালো করে তুলবই। জীবনভোর যিনি শুধু সবার হাসি যোগান দিয়ে এসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফোটাতে তোমরা আমাকে সাহায্য কর। আমাকে শক্তি দাও।"

"কিন্তু তুমি কি তা পারবে ?" ক্ষীণ কণ্ঠে বরুণা জিজ্ঞেস করে।

"নিশ্চয়ই পারব। জীবনে আমি কোনদিন পরাজয়কে মেনে নিই নি।"

"বলো, আমাকে কি করতে হবে ?"

"চোখ মুছে হাসি-ভরা মুখে তুমি রাজাবাহাদুরের কাছে গিয়ে বসো। অক্সিজেনের ফানেলটা অমরের হাত থেকে নিয়ে তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। আমি ওকে ব্যাঙ্কে পাঠাচ্ছি।"

"কিন্তু ব্যাঙ্কে তো দাদাই যেতে পারে।"

"আমি সংসারী হই নি রুণা। তা হলেও জানি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বিশ্বাস। অর্থের প্রতি অমরের মোহ ঘুচে গেছে। তোমার ভয় নেই, সে টাকা নিয়ে পালাবে না। তুমি তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও, সে-ই ব্যাঙ্কে যাবে। এতনুদা এখানে থাকবেন। হয়তো আরও বড় কাজ তাঁকে করতে হবে, যা অমরকে দিয়ে হবে না।"

কোমল একটা স্পর্শ পেয়ে ফিরে তাকায় অমর। বরুণাকে দেখেই মাথা নত করে সে। বরুণা বলে, "ও-ঘরে যাও, অরুদা ডাকছে। আমি এখানে বসছি।"

অমর উঠে দাঁড়ায়। অক্সিজেনের ফানেলটা হাতে নেয় বরুণা। অমর চলতে শুরু করে। বরুণা ডাকে, "শোন !"

অমর ফিরে দাঁড়ায়।

"সকাল থেকে এক কাপ চা ছাড়া তো কিছুই খেলে না। নিজেরা সুস্থ না

থাকলে, বাবাকে আমরা বাঁচাবো কেমন করে ? ও-ঘরে টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা আছে, খেয়ে নিও।”

ঘাড় নাড়ে অমর। সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। বরুণাও নির্বাক। কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়। তারপর অমর কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না। কেবল বলে, “আমি এখন যাই তাহলে।”

“এসো।”

অসাড় হয়ে পড়ে আছেন রাজাবাহাদুর। ফুলগঞ্জের রাজাবাহাদুর শুয়ে আছেন বেলেঘাটা বস্তী অঞ্চলের একটি আলো-বাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে ঘরে। রাজবাড়ির কুত্তা-মহলের ঘরগুলিও এর চেয়ে ভালো ছিল। তাঁর দেহে নেই সেই ক্ষত্রিয় শৌর্য, মুখে নেই সেই গ্রীক ভাস্কর্যের ছাপ, চোখে নেই সেই দেবতার দৃষ্টি। ভাঙা দেউলের দেবতার দৃষ্টি হয়েছে স্তিমিত, কণ্ঠ হয়েছে স্তব্ধ।

সারারাত যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে। ফল হয় নি কোন। অপারেশান অ্যাপারেটাসে সামনের ঘরটা বোঝাই হয়ে রয়েছে, কিন্তু অপারেশান করা যায় নি।

ডাঃ ব্যানার্জি দুঃখ করে বললেন, “কি করব বলুন! একটা চেষ্টার সুযোগ পর্যন্ত পেলাম না। হার্টের যা কন্‌ডিশান তাতে অপারেশান করতে গেলে, টেবিলেই পেসেন্ট মারা যাবেন। এত আয়োজন বৃথা হলো। আর একটা দিন আগে যদি ডিসিশানটা নিতেন।”

রাজাবাহাদুরের গোঙানির শব্দে ওদের চমক ভাঙে। মুখ তোলে বরুণা। বলে, “বাবা জেগেছেন।”

“হ্যাঁ। চলো তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে তোমরা তোমাদের নতুন জীবনের পথ-চলা শুরু করবে।” অরুণ দু-হাতে অমর ও বরুণার দু’খানি হাত ধরতে চায়।

পারে না। অমর অরুণের হাত থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নেয়। অরুণ অবাক হয় কিন্তু বলে না কিছু।

অমর কথা বলে, “অরুণবাবু! আপনি শুধু শিল্পী নন, আপনি একজন আদর্শ পুরুষ। আশ্চর্য উদার আপনার অন্তঃকরণ। তবু বলব, আপনি নিতান্তই অনভিজ্ঞ।”

“মানে ?” অরুণ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, “আপনি কোন্ অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইছেন ?”

“সংসারের অভিজ্ঞতা।” অমর উত্তর দেয়, “সংসার সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে —আপনার কোন অভিজ্ঞতাই নেই।”

“কেন বলুন তো ?”

“নইলে আপনার মনে এ ধারণা কেন হলো যে আমাদের সমাজ কোন মেয়ের দ্বিতীয় স্বামীকে স্বাভাবিক স্বীকৃতি দেয় না ? কে আপনাকে বলল, যাকে আপনি আশৈশব ভালোবেসে এসেছেন, তাকে গ্রহণ করলে, সমাজ আপনাকে পরিত্যাগ করবে ?”

অরুণ কোন উত্তর দিতে পারে না। বরুণা শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে অমরের দিকে।

অমর আবার বলে, "তাছাড়া বরুণা তো আপনার কাছে পরস্ত্রী নয়। সে আপনার প্রথম এবং একমাত্র প্রেয়সী। তাকে আপনি প্রত্যাখ্যান করছেন কোন্ অধিকারে? বলুন, উত্তর দিন। চুপ করে থাকবেন না।"

তবু অরুণ চুপ করে থাকে। কি বলবে সে? সমস্ত ব্যাপারটাকেই তার অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে।

অমর আবার প্রশ্ন করে, "এত দুঃখ কষ্ট পেয়ে রাজাবাহাদুর আজ মৃত্যুপথ-যাত্রী, শেষ সময় তাঁকে কেন আপনি এতবড় আঘাত দিতে চাইছেন?"

"আঘাত?" অরুণ আর চুপ করে থাকতে পারে না।

"আঘাত বৈকি, চরম আঘাত।" অমর বলতে থাকে, "আপনার বোঝা উচিত, তাঁর পক্ষে আমাকে ক্ষমা করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় তিনি যদি জেনে যান যে বরুণা আবার আমার হাতে পড়েছে, তাহলে যে তিনি শান্তিতে শেষ নিশ্বাসটুকু ফেলতে পারবেন না—স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবেন না। প্লিজ অরুণবাবু, আপনি তাঁকে এতবড় আঘাত দেবেন না। আপনি বরুণাকে গ্রহণ করুন, রাজাবাহাদুরের সামনে গিয়ে বরুণাকে সুখী করার প্রতিশ্রুতি দিন, তাঁকে শান্তিতে শেষ নিশ্বাস ফেলতে দিন। চলুন, ওঘরে চলুন।" অমর দু'হাত বাড়িয়ে অরুণ ও বরুণার দু'খানি হাত ধরে।

কিন্তু অরুণ তবু দ্বিধা করে। এবারে অমার যেন রেগে যায়। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, "অরুণবাবু, আমি আজ নিঃস্ব। আপনি আমাকে চাকরি দিয়েছেন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে আপনি আমার একটা মতামত পর্যন্ত নিলেন না!"

এত বিস্ময়ের ভেতরেও হাসি পায় অরুণের। একটু হেসে সে জিজ্ঞেস করে, "কেন এ বিয়েতে আপনার অমত আছে নাকি?"

"আছে বৈকি, নিশ্চয়ই আছে।"

"কারণ?"

"আমি বিবাহিত।"

"বিবাহিত!"

"হ্যাঁ, বরুণার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে আমি আবার বিয়ে করেছি।"

"সে স্ত্রী কোথায়?"

"তার বাপের বাড়িতে!" একটু থেমে অমর আবার বলে, "চাকরি পেয়ে গেছি। এবারে বাসা ভাড়া করে তাদের নিয়ে আসব কলকাতায়।"

"তাদের⋯?"

"হ্যাঁ, আমার স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়েকে।"

অরুণ আর কোন কথা বলতে পারে না। অমরই আবার বলে, "তাই তো আমি বলছিলাম অরুণবাবু, যত বড় মহৎ স্রষ্টাই হোন, আপনি নিতান্তই অনভিজ্ঞ,

আপনার নিজের প্রয়োজনেই বরুণাকে আপনার দরকার। নইলে আপনি প্রতি পদে পদে এমনি ভুল করবেন।"

"ভুল!"

"ভুল ছাড়া আর কি? আপনি কেমন করে ভাবলেন আমার মতো একজন অসংযমী মদ্যপ, বরুণার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে এতগুলো বছর অবিবাহিত রয়েছে?" একবার থামে অমর। তারপর আবার বলে, "আপনার কাছে আমার আরেকটি অনুরোধ আছে অরুণবাবু।"

"বেশ, বলুন।" অরুণ অমরের দিকে তাকায়।

"আগে কথা দিন, আপনি অনুরোধটা রাখবেন?"

"দিলাম। আপনি বলুন।"

"আপনাকে মদ ছাড়তে হবে। আপনি তো জানেন অরুণবাবু মদের জন্যই আমি বরুণাকে সুখী করতে পারি নি। আপনি বরুণাকে সুখী করুন।"

"আমি চেষ্টা করব, নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।" অরুণ প্রতিশ্রুতি দেয়।

আর অমর? তার বুকের ভেতর থেকে একটা শান্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে বরুণার দিকে তাকায়। বলে, "জানি না পারবে কি না, তবু যদি কোনমতে সম্ভব হয়, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো বরুণা! তুমি ক্ষমা না করলে, আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না।"

"তুমিও আমাকে ক্ষমা কোরো, আমারই ভুল হয়েছে। তোমাকে চিনতে পারি নি।" অমর কিছু বলতে পারার আগেই বরুণা তার পায়ের কাছে বসে পড়ে। বরুণা অমরকে প্রণাম করে।

অমর বরুণাকে হাত ধরে ওঠায়। তার দেহ ও মনে আনন্দের শিহরন।

একটু বাদে অমরই নীরবতার অবসান করে। বলে, "যাক্‌গে, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওদিকে হয়তো রাজাবাহাদুরের শেষ সময় সমাগত। চলুন, ওঘরে যাওয়া যাক্‌, চলো বরুণা!" অমর ওদের দু'জনের হাত ধরে এগিয়ে চলে।

"ও-রকম কোরে বোলো না।" চলতে চলতে বরুণা বলে, "বাবা চলে যাবে, এ আমি ভাবতেই পারছি না। বাবাকে ছাড়া · না না আমি পারব না। কিছুতেই না!"

"কিন্তু তোমাকে যে পারতেই হবে বরুণা", ধীর অথচ স্থির কণ্ঠে অমর বলে, "বিচ্ছেদকে সহজ ভাবে মেনে নিলে লাভ আছে। তাতে দুঃখের বোঝা হালকা হয়।"

বরুণা নিরুত্তর। সে অমরের হাত ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে।

অমরের সঙ্গে অরুণা ও বরুণা রাজাবাহাদুরের সামনে এসে দাঁড়ায়। অক্সিজেন ফানেলটা বালিশের পাশে রেখে অতনু সরে আসে একটু দূরে।

রাজাবাহাদুর চোখ মেলে তাকান। অমর তাঁর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলে, "আমি বরুণাকে সুখী করতে চাই। আমি জানি, আপনার পক্ষে আমাকে ক্ষমা করা সম্ভব নয়। বরুণাও কোনদিন ভালোবাসতে পারবে না আমাকে।

অথচ তাকে আমি সত্যি সুখী করতে চাই। আপনি অরুণবাবুকে বলুন, তিনি যেন বরুণাকে বিয়ে করেন। আপনি তাঁকে আদেশ করুন।"

স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে ওঠে রাজাবাহাদুরের রোগপাণ্ডুর মুখখানি। কি যেন বলতে চান তিনি। পারেন না। দুর্বল একখানি হাত দিয়ে ইসারায় ওদের কাছে ডাকেন। কাছে, আরো কাছে। একেবারে তাঁর বুকের মাঝে—সব জ্বালা জুড়িয়ে দিতে।

"দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন?" অমর যেন অরুণকে ধমক লাগায়। তারপর কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলে, "সময় নষ্ট করবেন না, সময় নেই। বরুণাকে নিয়ে আপনি এগিয়ে যান রাজাবাহাদুরের কাছে।"

অরুণ তাই করে। সে বরুণার হাত ধরে এগিয়ে আসে রাজাবাহাদুরের কাছে। বলে, "আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন।"

ওরা দু'জনে দু'পাশ থেকে এসে মাথা নিচু করে তাঁর বুকের ওপরে। অতি কষ্টে রাজাবাহাদুর একবার নিজের দু'খানি হাত রাখেন দু'জনের মাথায়। কিন্তু তা নিতান্তই ক্ষণকালের জন্য।

তারপরেই তাঁর হাত দু'খানি আপনা থেকে খসে পড়ে বিছানার উপর। তাঁর গলা থেকে আবার একটা গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসে।

আর কোন শব্দ নেই।

অরুণ ও বরুণা মাথা তোলে। রাজাবাহাদুরের মাথাটি ততক্ষণে ঢলে পড়েছে বালিশের উপরে।

বরুণার বুকফাটা আর্তনাদে রাতের নীরবতার অবসান হয়।

অরুণ তাড়াতাড়ি রাজাবাহাদুরের একখানি হাত হাতে তুলে নেয়।

নাড়ী নিশ্চল। প্রাণের শেষ স্পন্দনটুকুও থেমে গিয়েছে। চিকিৎসার সকল প্রয়োজন হয়েছে শেষ।

শব্দহীন অতনু অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জমিদারীর ক্লেদমুক্ত, জীবনের ভারমুক্ত, চির নিদ্রায় নিদ্রিত রাজাবাহাদুরের প্রশান্ত মুখখানির দিকে। যাবার সময় তিনি জেনে গেলেন, অরুণ বরুণাকে সুখী করবে। তাই স্নিগ্ধ হাসির শেষ ছোঁয়াটুকু এখনও লেগে রয়েছে তাঁর মুখে। তিনি আশীর্বাদ করে গেলেন অরুণ ও বরুণাকে, মুক্তি দিয়ে গেলেন অতনুকে—আর হয়তো বা অমরকেও ক্ষমা করে গেলেন।

কালরাত্রির অবসান হবে। প্রভাত সূর্যের প্রথম পরশে রাঙা হবে পূর্বাচল। নতুন দিনের সূর্য উঠবে। কেবল অরুণ ও বরুণার জীবনে নয়, অতনু আর অমরের জীবনেও নব-সূর্যোদয় সমাগত।

আজ শুধু এই অন্ধকার নিশীথে ভাঙা দেউলের দেবতা চির-বিদায় নিলেন এ পৃথিবী থেকে—ফুলগঞ্জের মানুষ জানতেও পারল না সেই শব্দহীন শেষ বিদায়ের কথা।

"তারপর ?"

"তারপর ? ··তারপরে রাজাবাহাদুরের শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে গেলে অরুণ বরুণাকে বিয়ে করল। অমরই সব ব্যবস্থা করে দিল। সে নিজে গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারারকে হোটেলে নিয়ে এলো। নিজেই হলো প্রথম সাক্ষী এবং নিজ হাতে উপস্থিত অভ্যাগতদের সন্দেশ পরিবেশন করল। নীরবে নয়, তার চিৎকার ও চেঁচামেচিতে হোটেলের অন্যান্য বাসিন্দারা বারবার বিচলিত হলেন।

"কয়েকদিন কলকাতায় কাটিয়ে বরুণাকে নিয়ে অরুণ বাঙ্গালোর রওনা হয়ে গেল। অমরও আমার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে এসে তাদের বিদায় জানালো।"

অতনু চুপ করে। কিন্তু ছায়া আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। সামনের সবুজ পাহাড়টা ধূসর হয়ে উঠেছে। গ্রীষ্মের গোধূলি ঘনিয়ে আসছে তমসার তীরে তীরে—উপত্যকার ক্ষেত-খামার ও বন জঙ্গলে। নৈটয়ার ফরেস্ট রেঞ্জারের বাংলোয় তার ছোঁয়া লাগবে একটু বাদে।

ছায়া উঠে দাঁড়ায়। স্বামীর ঘরে ফিরে আসার সময় হলো। ঝি ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জলটা চড়ানো দরকার। ঠান্ডা ও উচ্চতার জন্য এখানে আবার আধঘণ্টার কমে চায়ের জল গরম হয় না। সে নিঃশব্দে নেমে যায় নিচে।

অতনু বসে থাকে। বসে বসে ভেবে চলে নানা কথা—কত মানুষের হাসি-কান্নার কথা। তবে দু'টি মানুষের কথাই কেবল তার বারবার মনে পড়ে। অতনু চোখ বোজে। তারা সামনে এসে দাঁড়ায়—রাজাবাহাদুর ও জাবেদা।

অতনুর দু'চোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা।

তাদের দু'জনের কথা ভাবলে যে বড় কষ্ট হয় অতনুর। বরুণা ও ছায়াকে এমন সুখে শান্তিতে সংসার করতে দেখলে, যারা সবচেয়ে বেশি খুশি হতো, তারাই আজ নেই এ জগতে।

অথচ অনায়াসে রাজাবাহাদুর আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারতেন। যে বয়সে মানুষ মদ খায়, সে বয়সে তিনি মদ স্পর্শ করেন নি। কিন্তু সেই মদই তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

তাঁর ভুলের জন্য বরুণা সুখী হতে পারল না ভেবে তিনি প্রায় প্রতিদিন চোখের জল ফেলতেন। সেই বরুণা আজ তার মনের মানুষের সঙ্গে সুখে সংসার করছে। কিন্তু রাজাবাহাদুর সেই সংসার নিজের চোখে দেখে যেতে পারলেন না।

ছায়ার সুখের চেয়ে বড় কোন কামনা ছিল না জাবেদার জীবনে। সব সময় সে ভয়ে ভয়ে থাকত, পাছে তার মতো ছায়ার জীবনটাও বরবাদ হয়ে যায়।

সেই ছায়া আজ সুখে-শান্তিতে স্বামীর ঘর করছে। কিন্তু জাবেদা আজ

কোথায়? ছায়ার এই সুখ দেখে যেতে পারল না।

অথচ জাবেদা আজ অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারত। রাজাবাহাদুর ও অতনুর জন্যই যে ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করল সে।

"বাবা!"

ছায়ার আকস্মিক আহ্বানে অতনু চমকে ওঠে। তার ভাবনা মিলিয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি চোখ মোছে।

"তুমি আবার ঐ-সব কথা ভাবছ!" ছায়া ধমক লাগায়।

"না।" অতনু একটু হাসে। বলে, "না, এমনি চোখ বুজে ছিলাম।"

"আবার মিথ্যে কথা।" ছায়া জেরা করে, "তুমি কাঁদছিলে কেন?"

"না, না। কাঁদব কেন? ওর পাগলি মেয়ে, তোর বাবা যে বুড়ো হয়ে গেছে। তাই এখন চোখ বুজলেই, তার চোখ দিয়ে জল গড়ায়।"

"তাহলে তুমি আর কখনও এমন চোখ বুজে থাকবে না।" ছায়া ফরমান জারী করে।

"তার মানে ঘুমোতেও পারব না, এই তো?" অতনু হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে।

"না, না। তা কেন? মানে যতক্ষণ জেগে থাকবে, ততক্ষণ তোমাকে চোখ মেলে থাকতে হবে।"

"মারা গেলে চোখ বুজতে পারব তো?"

"না!" ছায়া আবার রেগে যায়।

"সে কি রে! তুই কি আমাকে মরতেও দিবি না নাকি?"

"দেবো না কেন? সবাই তো একদিন মরে যাবে। কিন্তু তোমার মরতে এখনও অনেক···অনেক দেরি আছে। আমার ছেলের বউ দেখে, তবে তুমি মারা যাবে।"

"তার মানে আমাকে আরও পঁচিশ বছর এই জীবন-যন্ত্রণা সইতে হবে, এই তো। বেশ, তুই যখন বলছিস।" অতনু আবার হাসে।

কিন্তু ছায়া চুপ করে থাকে। সে সহসা গম্ভীর হয়ে যায়।

অতনু জিজ্ঞেস করে, "কিরে কথা বলছিস না যে? হিসেব করে বল; আর কত বছর বাঁচতে হবে আমাকে?"

"বাবা!" ভারী গলায় ছায়া ডাক দেয়।

"কি

"আমার এখানে থাকতে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না বাবা?"

"এই দেখো, পাগলি মেয়ে কথা শোনো! কষ্ট হবে কেন? আমি তো খুব আনন্দে আছি। শেষ বয়সে হিমালয়ে বাস করতে পারা যে পরম সৌভাগ্যের। তার ওপরে এমন ছবির মতো সুন্দর জায়গা। তোদের দু'জনের এত যত্ন—আমার কষ্ট হবে কেন?"

"তাহলে কেন তুমি বাঁচতে চাইছো না?"

অতনুর আবার হাসি পায়। একটু হেসে বলে, "বাঁচা-মরা কি মানুষের নিজের হাতে ? যার যেদিন সময় আসবে, তাকে চলে যেতে হবেই।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে সে। বলে, "'আমি কি পারলাম তোর মা-কে বাঁচিয়ে রাখতে ? অরুণ এত চেষ্টা করে কি পারল রাজাবাহাদুরকে বাঁচাতে ?"

সহসা ছায়ার চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। আঁচলে চোখ মুছে সে করুণ কণ্ঠে বলে, "মায়ের আমি কোন কাজেই আসতে পারলাম না। সারাটা জীবন ধরে সে কেবল দুঃখই সয়ে গেল। তাই আমার বড় সাধ বাবা, আমি বহুকাল ধরে তোমাকে সুখে রাখব—তোমার সেবায় ব্যস্ত থেকে আমি আমার মায়ের অভাব ভুলে থাকব।"

"আমার বেঁচে থাকতে কোন আপত্তি নেই মা, ভগবান যেন তোর এ সাধ পূর্ণ করেন।"

ছায়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, কি যেন ভাবে। তারপরে সহসা স্বাভাবিক স্বরে বলে ওঠে, "ঠিক কথা, 'ভাঙা দেউলের দেবতা'র কাহিনী কিন্তু তুমি তখন শেষ করো নি বাবা !"

"সেকি !" অতনু বিস্মিত, 'সবই তো বললাম—রাজাবাহাদুর মারা গেলেন, অরুণ বরুণাকে বিয়ে করে বাঙ্গালোর রওনা হয়ে গেল। আমি তোর কাছে চলে এলাম। সবার কথাই তো বলা হলো।"

"না বাবা !" ছায়া প্রতিবাদ করে, "তুমি আরেকটি মানুষের কথা বলো নি তখন !"

"কে সে ?"

"অমরবাবু।"

"তার কথা আর কি বলব মা !" অতনু একবার থামে, "সে-ই তো আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল।"

"তারপরে ?"

"তারপরে..."

"হ্যাঁ, তারপরে বুঝি তিনি কলকাতায় বাসা ভাড়া করলেন ? শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এলেন ?"

"না। বাসা ভাড়া করার কোন প্রয়োজন ছিল না তাঁর। কারণ অমর কোনদিন ছেলে-মেয়ের বাবা হয়নি। আর সেই দ্বিতীয় স্ত্রী স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কয়েক বছর আগেই আত্মহত্যা করেছিল।"

"সেকি !" ছায়া বিস্মিত হয়। "তাহলে তিনি অরুণমামাকে সেদিন মিথ্যে কথা বললেন কেন ?"

"বরুণাকে সুখী করতে।" অতনু একটু থামে। তারপরে আবার বলে, "স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের কথা না বললে অরুণ হয়তো তাকেই বরুণাকে বিয়ে করতে বাধ্য করত।"

"তোমাকে তিনি কখন এ-সব কথা জানালেন ?"

"অরুণ ও বরুণা বাঙ্গালোর রওনা হয়ে যাবার পরে।"

"তাহলে তিনি এখন সেই চাকরিটা করছেন?" ছায়া আবার প্রশ্ন করে।

"না, মা! চাকরিটা সে নিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কয়েকমাস পরে কেন যেন ছেড়ে দিয়েছে।"

"এখন তিনি কোথায়?"

"জানি না। সেই হোটেল ম্যানেজারকে চিঠি লিখেছিলাম, তিনি জানিয়েছেন:—অমর চাকরি ছেড়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছে। যাবার সময় কাউকে কিছু বলে যায় নি।"

"আশ্চর্য!"

"মোটেই আশ্চর্য নয় মা! বরুণাকে যতই অত্যাচার করে থাকুক, অমর তাকে ভালোবাসত। তাই সে দ্বিতীয় স্ত্রীকেও ভালোবাসতে পারে নি। বরুণার প্রতি দুর্ব্যবহার করার জন্য তার মনে একটা প্রবল অনুশোচনা হয়েছিল। সে সত্যই বরুণাকে সুখী করতে চেয়েছিল। অরুণ শিল্পী, তাই সে অমরের এই আন্তরিক ইচ্ছার কথা জানতে পেরেছিল। কিন্তু রাজাবাহাদুর ও বরুণা অমরকে বিশ্বাস করতে পারে নি।"

অতনু থামে। ছায়া তার মুখের দিকে তাকায়। অতনু আবার বলে, "অমর জানতো যে বরুণা অরুণকে ভালোবাসে। তাকে পেলেই সে সত্যিকারের সুখী হবে। তাই সেদিন সে অমন হাসি মুখে বরুণাকে অরুণের হাতে তুলে দিতে পেরেছে।"

"সত্যি, এত বড় আত্মত্যাগ বড় বেশি দেখা যায় না। অথচ দুর্ভাগ্য আমাদের—আমরা কিছুই করতে পারলাম না তাঁর জন্য।" একটু থেমে ছায়া আবার বলে ওঠে, "ইস, তুমি যদি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে এখানে। আমি তাঁকে ঠিক ধরে রাখতাম আমার কাছে।"

"পারতিস্ নারে···পারতিস্ না।" অতনু স্নিগ্ধ স্বরে ছায়াকে জানায়। "অমর তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, সে এখন ভারমুক্ত। এমন মানুষকে ধরে রাখা যায় না। অমর এখন আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।"

ছায়া কোন কথা বলে না। সামনের জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে দেবতাত্মা হিমালয়ের দিকে। হয়তো বা ভাবে—অমরবাবু বাবার সঙ্গে এখানে এলে বড়ই ভালো করতেন, শান্তি পেতেন। হিমালয় যে শান্তির আলয়।

আর অতনু? না, সে-ও কোন কথা বলে না। কেবল মনেমনে ভেবে চলে—দস্যু রত্নাকরের কথা, পতি বিরহে কাতরা ক্রৌঞ্চীর কথা, আদিকবি বাল্মীকির কথা—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম-মোহিতম্ ॥'